কাজ

শংকর

ধ্রুপদী

প্রকাশক : প্রীতি মুখোপাধ্যায়, ধ্রুপদী, ৭/১বি অনরেট সেকেণ্ড লেন, কলকাতা ১৪ ॥
বিশাখা ঘোষ। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৯। প্রচ্ছদ শিল্পী : গৌতম চৌধুরী
মুদ্রক : বিভোর মান্না, দেওয়ালী প্রেস, ১৪০/২ বেনারস রোড, শালকিয়া, হাওড়া-৬
প্রচ্ছদ মুদ্রক : দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড,
২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ ॥

এ-পারে কল্লোলিনী কলকাতা, আর ভাগীরথীর ও-পারে কয়েকটি বিচিত্র নামের ছোট ছোট জনপদ—বালি, বেলুড়, শালকিয়া, ঘুসুড়ি, হাওড়া, শিবপুর, শালিমার। পুরনো জাহাজের বহুব্যবহৃত দড়ির মতন জীর্ণ মলিন অবস্থায় যে-পথটি এদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করছে তার পোশাকী নাম গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, লোকমুখে জি-টি রোড।

নদীর এ-পারে বহুতল বাড়ির শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুখের আশ্রয় থেকে ও-পারের বহু প্রাচীন কল-কারখানার রেখা দেখা যায়। ভাগীরথীর পশ্চিমপারের আকাশভেদী চিমনিগুলো মনে করিয়ে দেয় এখানেও একদিন দম্ভ করার মতন প্রাণশক্তি ছিল। এখন অবশ্য সামান্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় অনেক চিমনি থেকে কোনো ধোঁয়া বেরোয় না। ভালই হয়েছে, ওপারের ধোঁয়া কলকাতার পরিবেশকে অযথা দূষিত করছে না। বিবাদী বাগ, এসপ্লানেড, পার্ক স্ট্রীট এবং আলিপুরের বিলাসী ও বিষয়ী মানুষদের কষ্ট কম হচ্ছে।

একদা হাওড়ার এই অঞ্চলকে বলা হতো কুলি-টাউন। কখনও বা আদর করে—বাংলার বার্মিংহাম। এই কুলি-টাউনের কোথাও আমাদের এই কাহিনীর শুরু ও শেষ।

আমাদের কাহিনীর অন্যতম চরিত্র সদানন্দ মজুমদারকে এখনই চোখের সামনে দেখা যাবে।

সদানন্দর বয়স পঞ্চাশ ও ষাটের মাঝামাঝি কোথাও। একেবারে স্ট্যাণ্ডার্ড বাঙালী সাইজ। উচ্চতা সাড়ে-পাঁচ ফুটের থেকে কিছু কম। রঙ চাপা, কিন্তু নাকটা টিকলো। এই টিকলো নাক পেয়েছে ওঁর মেয়ে মনোরমা। সে জন্যে গর্ব আছে সদানন্দর।

সদানন্দ মজুমদারের হাল্কা শরীর—দেখলেই বোঝা যায় খেটে-খাওয়া মানুষ, ভুলেও দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস নেই। মাথার চুল এই বয়সে এবং এই দূষিত পরিবেশে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে যাওয়া উচিত

ছিল, কিন্তু হয়নি। সদানন্দর চোখ দুটি বড় বড়। সহজেই বলা যায়, কোনো পদ্মলোচনা বাঙালিনী এঁকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আজকালকার স্টাইলে গোঁফ বা দাড়ি রাখেননি সদানন্দ। চাঁচাছোলা মুখ, যে কোনো ব্লেড কোম্পানির বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা যায়।

যে-চরিত্রের সঙ্গে সদানন্দ মজুমদারের প্রথম সাক্ষাৎ হতে চলেছে তাঁর নামটাও জেনে রাখা ভাল। তিনি সুধাকর নন্দী। সুধাকর নন্দী অনেকদিন খাস কলকাতায় বসবাস করেছেন। কোন কারণে তিনি এখন কুলি-টাউনের নাগরিক তা যথাসময়েই জানা যাবে।

সুধাকর নন্দীর বয়স মাত্র চল্লিশ। একটু ভারী শরীর। গোলগাল মুখটি। প্রথম দেখলে সাহিত্যিক বলে মনেই হয় না। কিন্তু নজরুল ইসলাম, বনফুল কাকে দেখে সাহিত্যিক মনে হয়েছে? ইদানীং কালেও কিছু তুলনীয় আছে। কিন্তু সে-কথা থাক।

সুধাকর নন্দীর চোখে মোটা সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা। কাঁ[illegible] দুটোও বেশ মোটা। বোঝা যায়, এই চল্লিশ বছরে বহু বিনিদ্র রজনীতে এই চক্ষুযুগলকে অনেক ওভারটাইম খাটতে হয়েছে।

মানুষের বর্ণনা আর নয়। ঘটনা শুরু হোক। সদানন্দর মতন একজন অতি সাধারণ মানুষকে যখন এতোখানি প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাঁকে দিয়েই যখন গল্প শুরু করা হচ্ছে, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে সদানন্দর জন্যে হয় অনেক সুখ অথবা অনেক দুঃখ দূরদিগন্তে কোথাও জমা হয়ে আছে। সে সব সময়মতো তো জানা যাবেই। এখন সুধাকর নন্দী কী করছেন তা দেখা যাক।

"সদানন্দবাবু বাড়ি আছেন?" সাহিত্যিক সুধাকর নন্দী যখন দরজার কাছ থেকে হাঁক ছাড়লেন তখন এ-বাড়ির হেড-অফ-দ্য-ডিপার্টমেন্ট সদানন্দ মজুমদার ভক্তিভরে ঠাকুর প্রণাম করছেন।

দেওয়ালে তিনবার মাথা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে পরিণত বয়সের সদানন্দ মজুমদার তখন বলছেন, "ঠাকুর, তুমি বিশ্ব সংসারের ভাল

কোরো, সেই সঙ্গে আমার এই ছোট্ট সংসার এবং আমার মেয়ে-জামায়ের ভাল কোরো। তুমি দুর্গতির গতি। আমাদের একমাত্র ভরসা।"

প্রার্থনা সেরে বাইরের ঘরের দরজার কাছে এসে প্রতিবেশীকে দেখে সদানন্দ খুব খুশী হলেন। "আরে সুধাকরবাবু, আপনি! আসুন, আসুন। নিজের জন্য এবং মেয়ে-জামায়ের জন্যে একটু ঠাকুর নমস্কার করছিলাম।"

সুধাকর নন্দী পাশের বাড়িতেই ভাড়া থাকেন। কয়েক বছর হলো কলকাতা ছেড়ে এই শিল্পাঞ্চলে তিনি উঠে এসেছেন।

সবিনয়ে সদানন্দ বললেন, "আপনার মতন লোক আমাদের এই ছুতোরপাড়া লেনে থাকেন এটা আমাদেরই ভাগ্য। এখানকার সম্পত্তির ভ্যালুয়েশন বেড়ে গিয়েছে বলা যায়।"

সুধাকর মনে-মনে ভাবলেন, ভাগ্যে সদানন্দবাবু কলকাতার ঘোষালবাগান লেনে তাঁর আদি বাড়িটা দেখেননি। সেখানকার অবস্থা আরও শোচনীয়। নামে দক্ষিণ কলকাতা, কিন্তু রাস্তায় সারাক্ষণ জল জমে আছে। কমবে কি? "বৃষ্টির ক'মাস ওখানে খুব কষ্ট—কলে এক ফোঁটা জল নেই, অথচ পথেঘাটে জল থৈ-থৈ করছে।"

"অথচ বর্ষাকালটাই তো লেখকদের খুব দরকারি সময়—যত ভাবনা-চিন্তা মেঘের মতন মনের মধ্যে জমতে থাকে।"

সুধাকর নন্দী হাসলেন। তাঁর মাথার সামনের দিকের চুলগুলো উঠে গিয়ে তামাটে রঙের টাক একফালি জমির মতন বেরিয়ে এসেছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, মেঘ জমবে, বৃষ্টি পড়বে, গুরুগুরু মেঘ গর্জন হবে, তবে লেখা শুরু করা যাবে এসব 'অ্যামেচার' লেখকদের বিলাসিতা—যাঁরা লেখাকেই জীবিকা হিসেবে নিয়েছেন তাঁরা প্রয়োজন হলেই মনের শুকনো জমিতে নিজে জলসেচের ব্যবস্থা করে নেন।

সদানন্দ বললেন, "যত নিন্দেই হোক, আমাদের এই হাওড়া ছুতোরপাড়া লেনের দুটো মস্ত গুণ—এখানে রাস্তায় জল জমে না এবং

সি এম ডি-এর কল্যাণে কলে ইদানীং জল আসে। আপনি যদি বড় রাস্তা ধরে আরও একটু দক্ষিণে চলে যান—দেখবেন চমৎকার-চমৎকার বাড়ি, কিন্তু সাহারা মরুভূমি হয়ে আছে! আচ্ছা-আচ্ছা ঘরের বউরা ঘোমটা দিয়ে রাস্তায় টিউবওয়েলের সামনে লাইন দিচ্ছে।"

"আমাদের চিত্রশিল্পী অনুপ হালদার এক সময় ওই দিকটায় থাকতো না?"

সদানন্দ বললেন, "ঠিকই ধরেছেন। এক ছোকরা আর্টিস্ট তিন-চারখানা বালতি নিয়ে ওখানকার লাইনে দাঁড়াতেন বটে। আমার কাজে যাওয়ার রাস্তায় পড়তো ওই ধোপাপাড়া, আমি কতবার ওঁকে দেখেছি।"

সুধাকর জানালেন, "এখন সারাভারতে বেজায় নাম করেছেন অনুপ হালদার। বোম্বাইতে বিশাল স্টুডিও তৈরি হয়েছে। কিন্তু ওই জলের কথা বোধহয় অনুপবাবু ভুলতে পারেননি—প্রায়ই মেয়েদের জল সংগ্রহের সিরিজ এঁকে চলেছেন। এই সাবজেক্টেই ওঁর ভীষণ নাম।"

"তাই নাকি? দেখুন তো! আমরা সাধারণ লোক ওঁর ওসব খবরই রাখি না।"

সদানন্দ বললেন, "আরে মশাই, হৈ-হৈ কাণ্ড। অনুপের একখানা ছবি নিয়ে খোদ মিস্টার টাটা এবং মিস্টার আমবানির মধ্যে টানাটানি। বম্বের সবচেয়ে বড় হোটেলের আর্ট গ্যালারিতে একজন কোটিপতি বলেন ছবিটা আমার চাই, আর একজন কোটিপতি বলেন আমার চাই। ছবিটা হচ্ছে রাস্তার ওপরে একটা জলের কলের সামনে অনেকগুলো হাঁড়ি কলসি বালতি। ঘোমটার আড়ালে লুকনো এক বধূ এবং একটা গোরু দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

"শেষ পর্যন্ত কে কিনলো ছবিটা?" জানতে ইচ্ছে করছে সদানন্দর। "মিস্টার টাটা না মিস্টার আমবানি কার ট্যাকের জোর বেশি?"

"বেশ গোলমাল পাকিয়ে উঠছিল।"

"আহা! ধোপাপাড়ার আর-একখানা ছবি এঁকে দু'জনকে দু'খানা দিলেই হতো।"

"কী যে বলেন, সদানন্দবাবু। বড়লোকদের মেজাজ আপনারা জানেন না। তাঁরা এমন জিনিসের মালিক হতে চান যা আর কারও কাছে নেই। তা অনুপ হালদারও মশাই পাগল—হঠাৎ কী ভেবে বললেন, ও-ছবি আমি বেচবো না। আমার কাছেই থাকবে।"

সদানন্দ মজুমদার বললেন, "ওই অনুপ হালদারের জলে লাইন দেবার জায়গাটা কিন্তু এখনও ঠিক একই রকম রয়েছে—আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে আসবো'খন একদিন। বেচারাকে নিয়ে সেবারে ও-পাড়ায় কী কাণ্ড! চার বালতি জল একসঙ্গে পাম্প করতে গিয়ে হৈ-চৈ এবং দাপাদাপি। শেষ পর্যন্ত একটা পাজি ছোঁড়া ওঁর পাম্পকরা দু-বালতি জল নর্দমায় ঢেলে দিয়েছিল। অনুপ হালদার অপমানিত হয়ে মনের দুঃখে পাড়া ছেড়ে চলে গেলেন। আহা! কত বড় অন্যায় হয়েছে, ভাবলে মাথা নিচু হয়ে যায়।"

সুধাকর নন্দী বললেন, "অন্য একটা দিকও আছে, সদানন্দবাবু। ভাগ্যে অন্যায়টা হলো এবং অনুপ হালদার মনের দুঃখে বোম্বাইতে বিবাগী হলেন, তাই না এতো নাম-ডাকের সুযোগ হলো।"

সদানন্দ ইতিমধ্যেই সাহিত্যিক সুধাকর নন্দীকে টালির চালের বৈঠকখানায় বসিয়েছেন, ঘরের ফ্যান খুলে দিয়েছেন। আইনত বৈঠকখানা বলা যায় না—দু' কামরার কাঁচা বাড়ি, সঙ্গে এক চিলতে রান্নাঘর এবং কলঘর। বাইরের দিকটার ঘরে ছেলে তড়িতের শোবার কথা। কিন্তু সে সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে, ফলে ঘুমটা ভোরের দিকেই চেপে আসে, অথচ কাজের লোক এসে যায় ভোর সাড়ে-পাঁচটায়। প্রায় প্রতিদিন দরজা খোলা নিয়ে অশান্তি—দু' একদিন প্রমীলার মা ডেকে-ডেকে সাড়া না-পেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। অবশেষে বাধ্য হয়েই এই নতুন ব্যবস্থা। এই ঘরেই সদানন্দ ও তাঁর স্ত্রী রাত্রিবাস করেন। ভিতরের বড় ঘরটাতে তড়িৎ শোয়।

সদানন্দর কোনো অসুবিধা হয় না। প্রমীলার মা কাজে আসবার

আগেই বিছানা থেকে উঠে মশারি গুটিয়ে সত্যবতী দরজা খুলে রাখেন। তখনও একটু হাল্কাভাবে গড়িয়ে নেন সদানন্দ।

সদানন্দ কোথায় যেন পড়েছিলেন, যে সব ছাত্র ভোরবেলায় ওঠে না, তারা কখনও পড়াশোনায় ভাল হয় না। তড়িৎ ওরফে ছোটখোকার সামনে প্রসঙ্গটা তুলেওছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা তার মাথায় ঢোকেনি।

তড়িতের মা ছেলেকে প্রশ্রয় দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "যার যে রকম ঘুম।" অর্থাৎ ঘুমপাড়ানি মাসীকে প্রমীলার মায়ের মতন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাড়ি যেতে হয়—কোথাও সন্ধ্যাবেলা, কোথাও অনেক রাত্রিতে, কোথাও ভোরবেলায়।

সদানন্দ তর্ক করেননি। শয্যাত্যাগ ব্যাপারটা যে স্রেফ অভ্যাস এবং মনোবলের ব্যাপার তা তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন। কিন্তু সে-কথা ঘোষণা করে লেবু তেতো করে লাভ নেই। কোন একটা বইতে নামকরা লোকরা ভোরবেলায় ওঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। বইটা খুঁজে বের করে ছোটসায়েবকে দেখাতে পারলেই হতো। কিন্তু বইটার নাম কিছুতেই মনে না-পড়ায় একবার তিনি পড়শী সুধাকরকে পাকড়াও করেছিলেন। সাহিত্যিক সুধাকর তখন মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

নমস্কার করে সদানন্দ বলেছিলেন, "আপনারা সাহিত্যিক মানুষ, কে কোথায় কবে কী লিখে গিয়েছেন তা আপনাদের স্মৃতিতে সাজানো থাকে। এই ভোরবেলায় ওঠাটা কেন অবশ্য প্রয়োজনীয়, তা কোন শাস্ত্রে বলেছে?"

সুধাকর নন্দী হেসেছিলেন। "উক্তি চাইছেন দিয়ে দেবো—যে-যে বইতে ভোরবেলায় ওঠার প্রয়োজনীয়তার কথা রয়েছে তাও পেয়ে যাবেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত।"

"মানে?" সদানন্দ একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন।

সুধাকর নন্দী বললেন, "মহাভারতে ভীষ্ম এমন কথা পর্যন্ত বলছেন যে সূর্যোদয়ের আগে যে শয্যাত্যাগ না-করে সে ব্রাহ্মণই নয়। কিন্তু

মনে রাখবেন, এসব ফিলিপ্‌স ল্যাম্প বেরোবার আগেকার বক্তব্য। মহাভারতের যুগে পুষ্পক রথ এবং পাশুপত অস্ত্র থাকলেও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অথবা সি-ই-এস-সি ছিল না। তাই সূর্যের আলোর যথাসম্ভব ব্যবহার তাঁদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই সবাই উপদেশ দিয়েছেন সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়ো।”

সুধাকরের কথায় সদানন্দ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। “তা হলে বলছেন, ভোরবেলার সূর্য, ভোরবেলার বাতাস, ভোরবেলার আকাশ, মানুষের মনের ওপর কোনো শুভপ্রভাব বিস্তার করে না? ওদের বিশেষ কোনো গুণ নেই?”

হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন সুধাকর নন্দী। “আমাদের সময় বি. এস-সি ফিজিক্স অনার্সে যে ফার্স্ট হলো, সেই সরল চ্যাটার্জি সাড়ে-আটটার আগে ঘুম থেকে উঠতো না। সরল এখন মস্ত অফিসার হয়েছে। সাক্ষী আমি নিজে, কারণ দু'জনেই হিন্দু হোস্টেলের একই ঘরে থাকতাম। আমাদের খ্যাতনামা লেখক নগেন হালদার সকাল সাড়ে-নটার সময় বেড-টি নিতেন। শুধু জীবনের শেষ পাঁচ বছর, যখন কলকাতার ক্যামাক স্ট্রীটে উঠে গেলেন, তখন একজন সাইকো থেরাপিস্টের পরামর্শে ভোর চারটেয় লেখা প্র্যাকটিশ শুরু করলেন। কিন্তু তার ফল যে কী হয়েছে তা সবাই জানেন। শেষ জীবনের পাঁচটা উপন্যাস আগেকার মতন জমেনি। একটু সাবধানে যাচাই করলেই বোঝা যায় যেন একটা মানুষ বাধ্য হয়ে ঘুমের ঘোরে লিখেছে—কোথায় যেন একটা ঢুলুনি রয়ে গিয়েছে মূল চরিত্রগুলোর মধ্যে। একটা চরিত্র তো দেখবেন ধরা পড়ে গিয়েছে। সমালোচকরা একে নিয়ে হৈ-চৈ তোলার চেষ্টা চালিয়েছে—এই নিদ্রার প্রতি আসক্তি যেন আসন্ন মৃত্যুর প্রতি লেখকের আকর্ষণ। কিন্তু আমার ওসব মনে হয় না। স্রেফ ঘুমকে ফাঁকি দিয়ে জেগে থাকার চেষ্টায় মন বিদ্রোহ করে বসেছে।”

সাহিত্যিক সুধাকরের এইসব কথা সদানন্দ স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবশতই

মেনে নিয়েছেন। একজন নামকরা লেখক যখন বলছেন, তখন নিশ্চয় কিছু মানে আছে। কত ওঁদের পড়াশোনা, কত ওঁদের চিন্তা। সদানন্দ মজুমদার তাঁর পুত্র তড়িৎকে তড়িৎগতিতে পরিচালনার প্রচেষ্টা তখনকার মতন ত্যাগ করেছেন।

লেখক সুধাকর নন্দীর সঙ্গে সদানন্দর আর একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছে। সেদিন সকালেই রবিবাসরীয় সংবাদপত্রে সুধাকরের একটা গল্প বেরিয়েছে ঘুম প্রসঙ্গে।

সবিনয়ে সদানন্দ বললেন, "সেদিন আপনার সঙ্গে কথা বলে উপকৃত হয়েছি—ছেলেকে সকালে ওঠা-ওঠির জন্যে আর জোর করি না। ওর স্বভাবের কোনো উন্নতি তাতে হয়তো হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। সারাক্ষণের খিটখিটে ভাবটা কেটে যাবার জন্যে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই জন্যেই লোকে বলে সাধুসঙ্গে স্বর্গবাস!"

খুব লজ্জা পেয়ে সাহিত্যিক সুধাকর নন্দী বললেন, "উপকার আমারও হয়েছে, সদানন্দবাবু। আপনি সেদিন আমার চিন্তার ওপর টাটকা হাওয়া বইয়ে দিলেন। আপনি চলে যাবার পরেই ঘুম সম্পর্কে দুটো ছবি মনে পড়ে গেলো। একটা ছবি আপনার ছেলের—বড্ড বেশি ঘুমোয় বলে সবার গঞ্জনা সহ্য করছে। আর একটা ছবি আমার বন্ধু সরল চ্যাটার্জির। খুব সাকসেসফুল এগজিকিউটিভ। নিজের চেষ্টায় মোস্ট অর্ডিনারি অবস্থা থেকে সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির উঁচুপর্যায়ে উঠেছে। কিন্তু বেচারার কিছুতেই ঘুম আসে না। সেদিন সরলের বউয়ের সঙ্গে ওদের কলকাতার বাড়িতে দেখা হলো। বললুম, সরল তো এমন ছিল না। কলেজ হোস্টেলে ভোঁসভোঁস করে ঘুমতো। একবার দুপুর-বেলায় মেট্রোতে সিনেমা দেখতে-দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেবার ওর সঙ্গে ছিল সহপাঠিনী ললিতা সান্যাল। বেচারা ব্যাপারটা এতোই সিরিয়াসলি নিলো যে ওদের মধুর সম্পর্কটাই ভেঙে গেলো!"

সদানন্দ বললেন, "আপনার আজকের গপ্পোটা আমি পড়ে

ফেলেছি। খুবই আকর্ষণীয় বিষয়।"

এই গল্পের নায়ক ফ্যাক্টরি ম্যানেজার। ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে আনবার জন্যে দুপুর রাতে ঘুম থেকে উঠে কারখানায় চলে এলেন আকস্মিক ইন্সপেকশনে। বউয়ের মানা শুনলো না। তারপর কারখানায় ধরা পড়লো তীর্থপতি আদক ও রামপিয়ারী সিং—এরা দু'জনেই নাইট ডিউটির সময়ে প্যাকিং বাক্সের ওপর অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। দু'জনেই চাকরি থেকে সাসপেণ্ড হলো। তারপর এনকোয়ারি।

তীর্থপতি আদকের বউ কাঁদতে-কাঁদতে নায়কের বাড়িতে এসেছিল। আগের দিন নাইট ডিউটি থেকে ফিরে তীর্থপতি ঘুমোতে পারেনি—বউ কয়েকবার বমি করেছে—তীর্থপতি গিয়েছিল ডাক্তারখানায়। ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছিল না—তখন ছুটতে হয়েছিল হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে। হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগ থেকে ফিরে তীর্থপতি সোজা হাজির হয়েছে নাইট ডিউটিতে।

গল্পের নায়ক কারখানার ম্যানেজার সীতাপতি শুনেছেন সব কিছু, কিন্তু নরম হননি। বলেছেন, "এনকোয়ারি চলবে। ডিসিপ্লিন না-থাকলে কোনো প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে না। ডিসিপ্লিনের অভাবেই এ-দেশের কল-কারখানা এবং শিল্পের এই শোচনীয় অবস্থা।"

সীতাপতির বউ অনুরোধ করেছে, "আহা বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছিল—এবারের মতন ছেড়ে দাও। হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডগুলোর অবস্থা কী রকম তুমি তো জানো না।"

ম্যানেজার সীতাপতি কোনো কথায় কান দেননি। বলেছেন, "এনকোয়ারির সময় কত রকমের বানানো গল্প আমাদের শুনতে হবে।"

এর পর চাকরি গিয়েছে তীর্থপতি আদকের। গুরুতর কর্তব্যচ্যুতি—গ্রেভ্ ডেরেলিকসন অফ ডিউটি। মেশিন চালু অবস্থায় মানুষ ঘুমোলে সমস্ত কারখানার সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

তীর্থপতির চাকরি গেলো। কিন্তু কী যে হলো—রাত্রে সীতাপতির আর ঘুম আসে না। সীতাপতির বউয়ের ধারণা তীর্থপতি আদকের

অভিশাপ লেগেছে। সীতাপতি এসব বিশ্বাস করেন না—কিন্তু ঘুমের পায়ে প্রতি রাত্রে মাথা খুঁড়ে মরছেন সীতাপতি।

"সরল চ্যাটার্জিকে তাহলে আপনি সীতাপতি হালদার করে দিয়েছেন।" বললেন সদানন্দ মজুমদার।

সুধাকর নন্দী হেসে ফেললেন। তারপর উত্তর দিলেন, "গল্প-উপন্যাস ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এযুগে সত্যকে খুঁজে পাবেন না, সদানন্দবাবু। 'খবরের কাগজের প্রথম পাতায় চরিত্রগুলো সত্য, কিন্তু ঘটনাগুলো প্রায়ই বিজ্ঞাপন। আর উপন্যাসে চরিত্রগুলো কাল্পনিক কিন্তু ঘটনাগুলো সব সময় সত্যি। এই সীতাপতির ঘটনাটা একটুও বানানো নয়, কিন্তু দেখুন সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির কোনো রেকর্ডে এর উল্লেখ নেই।"

সদানন্দ অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "সুইডিশ কোম্পানির ধোপাপাড়া কারখানার পাশ দিয়ে আমি রোজ সাইকেলে চড়ে আপিসে যাই। আমার চেনাশোনা অনেক লোক ওখানে কাজ করে। আমার জামাই—আমার মেয়ে মনোরমার স্বামী—ওখানে কাজ করে—কত কথা শুনি কারখানা সম্বন্ধে—ডি-এ, ওভারটাইম, ক্যানটিন, প্রোডাক-শন অ্যালাউন্স—কিন্তু এতো বড় ব্যাপারটা কেবল আপনিই লিখতে পারলেন। লেখকের দৃষ্টি বলে কথা। দ্রষ্টা আর অর্ডিনারি মানুষ তো এক জিনিস নয়।"

সেই থেকেই দু'জনের মধ্যে বেশ আলাপ। সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন একজন কারখানার কর্মীর কাছের মানুষ।

কিন্তু সদানন্দ মজুমদার সমীহ করে চলেন এই লেখককে। বলেন, "নেহাত কাছে থাকি সেই দাবিতে জানাশোনা, না হলে আমরা তো আপনার সঙ্গে কথা বলার যোগ্যও নই।"

সাহিত্যিক সুধাকর নন্দী অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। বলেন, "ওসব কথা মনেও আনবেন না, সদানন্দবাবু। মানুষের একটা বৃত্তি প্রয়োজন

—কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ ইস্কুল মাস্টার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ কাঠের মিস্ত্রি, কেউ কারখানার শ্রমিক, কেউ লেখক। লেখকের মধ্যেও আবার নানা জাত আছে।"

সদানন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাকর নন্দী বলেন, "হিন্দির বিখ্যাত লেখক প্রেম চন্দ—ওঁর ছেলে একটা বই লিখেছে পিতৃদেব সম্বন্ধে, নাম কলমের সেপাই! কোনো লেখক কলম নিয়ে যুদ্ধ করে। কেউ কলম নিয়ে অপরের পিঠ চুলকে দেয়—যার যেমন ভবিতব্য।"

সদানন্দ দেখেছেন সুধাকর নন্দী কখনও-কখনও উদাসভাবে দক্ষিণের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। শরীরটা এই ছুতোরপাড়া লেনে অধিষ্ঠিত হলেও মনটা যেন সুদূর আকাশে অদৃশ্য হয়েছে।

সদানন্দ আন্দাজ করেছেন, লিখতে গেলে মানুষকে অনেক ভাবতে হয়, মাথাটার ওপর বড্ড ধকল পড়ে। এর থেকে কারখানার কাজ অনেক সহজ—তিন-চার ঘণ্টা ওভারটাইম করলেও শরীরটা যন্ত্রের মতো খেটে যায়, মাথা খাটিয়ে কিছু খুঁজে বার করতে হয় না। দেহের পরিশ্রম হলে শরীরে ঘাম হয়। মনের পরিশ্রমে ঘাম নেই, কিন্তু যন্ত্রণা বেশি। একথা সদানন্দ আন্দাজ করতে পারেন যখন তিনি বাড়িতে চুপচাপ বসে নিজের সংসারের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। তিনি, তাঁর স্ত্রী সত্যবতী। বড় মেয়ে বিমলা ওরফে মনোরমা বা মনু, জামাই জগদীশ, ছেলে তড়িতের কথা চিন্তা করেন। আন্দাজ করার লোভ হয়, এখন থেকে দশ বছর পরে সংসারটা কেমন হবে?

নিজের সম্পূর্ণ জানাশোনা গোটা চার-পাঁচ মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়েই দিশাহারা হয়ে পড়েন সদানন্দ মজুমদার, আর যাঁরা লেখক তাঁদের ভাবতে হয় সমস্ত মানবসমাজের কথা।

"একথা কে বললো আপনাকে?" সাহিত্যিক সুধাকর নন্দী একবার মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন সদানন্দকে। একজন অর্ডিনারি কারখানা-কর্মীর মুখে এমন দামী কথা তিনি প্রত্যাশা করেননি।

সদানন্দ একটু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলেন। বাংলায় একবার ইস্কুলে থার্ড হয়েছিলেন তিনি। ঐ বিষয়টা খুব ভাল লাগতো—যত ভয় ছিল ইংরিজিতে আর অঙ্কে। ক্লাসে আসতেন সুধাংশুবাবু স্যর। পড়াতেন ইংরিজি, কিন্তু সেবার বাংলার মাস্টারমশায়ের অসুখ হওয়ায় পুরো ছু' সপ্তাহ পড়ালেন বাংলা গদ্য ও কবিতা। সুধাংশুবাবু স্যর বললেন, "শ্রেষ্ঠ লেখক একজন কিংবা ছু'জন মানুষের একান্ত নিজস্ব একটা গল্প বলেন। কিন্তু তাঁর স্বর্ণস্পর্শে একজন মানুষের সুখ-ছুঃখ সমস্ত মানব-সংসারের সুখ-ছুঃখ হয়ে দাঁড়ায়। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাইরে থেকে দেখে অন্য দশটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য বোঝা যায় না। পরিচয় না দিলে মানুষের ভিড়ে এঁরা হারিয়ে যাবেন। কিন্তু যাঁরা জহুরী তাঁরা এঁদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হলেই বুঝতে পারেন, এঁদের মনের মধ্যে সমস্ত মানব-সমাজের ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্পর্কে কী সুগভীর চিন্তা লুকিয়ে রয়েছে।"

সুধাকর নন্দী সবিস্ময়ে সদানন্দ মজুমদারের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। সদানন্দ তখন বলছেন, "এসব আমার কথা নয়। সুধাংশুবাবু স্যরের কাছে শুনেছি, যে-মানুষ যত বড় হয় সে তত সহজভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে পারে। ইতিহাসের সেই আদিযুগ থেকেই তাই হয়ে আসছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, গীতাঞ্জলি, পথের পাঁচালী তার সাম্প্রতিকতম নিদর্শন।"

এর পর সদানন্দ মজুমদার চেপে ধরেছিলেন সুধাকর নন্দীর হাতখানা। "যতই লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করুন, ধরা পড়ে গিয়েছেন স্যর। লেখা এই হাত দিয়েও বেরোয় না, এই কলম থেকেও বেরোয় না—বেরোয় ঈশ্বরের আশীর্বাদে। সৃষ্টিকর্তা তাঁর নিজের কথাগুলোই লেখকের মধ্য দিয়ে বলান।"

বেশ বিব্রত বোধ করেছিলেন সুধাকর নন্দী। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সলজ্জভাবে বলেছিলেন, "আপনার মাস্টারমশাই সুধাংশুবাবু স্যর যাঁদের কথা বলে গিয়েছেন তাঁরা অন্য স্তরের লেখক, সদানন্দবাবু। লেখকের

মধ্যে নানা শ্রেণী রয়েছে। যেমন ধরুন, ওই সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির কথা—সরল চ্যাটার্জি নিজে আমাকে বলেছে ওখানে একচল্লিশ রকম গ্রেডের কর্মী আছে। সরল চ্যাটার্জি একটাই।"

"উনিই তো কর্তা—ওঁর আণ্ডারে প্রোডাকশন ম্যানেজার, ডি ডবলু এম—ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার।"

সুধাকর নন্দী মন্তব্য করলেন, "অথচ সরল চ্যাটার্জি বলে সে নাকি নিমিত্ত মাত্র। বম্বে হেড আপিসে রয়েছেন ওঁর কর্তা—ডবলু ডি অর্থাৎ ওয়ার্কস ডিরেক্টর। বাবারও বাবা আছে। তার ওপরে ঠাকুর্দা। ওসব সরল চ্যাটার্জি এক-একসময় গড়গড় করে বলে যায়। সমস্ত বিশ্বভুবনটাই 'হায়ারারকির' ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে—একদলের ওপর আর এক দল, সেই দলের ওপর আর এক দল—এবে আকারটা ক্রমশ পিরামিড বা ত্রিভুজের মতন ওপরের দিকে সরু হয়ে গিয়েছে। সবার ওপরে হয়তো দেখবেন একজন রাজা বা রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন। কিন্তু তিনিও ভগবানের দাস। ওপরের কর্তা কখন হৃদযন্ত্রে মোচড় দেবেন বা কখন ডেকে নেবেন কিছুই ঠিক নেই।"

সুধাকর বলেছেন, "আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি খুব আনন্দ পাই, সদানন্দবাবু। যখনই সময় পাবেন তখনই চলে আসবেন।"

সদানন্দ বলেছেন, "সে আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু আপনার সময়ের মূল্য কত! সাহস হয় না জ্বালাতন করতে। আমি শুনেছি, হঠাৎ জ্বালাতন করলে একটা গোটা লেখাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে আপনি ডেকে পাঠাবেন অথবা গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দেবেন, আমরা ধন্য হয়ে যাবো।"

সদানন্দ মজুমদার অবশ্য মুখে যা বলেছেন, কাজে তাই করেছেন। সব সময় শ্রদ্ধারদূরত্ব রক্ষা করেছেন। আর সুধাকর নন্দী ক্রমশঃই এই মানুষটির ভালবাসায় পড়ে গিয়েছেন।

অন্য অনেক লেখকের মতন সুধাকর নন্দী মাঝে মাঝে ডায়রি

লেখেন। একদিন তাঁর রোজনামচায় লিখলেন :

"কলকাতা ছেড়ে এই শহরতলির ছুতোরপাড়ায় এসে আমার তেমন অধঃপতন হয়নি। আমি অনেকগুলো ভাল মানুষকে কাছে পেয়েছি। সদানন্দ মজুমদার মানুষটি স্থানীয় কারখানার কর্মী—ঠিক কী কাজ করেন, জানি না। তবে উচ্চশিক্ষিত নন, বোধ হয় টি-টি এম-পি, টেনে-টুনে ম্যাট্রিক পর্যন্ত অথবা কে-কে-এস-এফ, কোনোক্রমে স্কুল ফাইনাল। মানুষটা শান্ত—সাত-সকালে উঠে সংসারের কাজে লেগে যান, তারপর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কারখানায়। কখনও কখনও ওঁর নাইট-ডিউটি পড়ে। কারখানার শ্রমিক হয়েও লাইব্রেরি থেকে নিয়মিত গল্পের বই আনেন। মন দিয়ে খবরের কাগজও পড়েন ভদ্রলোক। সংসারে কারও বিরুদ্ধে ওঁর বিশেষ কোনো অভিযোগ আছে মনে হয় না। ছেলেটি তেমন দাঁড়াচ্ছে না। কিন্তু সে-দুঃখ এখন কোন বাঙালীর ঘরে নেই? এই বলে ভদ্রলোক জটিল সমস্যাটা উড়িয়ে দেন ব্যাপারটা—বাঙালী মধ্যবিত্তের এই ক্লাসিক রূপ কতদিন টিঁকে থাকবে? বেশীদিন এঁদের বোধহয় দেখতে পাওয়া যাবে না।"

♣

সেই সুধাকর আজ সকালে সদানন্দর খোঁজ করতে এসেছেন। "সদানন্দবাবু বাড়ি আছেন?"

সদানন্দ ভীষণ খুশি হয়েছেন। আদর করে বিশিষ্ট অতিথিকে বাইরের ঘরে তক্তপোশে বসিয়েছেন। উঁচুগলায় গৃহিণীকে বলেছেন, "ওগো একটু চা চড়াও।" তারপর আবার বলেছেন, "জামাইয়ের জন্যে যে চা-টা লুকনো আছে ওইটা বার করো।"

একটু ইতস্তত করলেন সদানন্দ মজুমদার। "যা দাম বেড়েছে চায়ের! যে চা দু' বেলা খেতে হচ্ছে তা ট্যাংরায় চামড়ার কারখানায় তৈরি হয়! আসাম বা দার্জিলিং-এর বাগান থেকে এসব জিনিস

কিছুতেই বাজারে আসে না।"

সদানন্দর কানেই ঢুকলো না, সুধাকর বলতে চাইছেন, "চায়ের প্রয়োজন ছিল না।"

সদানন্দ তখন ভিতরের খবর ফাঁস করছেন। "আমার জামাইটি অন্য দিকে খুব সিম্পল—জামা কাপড়ে তেমন নজর নেই, কিন্তু চা একটু ভাল চাই। নিজে তো মুখ ফুটে কিছু বলবে না। বিয়ের পরে এ-বাড়িতে প্রথম-প্রথম চা দিলে খেতোই না। তারপর মনু—জানেন তো আমার মেয়ের ডাক-নাম মনোরমা—একদিন ব্যাপারটা ফাঁস করলো। সুগন্ধী দার্জিলিং চা ছাড়া ও মুখে দিতে পারে না। তখন থেকে আমি প্যাকেটের গ্রীন লেভেল চা একটা নিয়ে এসে গোদরেজের আলমারিতে লুকিয়ে রাখি। গহনার সঙ্গে রাখবার মতন দামী জিনিসই বই কি—এখন!"

অতিথির মুখের দিকে তাকালেন সদানন্দ। "কাল লেখার খুব ডিস্টার্ব হয়েছে তো? রক্ষেকালী পুজোর নাম করে যেভাবে পাড়ার ছেলেগুলো মাইক বাজালো। আমি তখনই মনুর মাকে বললাম, 'আজ সুধাকরবাবুর সমস্ত ভাবনা-চিন্তা নষ্ট হলো। ছোঁড়াদের তো মাথা বলে কোনো জিনিস নেই—সারাক্ষণ হৈ-হুল্লোড় চাই-ই।' যখন ইস্কুলে পড়তাম তখন সুধাংশুবাবু স্যরের কাছে শুনেছিলাম, বড়-বড় মানুষরা গোলমাল একদম সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু কাকে দোষ দেবো? তা হলে নিজের গায়েই থুতু ছিটোতে হয়। আমার শ্রীমানটিও ওই পুজোর পার্টিতে কর্তাব্যক্তি হয়ে আছে।"

সদানন্দ দুঃখ করলেন, "এই জন্যেই নামী লোকরা ভাল জায়গায় বাড়ি ভাড়া নেন। কলকাতার সেরা জায়গাগুলো একেবারে শান্ত—ওইসব রাস্তা ধরে হেঁটে গেলে মনে হবে আলমোড়ার মায়াবতী আশ্রমে রয়েছি। কেন যে আপনি এ-পাড়ায় এলেন। আপনার মতন লোক, সমস্ত দেশ যাকে মাথায় করে রেখেছে। কোনদিন হয়তো কাগজ খুলে দেখবো গরমেন্ট আপনাকে পদ্মশ্রী-পদ্মভূষণ দিয়েছে। আপনি স্যর কিন্তু

ছোট টাইটেলটা নেবেন না—কোনটা বড় তা আমার সবসময় গোলমাল হয়ে যায়। সেন্ট্রাল গরমেন্ট ছাড়া দেশের সবাই জানে কবিরা, লেখকরা, গাইয়েরা যে-সে লোক নন। সরকারের কাছ থেকে ছোট সম্মান তাঁরা নেবেন কেন?"

চা এসে গিয়েছে। সদানন্দর ঘোষণা: "এই হলো আমার মেয়ে এবং জামায়ের কাপ। আপনি একবার লিখেছিলেন, না? ভাল গল্প ভাল কাগজে না-ছাপা হলে তার ওপর সুবিচার হয় না। আমার জামাইও সেইরকম ভাবে—ভাল চা যদি ভাল কাপে না খাওয়া যায় তাহলে তার সব গুণ ফুটে ওঠে না। একটু সুখী মানুষ আমার জামাইটি। বিয়ের পর থেকে আমার মেয়েটিও এখন ভাল কাপ পছন্দ করে।"

আমি অবশ্য মেয়েকে বলি, "ভাল কাপে ভাল চা যদি ভাল মানুষকে দেওয়া যায় তা হলে আরও ভাল।"

সুধাকর নন্দী একটু লজ্জা পেলেন। এতো সম্মানে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। এর আগেও তিনি সদানন্দকে বলেছেন, "লেখকের মধ্যে রুই মাছও আছে পুঁটি মাছও আছে। আমি অতি সাধারণ এক গল্প লেখক।"

"ওসব কথা বললে শুনছি না, স্যার। এই শরৎ চাটুজ্যের কথাই ধরুন না কেন। আমাদের বাজে-শিবপুরের এক কানাগলিতে থাকতেন। ওখানকার লোকরা তখন ভেবেছিল পুঁটি মাছ। বেশিরভাগ মানুষই ওঁকে কোনো পাত্তা দেয়নি। এখন আফসোস করছে—বুঝতে পারছে, এতো বড় রুই কেউ এর আগে দেখেনি।"

সদানন্দ মানুষটি যে ভীষণ স্নেহপ্রবণ তা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হচ্ছে না সুধাকর নন্দীর।

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সদানন্দ জিজ্ঞেস করেছেন, "কী হলো স্যর? মনে হচ্ছে গভীর কোনো চিন্তা করেছেন বহু রাত ধরে।"

ঠিকই আন্দাজ করেছেন সদানন্দ। চিন্তার মধ্যেই রয়েছেন সুধাকর।

সুধাকর এক সময় চাকরি করতেন এবং লিখতেন। লেখাটা ছিল শখের পর্যায়ে। সেই সময় দুর্দান্ত কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক পত্রিকায়। তাঁর দু' একটা গল্প নিয়ে ট্রামে-বাসেও আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে 'কেরানিপাড়ার কাহিনী' উপন্যাসটি নিয়ে।

এই উপন্যাসটির নায়ক চিন্তাহরণ অনেক কষ্ট করে আপিসের হেড ক্লার্ক হয়েছেন। চিন্তাহরণের কর্মজীবনের শেষ দিনটি নিয়ে এই উপন্যাস। এর মধ্যে ব্যঙ্গ ও কান্না একসঙ্গে আছে। অসাধারণ সুষমামণ্ডিত কাহিনী—লোকে পড়েছে এবং নায়ক চিন্তাহরণের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। তাঁর সুখে সুখী হয়েছে পাঠক, আবার দুঃখে দুঃখীও হয়েছে।

কিছুদিন পরেই 'কেরানিপাড়ার কাহিনী'র দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্বের নায়ক চিন্তাহরণের পুত্র চিরন্তন ব্যানার্জি—সে অফিসার হয়েছে। অফিসে সবাই তাকে 'সি-বি' বলে ডাকে।

এই পর্বে অফিসার চিরন্তন ব্যানার্জি প্রচণ্ড চেষ্টা করছে যাতে অফিসে কেরানির সংখ্যা কমে যায়। বিশ্বসংসারে কেরানির কোনো প্রয়োজন আছে বলেই চিরন্তনের মনে হয় না। যৌবনে কাফি হাউসে বসে যে-লোক কিছুদিন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল সে-ই এখন কেরানিহীন অফিস চালিয়ে বিলিতি সায়েবের স্পেশাল তারিফ নিতে চায়।

প্রকাশকের চাপে পড়ে রাত জেগে সুধাকর নন্দী তৃতীয় পর্বও যথা-সময়ে রচনা করেছেন—যার নায়িকা অনন্যা বাসু সি এ। তাঁর পিতৃদেব একদা রবীন্দ্র-স্নেহধন্য অধ্যাপক ছিলেন। অনন্যা বাসু চেইন-স্মোকার, পার্টিতে সগর্বে হুইস্কি সেবন করেন এবং দৃষ্টিবাণে জাঁদরেল অফিসারদের ক্রীতদাসে রূপান্তরিত করেন।

চিরন্তন ব্যানার্জিকে সরিয়ে দিয়ে এই অনন্যা বাসুই এখন অফিসের প্রধানা। চিরন্তন ব্যানার্জি শুধু অফিসের কেরানিদেরই সারপ্লাস করেছিলেন, অনন্যা বাসু আরও একধাপ এগিয়ে এখন বলছেন

অফিসারেরও প্রয়োজন নেই। কমপিউটার, কপিয়ার এবং রোবটেই চলবে নতুন যুগের অফিস—আজেবাজে মানুষ কেন সেখানে ভিড় বাড়াবে?

অনন্যা বাসুর এই ধরনের কথা বলবার এক্তিয়ার আছে। চিরন্তন ব্যানার্জির শিক্ষা হয়েছিল আমেদাবাদের ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে, আর অনন্যা কাজ করে এসেছে খোদ আমেরিকান আই-বি-এম কোম্পানিতে। তারপর স্পেশাল ট্রেনিং নিয়েছে সুইডেনের এক রোবোটিক্স সংস্থায়। শুধু কারখানায় নয়, অফিসেও যন্ত্রমানব এলো বলে—এরা রক্তমাংসের মানুষকে অফিসছাড়া করবেই।

দূরদর্শী সুধাকর এমনি একটি চরিত্রের নাম দিয়েছিলেন গোবর্ধন ওয়ান। গোবর্ধনের জন্ম সুইডেনে—সে সারাক্ষণ অফিসের সব কাজ করে, অথচ বাড়ি ফেরার জন্যে ছটফট করে না, ছুটি নেয় না বা ওভার টাইম চার্জ করে না।

বলা বাহুল্য, গোবর্ধন একটি রোবট। কিন্তু কলকাতার শ্রম পরিবেশে পড়ে গোবর্ধনও কীভাবে একদিন ধর্মঘট করলো তাও অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে দেখিয়েছেন সুধাকর নন্দী। সবচেয়ে মজার যা—অনন্যা বাসু বুঝতে পারেননি যে ইউনিয়নের চাপে পড়ে রোবটও স্ট্রাইক করতে পারে। তিনি ভাবলেন বৈদ্যুতিক গোলযোগ। পরে দেখা গেলো, কোনো রহস্যময় পন্থায় আত্মঘাতী গোবর্ধনের ভিতরটা শর্ট সার্কিট হয়ে সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে!

এই লেখার সময়েই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন সুধাকর নন্দী। সারাক্ষণের সাহিত্যকর্মী হবেন এই আশায়। লেখা মানে শুধু তো লিখে যাওয়া নয়—মানুষকে দেখা, তাকে আবিষ্কার করা, নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে যাচাই করা। চিন্তা করা, লেখাপড়া করা, তারপর তো লেখা।

কিন্তু মাসমাইনের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে গিয়ে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে সুধাকর নন্দীকে।

তাঁর প্রিয় প্রতিবেশীকে এক একবার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সুধাকর, তিনি এমন কিছু একটা লোক নন। কয়েকটা বই লিখে নাম হয়েছিল একটু-আধটু। এখন বেঁচে থাকবার প্রয়োজনেই তাঁকে লিখতে হয়—যেমন মানুষ কারখানায় যায়, আপিসে যায়, তেমনি নিয়মিত লেখা। এ-দেশের সমাজে লেখার মূল্য হয় শব্দের গণনা করে—অন্তত ষাট হাজার শব্দের এক একখানা গল্প তাঁকে লিখতেই হবে প্রতি তিন মাস অন্তর। না-হলে সংসার অচল হবে।

আজকাল সম্পাদক ও প্রকাশক মহল থেকে নির্দেশও আসে কী রকম লিখতে হবে।

কলকাতার একটা ফ্ল্যাটে কম ভাড়ায় অনেকদিন ছিলেন সুধাকর নন্দী। তারপর ওই বাড়ি নিয়ে উচ্ছেদের মামলা শুরু হলো। বাড়ির মালিক অনেকদিন বিদেশে চাকরি উপলক্ষে কলকাতার বাইরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে উকিলের খরচে পেরে উঠলেন না সুধাকর নন্দী।

ভদ্রলোক অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিছু নগদ অর্থ দিতে চেয়েছিলেন বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে। কিন্তু সুধাকর নন্দীর সম্মানে আঘাত লেগেছিল। হাজার হোক তিনি একজন সম্মানিত মানুষ। ঘুষ দিয়ে তাঁকে বাড়ি ছাড়া করতে হয়েছে এই অপবাদ সারাজন্ম পিছনে লেগে থাকবে।

অবশেষে সুধাকর নদীর পশ্চিমপারে এই ঘিঞ্জি শিল্পাঞ্চলে উঠে এসেছেন—এখানে কলকাতার তুলনায় বাড়ি ভাড়া কিছুটা কম। কলকাতায় ভাল অঞ্চলে থাকতে হলে তাঁকে প্রবীণ কথাসাহিত্যিক নীলাচল রায়ের মতন বছরে ছ'খানা উপন্যাস লিখতে হতো। নীলাচল তো আবার দ্বিতীয় একটা নামেও দু'নম্বরী উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত লিখতে-লিখতেই নীলাচল অজ্ঞান হয়ে পড়লেন লেখার টেবিলে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছেন, কিন্তু এখন ব্রেন কাজ করে না।

নীলাচলের লেখার সমালোচনা হয়েছিল। একবার সুধাকরকে

তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, "আমার পলিসি নাও—বছরে একখানা বই নিজের কলমে লিখবে, বাকিগুলো টাকা কামাবার জন্যে কলম চুরি করে লিখবে। তাহলে কেউ তোমাকে সাহিত্যের আসর থেকে হটাতে পারবে না। পণ্ডিতরা বহুদিন আগেই বলে গিয়েছেন, প্রত্যেক লেখকেরই অধিকার আছে তাঁর সেরা লেখা দিয়ে কালের আসরে বিবেচিত হবার।"

সদানন্দ মজুমদার হয়তো খবর রাখেন না। কিন্তু সুধাকর ক্রমশই বুঝতে পারছেন লোকে আজকাল গল্পের বই পড়া কমিয়ে দিচ্ছে। উত্তেজনা বিতরণের প্রতিযোগিতায় ছাপা লেখা ক্রমশই টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রর কাছে পরাজিত হচ্ছে।

সম্পাদকরা সোজাসুজি লেখকদের বলছেন, মানুষ এখন চাঞ্চল্য পছন্দ করছে। সবাই চাইছে, যা ঘটবার তা ঝটপট ঘটুক। মনের মধ্যে কী সব ওঠা-পড়া চলেছে তার হিসেব নেবার জন্যে কেউ ধৈর্য ধরে জাবদা খাতা খুলে থাকতে রাজি নয়।

সম্পাদকের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছেন ব্যথিত সুধাকর নন্দী। ওঁরা চাইছেন এমন এক ধরনের সাহিত্য যা ফুটবল খেলার ধারাবিবরণীর মতন গতিশীল হবে। কখন কী হয় এই আশঙ্কায় পাঠক মুহূর্তে-মুহূর্তে শিউরে উঠবে। অথচ এই সম্পাদক ভদ্রলোকই কয়েক বছর আগে সগর্বে বলতেন, "উপন্যাসটা স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত সংবেদন নয়। কী হচ্ছে, শুধু তা বললে হবে না। সমস্ত ব্যাপারটা যেন সুষমামণ্ডিত শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে।"

ওসব অনেকদিন আগেকার কথা। তখন টি ভি আসেনি এদেশে। তখন কাগজের মালিকের অফিসে অ্যাকাউন্টস অফিসাররা অতটা জেঁকে বসেননি। এখন সম্পাদক শুধু লেখার জন্যে দায়ী নন, পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা এবং আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে প্রতিটা লেখার যোগসূত্র খুঁজে

বেড়াতে তিনি বাধ্য হচ্ছেন।

সম্পাদক সরাসরি সুধাকরের কাছে স্বীকার করেছেন, "সেকেলে যুগের অবসান হয়েছে। নতুন যুগে সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদকের প্রকৃত ডেজিগনেশন হলো মার্কেটিং ম্যানেজার। কোন্ লেখা পাঠক নেবে এবং কোন লেখা নেবে না তা তাঁকে বুঝতেই হবে।"

বাঁচার তাগিদে সুধাকর নন্দী অবশেষে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার দিকে চলে গিয়েছেন। একটি উপন্যাসের পটভূমি স্থাপন করেছেন ইরাকে—সেখানে দীর্ঘদিন ধরে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ চলেছে।

ইরাকে না গিয়েও সুধাকরকে ইরাকের গল্প লিখতে হয়েছে। এই উপন্যাসে একটি বিমানবাহী জাহাজের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই বিবরণ তিনি কোনো মার্কিনী উপন্যাস থেকে সংগ্রহ করেননি। কোনো বই থেকে সোজাসুজি কিছু টোকার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি আছে সুধাকর নন্দীর। যত সামান্য লেখকই তিনি হোন না কেন, অনুকরণের নীচতা তাঁকে যেন কোনোরকমে স্পর্শ না করে—ঈশ্বরের কাছে এই তাঁর নিত্য প্রার্থনা।

বই না-পড়ে সুধাকর তাই বিদেশী কনসুলেট লাইব্রেরিতে গিয়ে অনেকক্ষণ ভিডিও ডকুমেন্টারি দেখেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়—একই দৃশ্য বারবার দেখেন, তারপর টেকনিক্যাল বইয়ের শরণাপন্ন হন। সুধাকর দেখেছেন, নিজের চোখে না-দেখেও এইভাবে নিজের বৈশিষ্ট্য কিছুটা রক্ষা করা যায়।

কিন্তু মানুষ কী চায় এবং আগামী সময়ে কা চাইবে তা সুধাকর ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক যে সব ইঙ্গিত দেন তা ভাবিয়ে তোলে সুধাকর নন্দীকে।

সম্পাদক তো বেতো পা নিয়ে সারাক্ষণই তাঁর আপিসে বসে থাকেন। তিনি কী করে পাঠকের মনের খবর সংগ্রহ করেন? পাঠকদের চিঠির মাধ্যমে?

চিঠির ওপর খুব নির্ভর করা নিরাপদ নয়, সুধাকর জানেন।

একজন উদ্যমী লেখক বিভিন্ন জায়গা থেকে নিজের লেখা সম্পর্কে বাহাত্তরখানা প্রশংসাসূচক চিঠি পাঠিয়েছিল সম্পাদকীয় দপ্তরে—সম্পাদক ব্যাপারটা ধরতেও পারেননি। আসলে এখন কাগজের কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি বাড়ি-বাড়ি ঘোরেন—সমীক্ষার নাম করে মার্কেট রিসার্চের সুনিপুণ গবেষিকারা জেনে নেন, মানুষ কী চাইছে।

এই তথ্যের ওপর নির্ভর করেই সম্পাদক জোর দিয়ে বলেন, "নতুন প্রজন্ম 'সেকস্' চাইছে—একটু খোলাখুলি। নতুন যুগের মেয়েরা চাইছে, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের বিবাহিত জীবনে ভাঙন ধরুক। চুরমার হয়ে যাক স্বামী-স্ত্রীর তথাকথিত পবিত্র সম্পর্ক।"

সুধাকর প্রশ্ন করেছিলেন, "কই? তেমন তো ভাঙচুর দেখছি না ঘর-সংসারে।"

"নিজেরা ঘরসংসার ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারছে না বলে গল্পের নায়িকার ক্ষেত্রে গৃহত্যাগ চাইবে না, এ কেমন কথা? অন্যের ঘাড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নেওয়া খারাপ কী?" সম্পাদক উত্তর দিয়েছেন।

সুধাকর কিছুদিন সেই রকমও লিখেছেন। একখানা উপন্যাসের দুশো পাতার মধ্যে রোমাঞ্চকর প্রাক্ বিবাহ দেহ মিলন, জটিল ডাইভোর্স ও লোমহর্ষক শ্লীলতাহানির দৃশ্য সাজিয়েছেন। সে লেখা সযত্নে পত্রিকায় ছাপা হয়েছে—কিন্তু কোথাও কোনো হৈ-চৈ পড়লো না।

সাহিত্যের অঙ্গনে কী যে কখন গ্রহণযোগ্য হয় তা বুঝতে পারা খুবই প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। "পাঁচতারা হোটেলের ডি লাক্স রুমে অবৈধ মিলন হলো সকলের অজ্ঞাতে। সেই হোটেলের অন্য ঘরেই তখন স্বামী মিটিং করছেন—তবুও পাঠকের মনে কোনো উত্তেজনা হলো না। আর কবে কোথাকার কোন নিশ্চিন্তপুর গ্রামে বৃষ্টিতে ভিজে পথ্যের অভাবে দুর্গা নামের একটা কমবয়সী মেয়ে মারা গেলো তা নিয়ে দুনিয়ার মানুষের চোখে বন্যা নেমে এলো। কীসে কী হয়। বলা বেশ শক্ত।

এই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করতেই সুধাকর নন্দী এসেছিলেন

আজ সকালে।

সদানন্দ চা খেতে-খেতে কিছু-কিছু কথা শুনলেন। বিস্ময়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না।

সদানন্দ বললেন, "আমি সামান্য মানুষ—আমাকে কেন পরীক্ষায় ফেলছেন? লেখকরা হলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা—কী আসছে মানুষের জীবনে, তা আপনারা অনেক আগে থেকে বুঝতে পারেন। সাহিত্যিকের কলমে যা রচিত হবে তাই যে একদিন সত্য হবে তা আপনারা মনে-মনে জানেন।"

সুধাকর নন্দী চুপ করে রইলেন। ইচ্ছে ছিল, যারা রটাচ্ছে বাঙালীর জীবনে নাটক নেই, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নেই, তাই বাঙালী লেখকের গল্পগুলো একঘেয়ে হয়ে উঠছে—তাদের সম্বন্ধে প্রতিবেশী সদানন্দবাবুকে কিছু জিজ্ঞেস করা।

সদানন্দ বিব্রত হলেন। নাটক বলতে জীবনে কী বোঝায় তা তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। "যা প্রত্যাশা করা যায়নি তাই ঘটাকেই কি আপনারা নাটক বলেন?"

সদানন্দর প্রশ্নে হেসে ফেললেন সুধাকর নন্দী। বললেন, "মানুষ যা প্রত্যাশা করে তার কিছুই পাচ্ছে না, এই অবস্থায় ইচ্ছাপূরণও মস্ত নাটক হতে পারে। আপনার জীবনে এমন কিছু ঘটেছে সদানন্দবাবু?" জানতে চাইলেন সুধাকর।

"দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা"—তিন বার কপালে হাত ঠেকালেন সদানন্দ। "আমার কোনো দুঃখ নেই, সুধাকরবাবু। মা সিদ্ধেশ্বরী নিজের হাতে আমাকে যতটুকু তুলে দিয়েছেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই। আমি যখন সকালে ঠাকুর নমস্কার করি তখন বলি, তোমার কাছে চাওয়ার তালিকা বাড়াবো না, তুমি মা যতটুকু রাখতে পারবে ততটুকু দিও। তোমার কাছে একটাই প্রার্থনা, দিয়ে যেন কেড়ে নিও না।"

সাহিত্যিক সুধাকর নন্দী তখনকার মতন বিদায় নিলেন। বললেন, "আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার আনন্দ হয়—অনেক ছোটখাট সন্দেহ

নিরসন হয়।”

সদানন্দ মজুমদার কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার জানালেন। এই শহরে বহু বছর ধরে কত মানুষের সঙ্গে তো তাঁর চেনা—কেউ তো সদানন্দর মধ্যে তেমন কিছু বিশেষত্ব খুঁজে পায় না।

বিশেষ কিছু নেইও তাঁর মধ্যে, সদানন্দ মজুমদার বুঝতে পারেন। ইস্কুলে নিতান্তই সাধারণ ছাত্র ছিলেন—কোনো মাস্টারমশাই তাঁকে নিয়ে কখনও মাথা ঘামাননি। শুধু একবার সুধাংশুবাবু স্যর বলেছিলেন, “প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মধ্যেই একজন অসাধারণ মানুষ বিরাজ করেন।”

এ-কথা নাকি সুধাংশুবাবু স্যরের নিজস্ব নয়— স্বয়ং ঠাকুর বলেছেন, ঈশ্বরের অংশ থেকেই প্রত্যেক মানুষের উৎপত্তি।

এর পর সকালে ইস্কুলে আসবার পথে একটা অচেনা লোককে অজ্ঞান হয়ে ফুটপাতে শুয়ে থাকতে দেখেছিলেন সদানন্দ। মুহূর্তের বিলম্ব না করে মানুষটাকে বুকে তুলে সদানন্দ ইস্কুল বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন।

সুধাংশুবাবু স্যর খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মনোভাবের প্রকাশ ছিল চাপা। বলেছিলেন, “তোমার জামায় বমি লেগে গিয়েছে—ইচ্ছে করলে বাড়ি ফিরে যেতে পারো।”

বাড়ি ফেরেননি সদানন্দ—জামাটা খুলে ইস্কুলেই জল-কাচা হয়েছিল। এবং শুকোবার সময়টুকু সুধাংশুবাবু স্যরের ঘরেই তাঁর চেয়ারের পিছনে-রাখা তোয়ালেটা শরীরে জড়িয়ে বসেছিলেন সদানন্দ। খুব অস্বস্তি হয়েছিল যখন স্বয়ং সুধাংশুবাবু স্যর তাকে চা দিয়েছিলেন। ইস্কুলে বসে স্বয়ং হেডমাস্টারের সঙ্গে চা-পান সেযুগে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

সুধাকরবাবু একদিন অনেকক্ষণ ধরে সদানন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন, জীবনে কী কী মহৎ কাজ করেছেন জানতে।

সদানন্দ ভেবেচিন্তে কিছুই মনে করতে পারেননি—বলার মতন কিছুই তো জীবনে করা হয়ে ওঠেনি। সে করেছিলেন সুধাংশুবাবু স্যর।

বিয়ে-থা না-করে পরের ছেলে মানুষ করার জন্যে সমগ্র জীবনটাই তিলে-তিলে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ইস্কুল থেকে যে-ক'টা টাকা মাইনে হিসেবে পেয়েছেন সুধাংশুবাবু তাও খরচ করেছেন অপরের দুঃখ দূর করতে। কিন্তু কী লাভ হয়েছে? এতো বড় মানুষের সংস্পর্শে এসে হাজার-হাজার ছাত্রের তো কেষ্টবিষ্টু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কই? তারা তো যেমন সাধারণ তেমন সাধারণই থেকে গিয়েছে।

"আপনি বলতে চান সুধাংশুবাবুর আজীবন ত্যাগটা ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে?"

সুধাকরের প্রশ্নের উত্তরে একটু দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন সদানন্দ। প্রথমে বলেছিলেন, "সুধাংশুবাবু স্যর কোনো প্রত্যাশা না নিয়েই জীবনটা দান করেছেন। মানুষকে ভালবাসতে পেরে তিনি নিজেই সুখ পেয়েছেন।"

তারপর একটু ভেবে সদানন্দ বলেছেন, "এতো কাণ্ড করে, ছোট-বেলা থেকে ঠাকুর-স্বামীজীর এতো কথা শুনেও তাঁর একজন ছাত্রও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়নি। তবে বিরাট কিছু না হোক, আমাদের ইস্কুলের ছেলেরা কোথায় যেন একটু আলাদা, সুধাকরবাবু। কোন মানুষটা সত্যি ভাল তা যেন আমরা সহজেই বুঝতে পারি। সুধাংশু-বাবু স্যরের ছাত্ররা মানুষকে শ্রদ্ধা করতে পারে। এ ক্ষমতাও আজকাল কমে যাচ্ছে—সংসারে সারাক্ষণ সন্দেহ করে-করে মানুষের বুকটা ঝামা হয়ে যাচ্ছে, সুধাকরবাবু। পৃথিবীতে ভক্তি-ভালবাসার অভাব হলে শেষ পর্যন্ত মানুষের খুব অসুবিধে হবে।"

আজ একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। সদানন্দর ইচ্ছে ছিল, কারখানা যাবার পথে কিছুক্ষণ থেমে মেয়ে-জামায়ের সঙ্গে একটু কথা বলে যাবেন।

ক্রিং-ক্রিং। ধোপাপাড়ায় মেয়ে মনোরমার দু' কামরা একতলা বাড়িটার সামনে একটু জোরেই সাইকেলের বেল বাজাচ্ছেন সদানন্দ মজুমদার। এই আওয়াজ শুনলেই মেয়ে বেরিয়ে আসে দরজার কাছে।

ভাল নাম বিমলা, ডাকনাম মনোরমা, অনেক ভেবেচিন্তে মেয়ের নাম দিয়েছিলেন সদানন্দ। বন্ধু শশধর বলেছিল, "জামাইটিও তোমার ডায়ামণ্ড পার্টিকল—মানে কিনা হীরের টুকরো।"

বাবার গলা শুনেই মনু দ্রুত দরজার কাছে চলে এলো। "এসো ভিতরে এসো, বাবা।"

"আজ বসবো না, মনু। ঘড়ির দিকটা একটু তাকিয়ে ছাখ। জগদীশের খবর কী ?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনু বুঝতে পারে, মেয়ের ওপর যত টানই থাক, বাবা কিছুতেই কারখানায় লেট হবেন না।

বহু বছর ধরে ঠিক সময়ে হাজিরা দেবার অভ্যাস বাবার। জীবনে মাত্র একদিন বাবা লেট করেছিলেন। সেদিন ঠাকুমার হঠাৎ বুকে ব্যথা উঠলো কারখানা যাবার সময়। ডাক্তার ডেকে রোগী সামলে আর কাজে যাবেন না ভেবেছিলেন বাবা। কিন্তু মাইনের দিন, বাড়িতে টাকা ছিল না। বাবা তাই ছুটলেন কারখানায়। দু-যুগের রেকর্ড পরিষ্কার রাখবার জন্যে বাবা সেদিন কার্ড পাঞ্চ করেননি।

এর পরের থেকে সবাই যখন বলে সদানন্দ মজুমদার কোম্পানির রেকর্ড হোল্ড করেন—চাকরিতে ঢুকে পর্যন্ত একদিনও লেট নেই, তখন সদানন্দ আপত্তি জানান। "আইন অনুযায়ী লেট নেই, কিন্তু একদিন দেরি করেছি ; সুতরাং ওই রেকর্ডটা ঠিক নয়।"

শশধরকাকু বলে, "ওই সুধাংশুবাবুর ইস্কুলে পড়াটাই তোর বাবার কাল হয়েছে। রেকর্ড করেও নিজের প্রাপ্য সম্মানটুকু নেবে না।"

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, "তা কেমন আছিস, মনু ? মুখটা শুকনো কেন ?"

"শুকনো কেন হবে, বাবা ? তুমি সব সময় শুধু মনুকে রোগা

দেখছো, শুকনো দেখছো। অথচ আমি আগের থেকে মোটা হয়েছি ”

সদানন্দ বললেন, “কাল রাত্রে যখন লোডশেডিং হলো, তখন আমার চিন্তা হলো তোকে নিয়েই। তোর মাকে বললাম, মন্নুটা পাখার হাওয়া ছাড়া একদম ঘুমোতে পারে না। তোর মা আমাকে বকুনি দিলো, কাল সকালে গিয়ে মন্নুর খোঁজ কোরো। এখন ঘুমোও। তোর মায়ের ওপর আমি রেগে গেলাম: বললাম, মশারির তলায় মেয়েকে শোয়ানোর অভ্যেস তো করলে না। সেই ছোটবেলা থেকেই মশারি টাঙালেই কান্না।”

মন্নু ওরফে মনোরমা বাবার স্বভাব জানে। সে বললো, “আমার এখানে লোডশেডিং হলো কিনা জানলে না, আর তোমরা দু'জনে মন্নুর কী অবস্থা হবে লোডশেডিং হলে, এই ভেবে সারারাত জেগে রইলে!”

“সারারাত নয়, মন্নু। এই আধঘণ্টার মতন। তোর মায়ের স্বভাব জানিস তো! রাগলে মাথার ঠিক থাকে না। আমাকে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলো—ধন্যি মানুষ বটে, লোকের আর মেয়ে হয় না!”

সদানন্দ মেয়েকে জানালেন, এইসব কটুকথা শুনেও তিনি চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু মন্নুর মা তারপরেও স্বামীকে খোঁটা দিয়েছেন।

স্বামীর দুর্বলতাগুলো মন্নুর মায়ের কাছে মোটেই অজানা নয়। তিনি বলেছেন, “এই লোক আবার বাঙ্গালোরে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করছিল! দিনে দু'বার করে মেয়ের মুখ না-দেখলে যিনি চোখে ধুঁতরো ফুল দেখেন তিনি বলছেন ভাল ছেলে পেলে দুনিয়ার শেষ কোণেও মেয়ে পাঠাতে দ্বিধা করবো না।”

সদানন্দ বউয়ের সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে বসেছেন। লোডশেডিং-এর অন্ধকারে মাঝে-মাঝে শুধু এভারেডি টর্চ জ্বালিয়ে গৃহিণীর মুখখানা দেখে নিয়েছেন। মুখচোখ না-দেখতে পেলে ঝগড়া ঠিক জমে না। লোকে কী করে যে আপিসের টেলিফোনে ঝগড়া করে তা সদানন্দ বুঝে উঠতে পারেন না।

সত্যবতী বলেছেন, "থাক। কথায় কথা বাড়ে। আমি এখন ওঘরে গিয়ে ছোটসায়েবকে একটু পাখার হাওয়া করি।"

মিষ্টি হেসে মন্নু পরম স্নেহে বললো, "বাবা, তুমি শুধু-শুধু মেয়ের জন্যে বকুনি খেয়ে বেড়াও। কাল আমাদের আলো নিভেছিল, কিন্তু মাত্র দশ মিনিটের জন্যে। তারপর বাড়ির সবাই খুব ঘুমিয়েছি।"

সদানন্দ মুখ ফুটে মেয়েকে কিছু বললেন না, কিন্তু তিনি সুধাকর বাবুর কাছে শুনেছেন সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বড় অফিসারদের বাড়িতে এমন যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আলো চলে গেলেও বোঝা যায় না। মাত্র আধ মিনিট, তারপর সিলিং ফ্যান আবার বনবন করে ঘুরতে থাকে মাথার ওপর। ইলেকট্রিক সাপ্লায়ের আলো ফিরে এলে আবার ওই কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। অনেক টাকা দাম যে! না হলে এই কল মন্নুকে একটা কিনে দিতেন সদানন্দ। যেমন ভাগ্য করে মা লক্ষ্মী গরীবের ঘরে জন্ম নিয়েছে।

মন্নু বললো, "বাবা, তোমার সুপুরি কাটা রয়েছে নিয়ে যাও। দোকান থেকে কাটা সুপুরি তুমি কিনবে না, ভীষণ ভেজাল হচ্ছে। নেশা করিয়ে দেবার জন্যে দুষ্টু দোকানদাররা সুপুরিতে আফিম মেশাচ্ছে।"

সদানন্দর এই এক বিলাসিতা। মেয়ের হাতে কাটা সুপুরি ছাড়া তাঁর কিছুই ভাল লাগে না। তিনি মুখে দিয়েই বুঝতে পারেন সুপুরি মেয়ে নিজের হাতে কেটেছে কিনা।

আরও দু' একটা খোঁজখবর নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সদানন্দ এবার বললেন, "যা দেবার তাড়াতাড়ি দে মা।"

মন্নুর রঙটি ফর্সা। সদানন্দ শ্যাম, যদিও চেহারাটা সুঠাম। কোথাও মেদাধিক্য নেই। নাকটা ঝকঝকে ছুরির মতন।

মন্নুর মুখের ধাঁচটা বাবার মতনই—শুধু অনেক ভাগ্য, রঙটা মায়ের মতন হয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, ওর মাও অমন ফর্সা নয়, যদিও সত্যবতী

তা স্বীকার করেন না। কম বয়সে তিনি নাকি আরও অনেক বেশি ফর্সা ছিলেন, তারপর যৌথপরিবারের আর্থিক অনটন ও পরবর্তী কালে শ্বশুরবাড়ির অমানুষিক পরিশ্রমই নাকি তাঁর রঙটা পুড়িয়ে দিয়েছিল।

সদানন্দ স্মৃতি থেকে তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রীর ত্বকের লাবণ্য স্মরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু মনুর রঙের সঙ্গে সে-রঙের তুলনা করা চলে না ভেবে চুপ করে থাকেন।

সত্যবতী রেগে ওঠেন, "চুপ করে থাকবেই তো। পুরুষজাতটাই তো বেইমান—যার জন্যে চুরি করি সে বলে চোর। যার জন্যে শরীর কালি হলো সে বলে কোল।"

"জামাই আসুক, বলবো শাশুড়ির মন্তব্য পুরুষ জাত সম্পর্কে।" কপট রাগ দেখান সদানন্দ মজুমদার।

একটু ধাক্কা খেয়ে স্বভাবলাজুক সত্যবতী অকপটে ঘোষণা করলেন, সব পুরুষই বেইমান—কেবল তাঁর জামাই ও ছেলে ছাড়া।

"তা হলে বাকি আর কে রইলো, গিন্নি এই মক্কেল ছাড়া?"

সত্যবতী সোজা ঘোষণা করলেন, স্বামীর সব কথার উত্তর দিতে তিনি বাধ্য নন। স্বামী কিছু আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট নন। এই আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সম্বন্ধে সত্যবতীর আশৈশব দুর্বলতা। খুব স্বপ্ন ছিল ছেলেকে ম্যাজিস্ট্রেট করবেন। কিন্তু সে আশায় বালি। কোনো-ক্রমে মাধ্যমিক পাশ করে ম্যাজিস্ট্রেট অপিসের চাপরাশি হতে পারলেই ধন্য হয়ে যাবেন সত্যবতী।

কিন্তু সেসব তো অন্য কথা। সুপুরির টুকরোগুলো ছোট্ট কৌটোয় রেখে সাইকেলে চড়তে-চড়তে মেয়েকে সদানন্দ বললেন, "তা হলে এখন চলি। জগদীশের সঙ্গে তো দেখা হলো না।"

মনোরমা: "ওমা! আসল কথাই তো বলা হলো না। বাবা, আজ বিকেলে কারখানা থেকে ফেরবার পথে আসতেই হবে—তোমাকে এবং শশাকাকুকে।"

শশাকাকু নয়, আসলে শশধরকাকু—সদানন্দর দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং এক কারখানার সহকর্মী। মনু কারণটা বললো না, ও একটা কিছু চমক দিতে চায় মনে হচ্ছে। মনু এবং জগদীশের স্বভাবই ওইরকম।

সদানন্দ আর প্রশ্ন করলেন না। তিনি ভালভাবেই জানেন, জিজ্ঞেস করলেও মেয়ের কাছ থেকে এখন উত্তর পাবেন না। বিয়ের আগেও মনু ওইরকম ছিল। কারখানা থেকে বাবা বাড়ি ফিরলে, আঁচলের তলায় লুকিয়ে চিঠি আনতো। বলতো, "কে চিঠি পাঠিয়েছে বলো তো?"

সদানন্দ আন্দাজ করার চেষ্টা চালাতেন। কখনও সফল হতেন, কখনও হতেন না। সদানন্দ সেবার বলে ফেললেন, "ইলেকট্রিকের বিল এসেছে।"

"ঠিক করে বলো বাবা! ভুল হলে চিঠি পাবে না কিন্তু!"

দেখা গেলো বাবার আন্দাজই ঠিক। মনুর বিস্ময়ের শেষ থাকতো না। চোখে না-দেখেও কী করে বাবা বুঝতে পারে! বাবার কি তৃতীয় নয়ন আছে?

সদানন্দ বলতেন, "না মা! নিতান্ত সাধারণ মানুষ তোমার বাবা। মাসের এই সময়েই আমাদের ইলেকট্রিকের বিল আসে—দু' দিন থেকেই আমি খোঁজ করছি। ঠিক সময়ে জমা না দিলে রিবেট কাটা যাবে।"

সদানন্দর সামান্য সংসার। রিবেটের কয়েকটা টাকারও বেশ মূল্য আছে।

সদানন্দ তখনই বলতেন, "এমন সংসারও আছে যেখানে মা লক্ষ্মী নিত্য বসবাস করেন। সেখানে মাসের গোড়াও যা, শেষও তা—সেখানে ইলেকট্রিকের বিল থেকে রিবেট পাওয়া গেলো কি না গেলো তা নিয়ে কাউকে অযথা মাথা ঘামাতে হয় না।"

সত্যবতী সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতেন। বলতেন, "লক্ষ্মী বড়ই

চঞ্চলা—একটু অনাদর হলেই তিনি চলে যান। যে-বাড়ির মেয়ে বাসি কাপড় ছাড়তে দেরি করে সেখানে কিন্তু লক্ষ্মী কিছুতেই থাকবেন না।" ইঙ্গিতটা যে মেয়ের প্রতি তা সদানন্দ বুঝতে পারেন, কিন্তু কিছুই বলেন না।

ক্রিং ক্রিং—সদানন্দর সাইকেল ধোপাপাড়া পেরিয়ে ছোট-ছোট গলি পেরিয়ে রেল ইয়ার্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বড় রাস্তা দিয়ে গেলে সদানন্দর আর একটু সময় কম লাগে। কিন্তু মন্নুর বারণ—ওই রাস্তায় সারাক্ষণ বড় বড় লরি চলে। মাল বোঝাই লরিওয়ালাদের মাত্রাজ্ঞান থাকে না। থাকবে কী করে? যত লরি বাড়ছে দেশে তত ড্রাইভার বাড়ছে না। খালাসি, ক্লিনার, লোডার এরাই তো অর্ধেক সময় ট্রাক চালাচ্ছে ড্রাইভারসাবকে বিশ্রাম দেবার জন্যে।

সদানন্দ আগে বড় রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাতেন। তারপর সেবার যখন দুর্ঘটনাটা ঘটে গেলো, ছোট ছেলেটাকে সকালে সুস্থসবল আমুদে দেখে গেলেন···কিন্তু বিকেলে যখন খবর পেলেন···না ওসব কথা এই সাত সকালে সাইকেল চালানোর সময় সদানন্দ চিন্তা করবেন না। সেসব তো কত বছর আগেকার কথা। তারপর তো কত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে—সংসারে নতুন মানুষ এসেছে। শশধর তখনই বলেছিল, "পৃথিবীতে সব জিনিস মনে রাখতে নেই। যে ভোলে সেই জেতে শেষ পর্যন্ত।"

না, ওই বিপদের সময়টা শশা খুব কাজে দিয়েছিল। এই হয়। যার আত্মীয় নেই, বিপদের সময় তার বন্ধু জুটে যায়। তারাই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেয়। না-হলে বিশ্বসংসার অচল হতো।

শশধরকে সে-কথা সদানন্দ বলেছিলেন, "তোমার ঋণ আমি

কোনোদিন শোধ করতে পারবো না।”

শশধর ধমক লাগিয়েছিল। “তা হলে আমাকে তো সপ্তকাণ্ড রামায়ণ লিখতে হয় তোমার গুণ গাইবার জন্যে। এ-কারখানায় আমার চাকরিটা হলো কী করে? এখানে আদৌ যে চাকরি খালি আছে সে খবরটা কে আমাকে এনে দিয়েছিল? এই সদানন্দ মজুমদার নিজে বাড়ি বয়ে খবরটা দিয়ে এসেছিল।”

সেটা এমন কিছু নয়, সদানন্দ জানেন। কারখানার নোটিশবোর্ডে তখনও চাকরি খালির নোটিশ টাঙানো হতো—সেইটা দেখেই শশধরকে খবরটা দিতে ছুটেছিলেন সদানন্দ।

সে কতদিন আগেকার কথা। শুধু খবরটা দেওয়া। বাকিটুকু শশধর নিজেই ব্যবস্থা করেছিল। একজন জানাশোনা লোকের মাধ্যমে চাকরির কোশ্চেন পেপার ফাঁস করিয়েছিল তখনকার দিনে আড়াইশ টাকায়। আজকাল ওই আড়াইশর দাম কত হাজার হয়েছে তা কে জানে।

কিন্তু শশধরের দুঃখ নেই। শশধর বলে, “বুঝলে সদা, ওই আড়াইশ টাকা ইনভেস্ট করে লাস্ট সাতাশ বছরে হপ্তার পর হপ্তা কত তুলে নিলাম একবার হিসেব করো। আমার তো তোমার মতন হাতের লেখা নয়—যে মুক্তাক্ষর দেখেই চাকরি হয়ে যাবে।”

♣

বন্ধু শশধরের সঙ্গে ওগিলভি ইণ্ডিয়ার মেন গেটের কাছেই সদানন্দর দেখা হয়ে গেলো। স্ট্যাণ্ডে দ্রুত সাইকেল-জমা দিয়ে গেটের ভিতর হাজরির কার্ড পাঞ্চ করে সদানন্দ বলে উঠলেন, “কী গো শশধর? তোমার যে একেবারে দেখাই নেই। ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছো।”

শশধর ছাড়বার পাত্র নয়। “দেখা হবে কী করে? নাইট ডিউটি দিয়ে মরছিলাম। এক হারামজাদা সুপারভাইজারের খপ্পরে পড়ে-

ছিলাম—হাড়ে দুবো গজাবার ব্যবস্থা হয়েছিল।"

"তারপর? এখন?" সদানন্দ একটু চিন্তিত হয়ে উঠলেন বন্ধুর কথায়।

"তারপর আর কি। ম্যানেজ করলাম। শনিবার অমাবস্যায় উপোস করে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি গিয়ে ব্যাটার বিরুদ্ধে পাঁচ-সিকে চড়ালাম। জাগ্রত মা! একেবারে হাতে-হাতে ফল।"

"বলো কি।"

"লোকে তো আজকাল এসব বিশ্বাস করে না। এক শনিবার ফুল চড়ালাম, আর পরের শনিবার মাল এখান থেকে বদলি হয়ে প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে চলে গিয়েছে। ব্যাটার ধারণা, বাঙালীরা নাকি কাজ করে না। যত কাজ-কম্ম নাকি ওই হরিয়ানা না কোথায় হয়। ধম্মের কল বাতাসে নড়েছে। এখন ভাবছি, সামনের শনিবারে গিয়ে মাকে আবার ফুল চড়িয়ে আসবো।"

"এখন কার কাছে রয়েছো?" জানতে চাইলেন সদানন্দ।

"ওই যে ফুটফুটে সায়েবটা—অমন পাকা সোনার মতন যার রং, বাপ-মা কা করে যে তার নাম রাখলো কৃষ্ণমূর্তি।"

"শশধর, আজ একসঙ্গে টিফিন করতে যাবো। ক্যানটিনের সামনে আমার জন্যে একটু দাঁড়িও।"

"অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে ব্রাদার ঠিক সময়ে এসো—তুমি তো আবার একটা বাজবার আধ মিনিট আগে হাত ধুতে যাবে না। তখন ক্যানটিনের সমস্ত বেঞ্চি অকুপাই হয়ে যাবে, পাশাপাশি দুটো সিটই থাকবে না।"

সদানন্দ হাসলেন। "সুধাংশুবাবু স্যরকে মনে নেই? টিফিনের ঘণ্টা বাজবার পরেও দু'-তিন মিনিট পড়াতেন।"

শশধর ছাড়বার পাত্র নয়। বলে উঠলো, "এই জন্যেই তো এই শহরটা উচ্ছন্নে গেলো—কেউ কিছু করতে পারলো না। কী করে অন্য লোককে টুপি পরিয়ে টু-পাইস করতে হয় সে ট্রেনিং দেবার মুরোদ

সুধাংশু ভট্টাচার্যের ছিল না বলেই তো আমাদের এতো দুঃখ।"

শশধর এবার নিজের ডিপার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে গেলো, আর সদানন্দ চললেন তাঁর কাজের দিকে।

নিজের শপে এসে শার্ট খুলে সদানন্দ একটা কলারওয়ালা টি-শার্ট পরে নিলেন। মন্টু এই ঝকঝকে শার্টটা ধর্মতলা থেকে কিনে এনেছে—মন্টুর ধারণা এই ধরনের জামা পরলে কাজের সুবিধে হয়।

ব্যাপারটা মিথ্যে নয়। মনের ওপর পোশাকের একটা ছাপ পড়ে। এই শার্ট পরলে সত্যিই একটু ইয়ং-ইয়ং মনে হয়। তাই জামাটা কারখানাতেই ব্যবহার করেন সদানন্দ।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সদানন্দ নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুপারভাইজার মিস্টার হাজারিকা বললেন, "আজ এই দু' হাজার প্যাকেট ইনসপেকশন সেরে ফেলা দরকার সদানন্দ।"

"সে আর এমন কি ব্যাপার। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, হয়ে যাবে।"

মিস্টার হাজারিকা বললেন, "প্যাকিংটা খুব ভালভাবে চেকিং করতে হবে। সেই সঙ্গে কিছু প্যাকেটের ওজন—এই ধরুন দশটায় একটা।"

আগে যে বারোটায় একটা চেক হতো, মনে করিয়ে দিলেন সদানন্দ। হাজারিকা বললেন, "এটা এক্সপোর্ট অর্ডার—একটু ভালভাবে দেখা দরকার। এখান থেকে সোজা চলে যাবে রটরডামে।"

"সে আবার কোথায়?" নগেন মহাপাত্র এবার প্রশ্ন করলো সদানন্দকে, সুপারভাইজার মিস্টার হাজারিকা একটু দূরে সরে যাবার পরে।

"মন দিয়ে ভূগোলটাও পড়োনি! রটরডাম হলো হল্যাণ্ড, যার আর এক নাম নেদারল্যাণ্ডস। খুব ছোট্ট জায়গা, কিন্তু প্রচুর পয়সা।"

"তা মরতে তারা আমাদের এখানকার মাল কিনতে যাচ্ছে কেন?" মন্তব্য করলো নগেন মহাপাত্র।

"হাজারিকা সায়েব বলেছিলেন, সায়েবরা এখন ভীষণ চালাক হয়ে গিয়েছে। দুনিয়ায় যেখানে সস্তায় ভাল মাল পাবে সেখানেই তারা অর্ডার পাঠাবে। শুধু জাপান নয়—কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান এসব দেশ নাকি সায়েবদের কাছে মাল বেচে লাল হয়ে গেলো।"

"সায়েবরা তা হলে কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছে—নিজেদের জিনিস নিজেরা তৈরি করবার গতর রাখছে না।"

সদানন্দ: "নগেন, এই কোশ্চেন আমি হাজারিকা সায়েবকে করেছিলাম। সায়েব আমাকে বললেন, ঠিক তা নয়, সায়েবদের গতরে ঘুণ ধরেনি, তবে তারা আরও সব দামী জিনিস তৈরি করছে যা দুনিয়ার লোক মোটা দাম দিয়ে কিনবে। ছোট্ট দেশ, মানুষের সংখ্যা খুব কম। সব জিনিস নিজের হাতে তৈরি করার মানে হয় না।"

সদানন্দ মন দিয়ে প্যাকেটের ওজনগুলো প্রথমে চেক করে নিচ্ছেন। মনের মধ্যে বেশ একটু গর্ব হচ্ছে।

মনুকে এবং ছোটসায়েবকে বলতে হবে, তাদের বাবার কোম্পানির জিনিস জাহাজে চড়ে কোথায় সেই রটরডাম সেখানে চলে যাবে।

অথচ সদানন্দর মনে আছে, এই জিনিসই একসময় ড্রামে বোঝাই হয়ে রটরডাম থেকে ওগিলভি ইণ্ডিয়ার কারখানায় আসতো। তখন সেই আমদানী-করা ড্রাম খুলে ছোট ছোট প্যাকিং তৈরির কাজ ছিল সদানন্দর।

আগে তৈরি হতো দু' পাউণ্ডের বাক্স। তারপর পাউণ্ড উঠে গেলো জহরলালের হুকুমে—এলো কিলোগ্রাম। উঃ! তখন কী উত্তেজনা! নয়াপয়সা, সেন্টিমিটার, কিলোগ্রাম এসব যে আদৌ কোনোদিন মানুষের মাথায় ঢুকবে বিশ্বাসই হয়নি। সবাই সন্দেহ

করেছিল, দেশের লোককে অযথা বিপদে ফেলবার জন্যে জহরলাল ইচ্ছে করে ঐসব হাঙ্গামা ইণ্ডিয়াতে ঢুকিয়ে সিকি-আনি-দুয়ানি, মাইল-গজ-ফুট, সের-পোয়া-ছটাককে দেশ ছাড়া করছ।

একটু পরে সদানন্দ বললেন, "নগেন, একটু হাত চালানো যাক। না-হলে চেকিং-এর কাজটা ঠিক সময়ে শেষ হবে না।"

"রাখুন দাদা। রটরডামের জাহাজ এখনই ছেড়ে চলে যাচ্ছে না। আর গেলেও আমার কী? আমি তো আর কারখানার বড় সায়েব নই।"

আজকালকার ছেলেছোকরাদের এই রকমই কথাবার্তা। কাজে এসেও হাত চালাতে চায় না কাজকর্ম সেরে তারপর গল্পগুজব হোক না।

সদানন্দ অন্য প্রজন্মের লোক। সুধাংশুবাবু স্যর বলেছিলেন, "কখনও কুঁড়েমি করে হাত গুটিয়ে বসে থেকো না, ভগবান মানুষকে দু'খানা হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন খাটবার জন্যে। স্বয়ং বিবেকানন্দ বলেছেন, মরচে পড়ে ধ্বংস হওয়ার চেয়ে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়া অনেক ভাল।"

সদানন্দ বললেন, "মিস্টার হাজারিকাকে আমি কথা দিয়েছি কাজটা তুলে দেবো।"

নগেন মহাপাত্র সন্তুষ্ট হলো না। "আপনি আমি খেটে মরবো, আর অফিসারদের মাইনে বেড়ে যাবে। আমি দাদা ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী নই—অফিসার সেবার জন্যে আমার জন্ম হয়নি। আমার নিজেরও ঘর-সংসার আছে—পেটের দায় না-থাকলে শালা এই সায়েবদের কথা কে শুনতো?"

এ-ধরনের কথা উঠলে চুপ করে থাকাই ভাল। সদানন্দ তাই করলেন। নগেন তবু ছাড়লো না। তার পরবর্তী মন্তব্য—"সায়েবদের সব কথায় হ্যাঁ বলার বদ অভ্যাসটা ছাড়ুন দাদা। ওইটুকু ছোঁড়া যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে বলে আমাদের মাথা কিনে

নিয়েছে নাকি? ওই সব কমবয়সী কেউটে সাপকে বেশি দুধকলা দেবেন না। দেখছেন না স্বভাবটা। আপনি বাপের বয়সী লোক—আপনাকে নাম ধরে ডাকলো।"

একটু লজ্জা পেলেন সদানন্দ মজুমদার। বললেন, "বিলেতে শুনেছি সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে, আমার জামাই বলছিল। আজকাল যারা শালকের বিলিতি ইস্কুলে পড়ছে তারাও নিজেদের সায়েব ভেবে ওইভাবে কথা বলে। আমার নাতনীকে সেন্ট অ্যাগনেসে ভর্তি করার খুব ইচ্ছে আমার মেয়ের। এখন টাইনি-টট নার্শারিতে পড়ছে।"

"দাদা, ওই ভুলটুকু করবেন না। বিলিতি ইস্কুল থেকে পাশ করলে নাতনীর বর পাবেন না। শেষে নাত-জামাইয়ের খোঁজ করতে আপনাকে ওই রটরডাম না কী বললেন ওখানে যেতে হবে।"

সদানন্দ এখন একমনে কাজ করে চলেছেন। ইতিমধ্যেই কয়েকটা প্যাকেটে গোলমাল বেরিয়েছে। ওজন কম।

সদানন্দ ভাবছেন মিস্টার হাজারিকাকে খবর দেবেন কিনা। নগেন মহাপাত্র বললো, "আর ঝামেলা বাড়াবেন না, দাদা। মাত্র দশ গ্রাম কম এক কিলোগ্রামের প্যাকেটে।"

"জাহাজে যেতে-যেতে জিনিসটা আরও শুকোতে পারে, নগেন।"

"দাদা সেই জন্যেই তো কোম্পানি নিজস্ব উকিলের পরামর্শ নিয়ে আইন বাঁচিয়ে রেখেছে—লিখেছে, প্যাকিং-এর সময় হাজার গ্রাম ওজন।"

সদানন্দ বিরক্ত হয়ে উঠলেন, "কী যে বলো, নগেন।"

নগেনও ছাড়বার পাত্র নয়। ঠোঁট উল্টে বললো, "এ তো তবু দশ গ্রাম দাদা। পরশু হাওড়া স্টেশনে পটল কিনলাম এক কিলো—বাড়িতে এসে মেপে হলো সাতশ। আপনি বলছেন সায়েবরা সব ধোয়া তুলসি পাতা? ওজন কম কাকে বলে জানে না?"

সদানন্দ সাবধান করে দিলেন, "রপ্তানি নিয়ে ছেলেখেলা নয় নগেন। আমার জামাই বলছিল, ওদের কারখানা থেকে পাঠানো দশটা বাক্স বিলেত থেকে ফিরে এসেছে। পার্টি ডেলিভারি নেয়নি। জিনিসের দাম তো দূরের কথা, ফেরত পাঠানোর জাহাজ ভাড়াও জগদীশের কোম্পানিকে দিতে হবে। কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর-এর এখন এতো কদর কেন জানো?"

"খুব জানি, দাদা। আমাদের পাড়ার কমরেড সত্য চাকী সেদিন বললেন, ওসব দেশ আমেরিকার তাঁবেদার হয়ে গিয়েছে। জাপানকেও আমেরিকান কলোনি বলতে পারেন। মহান বিপ্লব এসে একদিন ও-সব পাপ ধুয়ে মুছে দেবে।"

সদানন্দ বললেন, "সাহিত্যিক সুধাকর বলছিলেন, সিঙ্গাপুরে, কোরিয়ায় তৈরি মাল এতো ভাল যে খরিদ্দারকে কখনও তাকিয়ে দেখতে হয় না। ওজনে কম, মাপে কম এসব ওখানে কল্পনা করা যায় না।"

নগেনের প্রতিবাদ, "এসব হচ্ছে টাটা-বিড়লার অপপ্রচার। কমরেড সত্য চাকী নিশ্চিত, ডুনিয়ার মজদুর এক হলো বলে। তখন আর এক দেশের শ্রমিককে আর এক দেশের শ্রমিকের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার যুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া চলবে না।"

সদানন্দ ওসব কথায় কান দিতে রাজি নন। "ওসব বুঝি না, ভাই। তবে আমাদের ওগিলভি কোম্পানির একটা নাম আছে, ইণ্ডিয়ারও একটা নাম আছে। সুভাষ বোস, বিবেকানন্দর দেশের লোক ওজনে কম দেয় জানলে পৃথিবীর লোক খুব কষ্ট পাবে।"

নগেন ছাড়বার পাত্র নয়, "ওই সুখেই থাকুন। আমাদের পাড়ার ঘনশ্যামবাবু আমেরিকায় মেয়ের কাছ থেকে দেড় মাস ঘুরে এলেন। তা ওঁকে জিগ্যেস করলাম, উনি খুব দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন, আমেরিকানরা ওই সব মহাপুরুষের নামও শোনেনি। ঘনশ্যামবাবুর জামাইয়ের পাশের বাড়ির বুড়ো পর্যন্ত জিগ্যেস করলো, এই ভদ্রলোক দু'জন কারা? ঘনশ্যামবাবু বললেন, 'ভাইভেকানন্দ শিকাগোতে

এসেছিলেন বক্তৃতা করতে।' বুড়ো তখন ঘনশ্যামকে বললেন, ঘন, আমাদের দেশে প্রতিদিন অন্তত হাজার দশেক মিটিং হয়—কত লোক কত জায়গা থেকে বলতে আসছে তার হিসেব রাখতে গেলে কমপিউটার বসাতে হবে।"

খুব বিরক্ত হলেন সদানন্দ। কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি আপন মনে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। এই মালের লটটা বোধ হয় বিদেশে যেতে দেওয়া উচিত হবে না—এতে ওগিলভি ইণ্ডিয়ার বদনাম হবে।

ওগিলভি কোম্পানি এই ক' বছর আগেও আকারে কতটুকু ছিল! তারপর কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

তার কারণ কোম্পানির সুনাম। যে-প্যাকেটের গায়ে ওগিলভি কোম্পানির নাম লেখা থাকে তা মানুষ নির্ভয়ে কিনতে পারে। এই নামটা একটা সায়েবের, মানুষটাকে সদানন্দ ভালভাবে জানেন না। শুনেছিলেন, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে পিটার ওগিলভি একদিন লণ্ডন থেকে এই হাওড়া শহরে হাজির হয়েছিলেন। তারপর আবার বুড়ো বয়সে বিলেতে ফিরে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নামটা শিল্প উৎকর্ষের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওগিলভি নামটার জন্যে সদানন্দ নিজেও কিছুটা গর্ব বোধ করেন। একটা দায়িত্ববোধ যেন কোথা থেকে এসে পড়ে।

মিস্টার হাজারিকা শপে ঘুরে গেলেন কিছুক্ষণের জন্যে। মৃদু হেসে সদানন্দকে বললেন, "বিকেলে যেন অবশ্যই দেখা হয়। কথা আছে।"

সামান্য একজন ওয়ার্কারের সঙ্গে অফিসে কী আর কথাবার্তা থাকতে পারে? সদানন্দ মজুমদার এক্সপোর্ট প্যাকেটগুলো সাবধানে দেখে যেতে লাগলেন। সুধাংশুবাবু স্যার বলতেন, "প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের জয়তিলক ললাটে নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে। ছোট কাজ বলে কোনো কাজই নেই এই বিশ্বভুবনে। যে-কাজটাই

গোড়ায় আসে সেটাই পৃথিবীর সেরা কাজ বলে মনে করেন বিচক্ষণ ব্যক্তিরা।”

সদানন্দর খুব ইচ্ছে ছিল লেখাপড়া শিখে তিনি কোনো আপিসের অ্যাসিসট্যান্ট হবেন। তারপর একদিন বড়বাবু। ঝকঝকে তকতকে দপ্তরে সারাক্ষণ কাগজপত্র পরিবৃত হয়ে থাকবেন।

কিন্তু তা হয়নি—ভাগ্য অন্যরকম ব্যবস্থা করে রেখেছিল তাঁর জন্য। হয়েছেন কারখানার শ্রমিক—হপ্তা পান। প্রতি সাত দিন অন্তর মাইনে। তারপর নিজের সাধনায়, নিজের আন্তরিকতায় কিছু উপাজন বেড়েছে। অফিসে মাস-মাইনে, তার মানেই জাতে ওঠা। এই হপ্তা মাইনের মধ্যে কোথায় যেন একটু হীনমন্যতা রয়ে গিয়েছে। অথচ নগেন মহাপাত্র শুনে এসেছে ঘনশ্যামবাবুর কাছ থেকে—কানাডায়, আমেরিকায় বেশির ভাগ লোকই হপ্তা পেমেণ্ট পছন্দ করে, অনেকে হপ্তা অনুযায়ী বাড়ি ভাড়াও দেয়।

উইকলি-পেইড শ্রমিক বলে সদানন্দ কিন্তু নিজেকে নিচু মনে করেননি—বরং গোড়া থেকেই কর্মক্ষেত্রে অন্তর দিয়ে কাজ করেছেন। যে-কাজ সায়েবরা দিয়েছেন সদানন্দ তাই যথাসাধ্য করেছেন।

মানুষের সাধ্যেরও বোধহয় কোনো সীমা নেই। সুধাংশুবাবুই বলেছিলেন, “মানুষ যদি তার কর্মক্ষমতাকে বাড়াতে আরম্ভ করে তা হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। কোথায় যেন বেরিয়েছে, যে-কোনো মানুষই নিজের কর্মক্ষমতাকে প্রতি বছর শতকরা পনেরো ভাগ বাড়িয়ে যেতে পারে।”

দুপুরে শশধরের সঙ্গে সদানন্দর দেখা হলো। দুই বন্ধু ক্যানটিনের এক কোণে একটা ছোট বেঞ্চি দখল করলেন।

দুপুরে এই সময় সদানন্দ বেশি খান না। পেটে বেশী ভাত পড়লে গা ম্যাজ-ম্যাজ করে, কাজের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

শশধর বললো, “তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না, সদানন্দ।

ক্যানটিনে এক হাতা ভাত খেলেও যে ক'টা পয়সা লাগবে একথালা ভাত নিলেও তাই। আমাদের প্রীতম সিং, গুরুবক্স সিং সব তো দুপুরেই একবার করে পেট বোঝাই করে নেয়, যাতে রাত্রে আধঘটি জল ছাড়া কিছুই খেতে হয় না। তবে না প্রীতম সিং ছাপড়ায় দু'খানা টেম্পো চালু করেছে। গুরুবক্স কিনেছে ট্রেকার—রেগুলার যাতায়াত করছে ধানবাদ লাইনে।"

হাসলেন সদানন্দ। শশধর বললো, "তুমি এই পাখির আহার করো, তবু কোম্পানি বলে বেড়াচ্ছে ক্যানটিনে তিরিশ লাখ টাকা ভরতুকি ঢালতে হচ্ছে।"

"হতে পারে, শশধর। জিনিসপত্তরের দাম যেভাবে বাড়ছে। সেই যখন চাকরিতে ঢুকেছিলাম তখনও মিল-চার্জ ছিল তিরিশ, এখনও তিরিশ। সপ্তাহে তিন দিন মাছ, দু'দিন মাংস এবং একদিন ডিম দিতে গেলে খরচ তো হবেই।"

"তা বলে তিরিশ লাখ টাকা? অর্ধেক নিশ্চয় চুরি হচ্ছে। গ্যাঁড়া মারতে কোম্পানি সিদ্ধহস্ত। ইউনিয়ন তো তাই সন্দেহ করে। আমাদের মহান নেতা কমরেড সত্য চাকী বলেছেন, এবার ডিমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। ওগিলভি কোম্পানি ইচ্ছে করলেই সপ্তাহে তিন দিন চিকেন খাওয়াতে পারে। সায়েবদের ক্যান্টিনে কী মেনু হচ্ছে তার খবরাখবর নিচ্ছেন নেতারা।"

সদানন্দ বললেন, "শোনো শশধর, কাজের কথা। মন্টুর কাছে গিয়েছিলাম সকালে। ওর হুকুম, তোমাকে ও আমাকে আজ বাড়ি ফেরার পথে জামাইবাড়ি যেতে হবে। কারণটা মন্টু কিছুতেই বললো না।"

দুই বন্ধুতে গবেষণা আরম্ভ করলেন, কারণটা কী হতে পারে। "নিশ্চয় ভাল কিছু রান্না-বান্না করছে মন্টু, তাই তোমাকে-আমাকে খাওয়াতে চায়।"

"রান্না তো মন্টুর লেগেই আছে। কৌটোতে কিছু না একটা কিছু

আমার জন্যে রেখে দেয়।"

শশধর বললো, "তোমার বলা উচিত ছিল. শশাকাকা আগের মতন আর খেতে পারে না। শশধর আগে ছিল কচি শশা, আর এখন হয়েছে পাঁড় শশা। কারখানার ক্যানটিনে মাঝে-মাঝে যে বেশি খেয়ে নিই তা স্রেফ কোম্পানির ওপর রাগে—ওদের একটা পয়সা যাতে সাশ্রয় না হয় তা দেখবার জন্যে।"

শশধর জিজ্ঞেস করলো, "আজকে ওদের বিবাহ-বার্ষিকী নয় তো! কোম্পানির কাজে জীবনটা এমনভাবে নিবেদন করেছো যে কিছুই তোমার মনে থাকে না।"

না, আজ বিবাহ-বার্ষিকী নয়। তবে সদানন্দ বললেন, "ক'টা বছর কেমন ঝটপট কেটে গেলো। অথচ মন্নুর বিয়ে নিয়ে তখন আমার কী দুশ্চিন্তা!"

"তুমি শুধু-শুধু অতো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলে সদানন্দ। বিয়ের ফুল বলে একটা জিনিস আছে—কখন সেটা ফুটবে কেউ যদি ঠিক করে জানতো তা হলে হাজার-হাজার ঘটক এইভাবে করে খেতে পারতো না।"

ভাতের সঙ্গে একটু ডাল মেখে নিলেন সদানন্দ। আর শশধর বললো, "ডালের অবস্থা দেখছো। জলের মধ্যে থেকে ডাল খুঁজে বার করবার জন্যে পোর্ট কমিশনারের ডুবুরি নামাতে হবে।"

সদানন্দ বললেন, "মন্নুর সংসারটা সুখের হয়েছে, শশধর।"

"সুখের না-হয়ে উপায় আছে!" টিপ্পনি কাটলো শশধর। "তুমি যেভাবে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাকে প্রতি সপ্তাহে ঘুষ দিতে আরম্ভ করলে তাতে মায়ের অন্য কোনো পথ রইলো না!"

হাসলেন সদানন্দ। আর শশধর বললো, "তোমার মন্নুর বিয়ের ব্যাপারটা একসময় আমি গল্পের মতন করে লিখে ফেলবো। সব মেয়ের বাবা যদি এইভাবে মা কালীর কাছে চার্টার অফ ডিমাণ্ড

সাবমিট করে তা হলে মা নিশ্চয় কালীঘাট ছেড়ে বেপাত্তা হবেন।"

সদানন্দ হাসলেন। "আমি কী এমন চেয়েছি, শশধর? মনু তো আমার দেখতে-শুনতে খারাপ নয়—তা আমি একটি সচ্চরিত্র সদ্বংশজাত সদগুণের ছেলে চাইবো না তার জন্যে?"

"এই তিন ধুয়ো ধরে আড়াই বছরে তুমি কতবার আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দিয়েছো এবং কত ছেলে রিজেক্ট করেছো সেটা ভেবে দেখো, সদানন্দ।"

'তা বলে যার-তার হাতে মেয়ে দিয়ে দেবো? আমি যেমন অনেককে নাকচ করেছি, অনেকে তেমনি আমাকেও নাকচ করেছে, শশধর। মানুষ যেমনি শুনেছে, মেয়ের বাপ ওগিলভি কারখানায় সামান্য একজন ওয়ার্কম্যান, যেমন শুনেছে আমি পাশ করা লোক নই, যেমন শুনেছে টালির চালের বাড়িতে আমি থাকি তখন অনেকেই আর ফিরে আসেনি।"

শশধর বললো, "তোমারও দোষ ছিল। ঠিকা প্রজা-স্বত্বের বাড়িটা প্রায় তোমারই—মাসে দশ টাকা ভাড়ায় সারা জন্ম ভোগ করলেও কেউ তোমাকে তুলতে পারবে না। বি-এ এম-এ পাশ না হলেও তুমি বই পড়ো, সুধাংশু ভট্টচার্য্যির কাছে শিক্ষা পেয়েছো। আর ওগিলভি কোম্পানিতে তুমি কী করো তা অত সাতকাহন গেয়ে প্রত্যেক পার্টিকে বলার দরকার ছিল না।"

"ওই তো অনুকূল নিজের মেয়ের বিয়ে দিলো—স্রেফ বললো ওমুক কোম্পানির এমপ্লয়ি। ওই এক ইংরিজি কথার হাজার অর্থ—তুমি খোদ বড়সায়েবও হতে পারো আবার মিস্ত্রিও হতে পারো। তুমি যখন ভাল মানুষ হয়ে সব বলবে তখন তার ফলও ভোগ করতে হবে।"

"বুঝলে সদানন্দ, আমাদের সুধাংশুবাবু সব শিখিয়েছেন, কিন্তু নিজেকে কী করে দুনিয়ার হাটে চড়া দামে বেচতে হয় তা শেখাননি। শেখাবেন কী করে? নিজেই তো ব্যাপারটা জানতেন না; জানলে

অত সদগুণ, অত ত্যাগ, অত সাধনা নিয়েও অমন অখ্যাত অবস্থায় মারা যেতেন ? এর থেকে কত কম গুণ নিয়ে পৃথিবীতে কত লোক প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।"

"সুধাংশুবাবু প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ নয়, তুমি বলছো ?" সদানন্দ বেশ কষ্ট পাচ্ছেন।

"দু'চারটে ছাত্র মাঝে-মাঝে স্মরণ করলেই প্রাতঃস্মরণীয় হওয়া যায় না, সদানন্দ। একটা মিনিমাম সংখ্যা প্রয়োজন।"

এবার বাটি থেকে ডিমটা থালায় তুলে নিলো শশধর। "কী সাইজ দেখেছো, সদানন্দ ! ক্যানটিন ম্যানেজারের স্পেশাল রিকোয়েস্টে মুরগী এরকম মিনি ডিম পেড়েছে ! দেখলে মুরগী নিজেই লজ্জা পেয়ে যাবে।"

"আজ বিকেলে মনুর ওখানে তো যাচ্ছি আমরা।"

"মনু যে আমাদের কিছু না খাইয়ে ছাড়বে না তা তো আমরা জানি। কিন্তু তার সঙ্গে এই গুগিলভি কারখানার ডিমের কী সম্পর্ক ?"

সদানন্দ বললেন, "মনুর কাছে শুনেছি, জগদীশের সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং ক্যানটিনেও ডিম ছোট হয়েছে। হয়তো খরার প্রভাব, বুঝলে শশধর। খাওয়ার অভাবে এদেশের মানুষ এবং মুরগী দুই-ই ছোট হয়ে যাচ্ছে।"

"সে-কথাটা তো কোনো শালা ঝেড়ে কাশবে না। স্বাধীনতার পরে গভরমেন্টের বই থেকে কতকগুলো শব্দ তো উঠে গিয়েছে—এখন খরা হয় ! দুর্ভিক্ষ কথাটা মুখেও আনে না কেউ।"

সদানন্দ বন্ধুকে বললেন, "খেতে বসে অত রাগ করবে না। ওতে খাবার হজম হয় না।"

শশধর হেসে ফেললো। "বেশ বাবা ! কোম্পানির বিরুদ্ধে কেত্তন না করে শুধু মনুর কথাই বলবো এখন। তুমি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কয়েক বছর আগে যা করলে ! কতবার ঘটক

লাগালে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে। বললে, ভাল পাত্র না হলে মেয়ের আইবুড়ো থাকাই ভাল। শেষে বললে, ভাল ছেলে যেখানে পাবো সেখানেই বিয়ে দেবো—সে হিল্লি-দিল্লি যাই হোক। আমি বললাম, সদানন্দ, মেয়েকে মাঝে-মাঝে না দেখে তুমি থাকতে পারবে না। তোমার স্থানীয় ছেলে চাই।"

সদানন্দ বললেন, "তা মা সিদ্ধেশ্বরী মুখ তুলে চাইলেন—ছেলে কাছাকাছিই রয়েছে।" খবরটা শশধরই কোন ঘটক মারফত এনেছিল—ছেলে সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং-এ কাজ করে।

সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কীরকম কোম্পানি তা সদানন্দ তখন তেমন জানতেন না। "চাকরির সবচেয়ে দরকারি দিক হলো স্থায়িত্ব—ভাল কোম্পানিতে দশ টাকা মাইনে কম হলেও কিছু এসে যায় না। প্রায় একই সঙ্গে আর একটা সম্বন্ধ অনেকখানি এগিয়েছিল। ছেলে একটা প্রসাধনী কারখানায় কাজ করে—মাইনে সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং থেকে অনেক বেশি।"

শশধর রসিকতা করেছিল, "তুমি লটারি করো—যে ছেলের নাম উঠবে সেইটা নাও।"

সদানন্দ বলেছিলেন, "আমি সুধাকর নন্দীর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। সাহিত্যিক মানুষ, খবরের কাগজের অনেক আগাম খবর পান।"

তারপর এই ক্যানটিনেই বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, "সাহিত্যিকের দৃষ্টি আর তোমার আমার দৃষ্টিতে অনেক তফাত, শশধর। সুধাকর নন্দী মশাই বললেন, সেন্ট পাউডার ক্রিম এসব হলেও চলে না হলেও চলে। কিন্তু ইস্পাত, ইনজিনিয়ারিং এসব দরকার হবেই। একটু ট্যাঁকে টান পড়লেই মানুষ সেন্ট পমেটম কেনা বন্ধ করে দেবে, কিন্তু ইস্পাতে তা কোনও দিনই হবে না। তা ছাড়া আমাদের গরমেন্টও চায় না, দেশের এই অবস্থায় বেশি টাকা বিলাসিতায় খরচ হোক, তাঁরা চাইবেন ওই সব টাকা নতুন নতুন কলে-কারখানায়

নতুন নতুন-উৎপাদনে লাগুক।”

শশধর বলেছিল, “শালা, কোথায় ভাবলাম, জামাতা বাবাজীর কাছ থেকে দু'একটা সুগন্ধী স্যাম্পেল পাওয়া যাবে, তা না কী সব লেকচার দিয়ে দিলে।”

সদানন্দ আবার গিয়েছিলেন সুধাকর নন্দীর কাছে। উনি খবরাখবর নিয়ে বললেন, “সায়েবদের কোম্পানি—ম্যানেজমেন্ট ভাল না হয়ে যায় না। সায়েবদের অনেক গুণ সদানন্দবাবু, তাই না দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য এখনও ওদের হাতে।”

এরপর আর দ্বিধা করেননি সদানন্দ। জগদীশ লাহিড়ীর সঙ্গেই বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিলেন।

জগদীশরা তখন থাকতো কৈবর্তপুকুরের কাছে পৈতৃক বাড়িতে। ঠিকা প্রজা-স্বত্বের অনেকদিনের পুরনো বাড়ি, বহুদিন কোনো সংস্কার হয়নি। তবে সদানন্দ মজুমদার চিন্তা করেননি।

শশধরও বলেছিলো, “ভাগের মা গঙ্গা পায় না। এজমালি সম্পত্তির দশা কলকাতায় ওই রকমই হয়। এক পুরুষ রোজগারপাতি করে সম্পত্তি বানায় বুক ফুলিয়ে, আর দু পুরুষ পরে সেই সম্পত্তিতে টালি পাল্টাবার সামর্থ্য থাকে না। এই তো বিধাতার নিয়ম।”

“তুমি বলছো বটে, কিন্তু আমি লণ্ডনের পুরনো অঞ্চলের ছবি দেখেছি ম্যাগাজিনে—ওখানকার পুরনো বাড়িগুলো তো হাড় বের করা হয়নি।”

“আঃ, সদানন্দ!” বকুনি লাগিয়েছে শশধর। “ওরা হচ্ছে সায়েব, ওদের সঙ্গে বাঙালীদের তুলনা! শুধু সায়েবদের কেন? তুমি এখানকার মাড়ওয়ারিদের, পাঞ্জাবীদের, কালওয়ারদের দেখো—বংশ-পরম্পরায় ওদের বসত বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। বাঙালী জাতের প্রাণ-শক্তির অভাব, সদানন্দ। এ-কথাটা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেই

আমাদের অনেক দুঃখ মিটে যায়।”

কিন্তু মনুর শ্বশুরবাড়ির পরবর্তী ব্যাপারটা এই মুহূর্তে ভুলতে চান সদানন্দ।

বিয়ের ক'মাস পরেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল সদানন্দর। জামাইয়ের স্বভাব-চরিত্র ও জামাইয়ের চাকরির স্থিরতাই যে মেয়ের সুখের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় এটা বুঝতেও সময় লাগে।

এ-অভিজ্ঞতা সদানন্দর ছিল না। মানুষকে ঠেকে শিখতে হয়। সুধাকর নন্দী একটা গল্প লিখেছিলেন, ‘মেয়েকে পাত্রস্থ করার ব্যাপারে এতো কিছু জানবার আছে যে ট্রেনিং ইস্কুলের প্রয়োজন। কী করে শ্বশুর-শাশুড়ি হতে হয় এ-বিষয়ে কেউ কোচিং ক্লাশ খুললে সে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে।’

শশধর অবশ্য বলেছিল, “ওটা রসিকতা, সদানন্দ। মেয়েরা এ-দেশে যেদিন ভূমিষ্ঠ হয় সেদিন থেকেই তাদের শ্বশুরবাড়ি যাবার প্রশিক্ষণ শুরু হয়—সেই সঙ্গে তার বাবা ও মায়ের। যে যাই বলুক, এটা আমাদের রক্তে রয়ে গিয়েছে। যদি না তুমি এই শশধর সামন্তর মতন ভাগ্যবান হও”, এই বলে সে হা হা করে হাসতে লাগলো।

ইচ্ছে করেই বন্ধুকে আর ঘাঁটাতে চাইলেন না সদানন্দ মজুমদার। হঠাৎ একটা পুরনো স্মৃতিতে হাত পড়ে গিয়েছে।

শশধরেরও একটা মেয়ে আছে। সম্বন্ধ করে তারও বিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেছিল শশধর সামন্ত। কিন্তু হাঙ্গামা পোয়াতে হলো না। শশধরের মেয়ে খুকুমণি একদিন কাউকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করে বসলো।

শশধরও প্রথমে খুব রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, “রক্তপাত হবে।” টগবগ করে ফুটছিল শশধরের রক্ত। সদানন্দ দুদিন বন্ধু ও তার স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, “আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, এখানে চুপচাপ বসে থাকবে, ভাত-ডাল খাবে। আমার পারমিশন ছাড়া বাড়ি থেকে বেরুবে না।”

সেই সব বিপর্যয় কেটে গিয়েছে। শশধর ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। শশধর তারপরে অবশ্য বলতো "জামাইটা যে বাউণ্ডুলে হয়নি এই যথেষ্ট। রোজগার করে বউকে খাওয়াচ্ছে এই আমার সাতপুরুষের ভাগ্য।"

সদানন্দ উপদেশ দিয়েছেন, "আমরা নিমিত্তমাত্র, শশধর। বিধাতাপুরুষ জন্মমুহূর্তে জাতক-জাতিকার কপালে যা লিখে দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে জীবন চলবে, অন্য লোকের কিছু করার নেই।"

শশধর বলেছে, "তা হলে এতোদিন জীবন চালিয়ে, ধরে নিতে বলছো, বাপ মায়ের কোনো দায় দায়িত্ব নেই সন্তানের প্রতি।"

সদানন্দ উত্তর দিয়েছেন, "সুধাকর নন্দী একটা গল্পে লিখেছেন, দায় আছে, কিন্তু দায়িত্ব নেই! তোমার যতটুকু করার ততটুকু করে যেতে হবে। ওপরওয়ালার ইচ্ছে হলে সেটুকু চেষ্টা ফল দেবে, ইচ্ছে না-হলে গাছে জল ঢালাই সার হবে, ফল পাবে না।"

শশধর সেবার রাগে ও দুঃখে বলেছিল, "আমি অতশত বুঝতে পারি না, সদানন্দ। তোমার মাথা অনেক ঠাণ্ডা। তুমি অনেক ভাবতে পারো। এই ওগিলভি কোম্পানির ওয়ার্কম্যান না হয়ে তোমার উচিত ছিল কোনো আশ্রম খোলা। অনেক কষ্ট এবং দুঃখের পরে তোমার কাছে এসে মানুষ দুটো কথা শুনে তৃপ্তি পেতো।"

"আঃ, শশধর হচ্ছে কি! বুড়ো বয়সেও আমার পিছনে লাগার বদ অভ্যাসটা তোমার গেলো না।"

ক্যান্টিনে শশধর তখনকার মতন চুপ করে রইলো। আর সদানন্দ বললেন, "মনু আজ কেন আসতে বললো বোঝা গেলো না। জামাই তখন ছিল না। ও থাকলে ঠিক বলে দিতো।"

সদানন্দ বললেন, "শশধর, তোমার ও আমার কন্যাভাগ্য একই রকম। দুজনেরই প্রথমদিকে দুশ্চিন্তা ছিল। তারপর মেঘ কেটে গেলো। তুমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলে। কিন্তু খুকুমণির বর তো রোজগার ভালই করছে।"

শশধর বললো, "ভাল মানে বড্ড বেশি ভাল। এক-এক সময় দুশ্চিন্তা হয় সদানন্দ। সরকারি চাকরিতে উপরি আছে শুনতাম, কিন্তু এখন যা দেখি মাঝে-মাঝে অস্বস্তি বোধ করি। জামাই মানুষ, কী বলি। খুকুমণির এখন গা-ভর্তি গয়না। আরও গয়না গড়িয়ে আমার কাছে রাখবে বলছে। আমি এক-এক সময় ভেবেছি ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। খুকুমণির মা অবশ্য বললো, জামাই তো জোর করে টাকা নেয় না, লোকে দিয়ে যায়। ও না-নিলেও কিছু এসে যাবে না, ওর প্রাপ্যটা অন্য কারুর হাতে চলে যাবে।"

সদানন্দ ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছে শশধর যেন ওসবের মধ্যে না-থাকে।

শশধর বললো, "দেখো না, মেয়ে নতুন সাইকেল কিনে দিলো আপিস যাবার জন্যে। বলছে, বাবা তুমি স্কুটার বুক করে দাও, কেন কষ্ট করে অতোটা রাস্তা সাইকেল চালাবে? আমি বলছি, সারাজীবনই তো তাই করে আসছি, কিছু আসে যায় না। মেয়ের ধারণা, বাবার সময় বাঁচবে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে টুক করে কারখানায় পৌঁছে যাবে।"

♣

ক্রিং ক্রিং। দু'খানা সাইকেলের বেল একই সঙ্গে ধোপাপাড়ার সরুগলিতে ছোট বাড়িটার সামনে বেজে উঠলো। একতলা টিনের চালের বাড়ি, খুব পুরনো নয়। তারই সামনের অংশ।

শশধর এ-অঞ্চলটা খুব ভাল ভাবেই জানে। এই বাড়ির খবর শশধরই এনে দিয়েছিল সদানন্দকে। সদানন্দ তখন মেয়ে-জামায়ের মাথা গুঁজবার জন্যে একটা জায়গার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। বাড়িওয়ালা প্রথমে তিন মাসের সেলামি হেঁকে বসেছিল। অনেক বলে-কয়ে আড়াই মাসে রফা হয়েছিল। দরদস্তুর সবই করেছিল শশধর স্বয়ং।

সদানন্দও নিজে বাড়ি দেখে খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "একেবারে আলাদা অংশ, জল পায়খানা সব সেপারেট। শুধু বারান্দার একটা দিক ঘিরে রান্নাঘর করে নিতে হবে।"

দু'খানা ঘর। এক চিলতে ঠাকুর ঘরও রয়েছে। ইলেকট্রিকও আলাদা। "এটা খুব দরকারি কথা শশধর। না-হলে প্রতি মাসে বিল কে কত দেবে তা নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে প্রত্যেকবার খিটিমিটি। দু'পক্ষই ভাববে সে ঠকছে। কারুর মায়া-দয়াও থাকে না—দু'পক্ষই বেপরোয়া ভাবে ইলেকট্রিক খরচ করে যায়।"

শশধর বলেছিল, "এই দুনিয়ায় মানুষকে বোঝা ভার! এক সঙ্গে না-থাকলেও কোনো কাজ হয় না, অথচ আজও মানুষ কিছুতেই মিলে-মিশে থাকতে শিখলো না।"

সদানন্দ প্রথমে চুপ করে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন, "ভালবাসা না দিলে যে ভালবাসা পাওয়া যায় না এই সামান্য কথাটা আজকাল-কার জয়েণ্ট ফ্যামিলিতে লোকে ভুলতে বসেছে, শশধর। বিয়ের পরে মন্নুর জীবনটা তো আমি দেখছি।"

এরপর কথা বাড়ায়নি শশধর। শশধর জানে, মন্নুর শ্বশুরবাড়িতে প্রায়ই গোলমাল হচ্ছে, সুখ নেই ওখানে। সদানন্দর কোমলস্থানে হাত দিয়ে লাভ নেই।

সদানন্দ নিজেই শোনালেন, "সুধাংশুবাবু স্যার বলতেন, মানুষের বুকের মধ্যে অফুরন্ত ভালবাসা বিরাজ করছে। কিন্তু ভাই, জয়েণ্ট ফ্যামিলিতে তো এক ফোঁটা ভালবাসা দেখতে পাই না। মন্নুর মা অবশ্য আমার কথায় কান দিতে চায় না। সে এখনও ধরে বসে আছে, ভালবাসা জলের মতন মাটির অনেক নিচে লুকিয়ে থাকে। গর্ত খুঁড়ে, পাইপ ঢুকিয়ে তাকে টিউবওয়েলের জলের মতন ওপরে তুলে আনতে হয়। বুঝি না ভাই ওসব তত্ত্ব কথা! আমার অত ধৈর্য নেই। মেয়েটা যে কষ্ট পাচ্ছে এইটুকু দেখতে পাই। তার আলাদা আস্তানা না হলে সমস্যার সমাধান হবে না।"

মেয়ের জন্যে এই বাড়িটা খোঁজার ব্যাপার যেমন সুখের তেমন দুঃখেরও বটে। সত্যবতী সেদিন খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। স্বামীকে বলেছিলেন, "তুমি ওসবের মধ্যে থেকো না।"

'কেন থাকবো না?" বিরক্ত সদানন্দ প্রশ্ন করেছিলেন।

"থাকতে নেই বলেই থাকবে না।" সত্যবতী সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন।

'কোন বইতে লেখা আছে? কোন শাস্ত্রে বারণ করেছে মেয়ের সুখদুঃখের মধ্যে আমরা থাকতে পারবো না?" প্রশ্ন করেছিলেন বিরক্ত সদানন্দ।

'অতশত জানি না। বাবা-মায়ের কাছে শুনেছি। আমার বাবা-মাও জলে ভেসে আসেননি। আমার বিয়ের পরে তাঁরাও ইচ্ছে করলে তোমার সংসারে নাক গলাতে পারতেন। তাঁরাও ভাবতে পারতেন আদরের মেয়েটা অযথা খেটে মরছে, তার মনে সুখ নেই। কিন্তু কোনোদিন তাঁরা ওসবের মধ্যে ঢোকেননি, বরং আমার মা সারাক্ষণ বলতেন, শ্বশুরবাড়িতে তোমার বদনাম মানে আমাদেরই বদনাম।"

সত্যবতীর ঐসব কথা সেদিন উড়িয়ে দিয়ে সদানন্দ ভালই করেছিলেন। মেয়েটার মুখে না হলে হাসি দেখতে পেতেন না। না, কোনো খেদ নেই সদানন্দর মনে এখন।

দুই সাইকেলের আওয়াজ শুনেই মনোরমা হৈ-হৈ করে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো।

"উঃ শশাকাকা, এই আপনাদের আসবার সময় হলো। সেই কখন থেকে হাঁ করে বসে আছি। একদিন না-হয় মনুর জন্যে ওভারটাইম নাই করতেন।"

শশধর হাসলো। "তুই তো সব জানিস। শশাকাকার ডিপার্টমেন্টে

ওভারটাইম বলে কিছু আছে ?"

মন্টু গর্ব করে বললো, "ওদের কারখানায় প্রত্যেকদিন ওভারটাই হবেই, শশাকাকা। কিন্তু কাউকে বাড়তি সময় থাকতে হয় না ইউনিয়ন চাপ দিয়ে করিয়ে দিয়েছে।"

"সে কিরে! উপরি সময় না থেকে উপরি মাইনে—তা হ রামরাজ্য তো দেরি নেই!"

সদানন্দ কিন্তু খবরটা শুনে সন্তুষ্ট হলেন না। "কারখানায় কা না-করে কাজের দাম নেওয়া—এটা তো ভাল কথা নয়।"

জামাই জগদীশ কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে একমত হলো না। সে গর্বে সঙ্গে বললো, "এখন বাবা ইউনিয়নের যুগ। প্রোডাকশনের কো কাজই উঠবে না থাউকো ওভারটাইম না দিলে। কাজে ঢিলে দি কোম্পানিকে কী করে টাইট দিতে হয় তা আমাদের ইউনিয়নে নেতারা খুব ভালভাবে জানে। ম্যানেজমেন্ট খাপ খুলেছে কি মরেছে।"

জামায়ের সঙ্গে তর্ক বাধানো শ্বশুরের পক্ষে শোভন নয়। ত সদানন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, "কী জানি বাবা। আরও কত ক দেখবো।"

শশধর কিন্তু মোটেই অখুশি হলো না। বন্ধুকে বললো, "ও বাবা, ভুল কোরো না, ওটা তোমার ওগিলভি কোম্পানি নয় সারাক্ষণ পিঁপড়ের পোঁদ টিপে টাকার হিসেব করবে। তোমা জামাইয়ের কোম্পানিটার নাম যে সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং এট সারাক্ষণ মনে রাখবে। অনেক ভাগ্য করলে ওখানে ঢোকা যায়।"

জামায়ের ঘরের মধ্যে ঢুকতেই রহস্যটা পরিষ্কার হলো। মন্টু হে বললো, "লাস্ট একমাস ধরে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ইচ্ছে করেই তোমাকে কি বলিনি। আজ সকালে তোমার জামাই নিজে গিয়ে টিভি নি এসেছে। তারপর সমস্ত দুপুর ধরে অ্যানটেনা খাড়া করেছে টি কোম্পানির লোকরা। আমি বলেছি, বাবা না এলে উদ্বোধন হ না। বাবা প্রথম বোতাম টিপবে।"

মেয়ের বাড়িতে টিভি, বাবার আনন্দ হবারই কথা। সদানন্দ বললেন, "ওরে বাবা, তুই যে সত্যিই মাননীয় মন্ত্রীদের মতন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করছিস। ফুলের মালা পর্যন্ত টিভি সেটের ওপর রেখেছিস।"

মন্নু বললো, "কয়েক হাজার টাকার জিনিস—প্রথম দিনে ঠাকুরের নাম করে একটা ফুলের মালা দেবো না?"

খুব ভাল লাগছে সদানন্দর। নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারছেন না তিনি। তাঁদের পাড়ায় টিভি এসেছে—কিন্তু উকিল শম্ভু চাটুজ্যের বাড়ি এবং ডাক্তার ত্রিগুণা হাজরার বাড়িতে। বাকি সব বাড়ির ছাদে এখনও অ্যানটেনা ওঠেনি। তাঁর চেনাজানা লোকরা এখনও রেডিও শোনে।

সদানন্দর নিজেরও একটা রেডিও আছে—পুত্র তড়িৎ সেইটা নিয়েই সারাক্ষণ পড়ে থাকে। রাত্রেও ট্রানজিস্টরটা ওর বালিশের পাশে থাকে। আওয়াজটা একটু খ্যান-খ্যানে হয়ে গিয়েছে—ওই ফাটা কাঁসির মতন শব্দের জন্যে শুক্রবারের বেতার নাটকটা শুনে তেমন মন ভরে না।

টিভি! সে তো অবস্থাপন্ন গণ্যমান্য লোকদের জন্যে। আপিসের সায়েবদের বাড়িতে ওসব রাখতে হয় যাতে মেমসায়েবরা কোনোক্রমেই একঘেয়েমি অনুভব না করেন।

জগদীশ বললো, "আমাদের কারখানায় অনেকে ওয়ার্কার এ-বছরে টিভি কিনছে।"

মন্নু বললো, "জানো বাবা, টিভি প্রোগ্রাম নিয়ে ওদের কারখানায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকরকম তর্কাতর্কি হয়—ও এতোদিন বোকার মতন শুনতো কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারতো না, প্রায়ই লজ্জায় পড়ে যাচ্ছিল। ওর বন্ধুরা বলছিল, কতদিন আর কূপমণ্ডুক হয়ে থাকবি? একটা টিভি কেন! পৃথিবীটা ছাখ!"

সদানন্দর প্রস্তাব, "শশধরই টিভির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করুক।

ওই তো অনেক খেটেখুটে তোর বিয়ের সম্বন্ধটা এনেছিল।"

হাঁ-হাঁ করে উঠলো শশধর। "তোমার বাপের মতন লোক থাকতে আমি। কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

দেওয়ালের সুইচ অন করে টিভির বোতাম টিপতেই পর্দায় চমৎকার ছবি ভেসে উঠলো। "আহা ঠিক যেন মনুর ঘরের মধ্যেই শিল্পিরা আসর জাঁকিয়ে বসলো। কী যুগ এয়েছে পৃথিবীতে!"

আনন্দিত শশধর বললো, "যুগ-যুগ বেঁচে থাকো তোমরা। সদানন্দ, দু' বছরের মধ্যে তোমার মেয়ে-জামাইয়ের ভি-সি-আর হোক—ভিডিও সংসারে যেন সুখের শেষ না থাকে।"

মনু এবার পাশের ঘর থেকে দুই বিশিষ্ট অতিথির জন্য খাবার আনতে গেলো।

মনুর রান্না মুখে দিয়ে সদানন্দ বুঝলেন, তাঁর মেয়ের রান্না অনেক ভাল হয়ে গিয়েছে।

অথচ একসময় এই নিয়ে সত্যবতীর কত দুশ্চিন্তা ছিল। বলতেন, "আদর দিয়ে-দিয়ে খোদার খাসি তৈরি করছো! শ্বশুরবাড়ি গিয়ে রাঁধবে কী করে?"

আজ বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে বলতে হবে, মনুর রান্নাটা ঠিক ওর মায়ের মতন হয়ে উঠেছে।

মনু রেঁধেছে আলুর দম আর মাছের চপ। খেতে খেতে সদানন্দ বললেন, "চপটা বেশ হয়েছে মনু।"

মনু বললো, "বাবা এটা চপ নয়, ফিশ কেক। একটু আলু মিশিয়ে নিলে কম মাছেই হয়ে যায়।"

মনু তাহলে হিসেব করতেও শিখেছে! খুব আনন্দর কথা। আসলে প্রয়োজনে পড়লে মানুষ সবই বুঝে নেয়—জলে না পড়িলে কেহ শিখে না সাঁতার।

টিভি কেনার এতোগুলো টাকা কোথা থেকে এলো, সদানন্দ চিন্তা করছিলেন।

মন্নু নিজেই বাবা ও শশাকাকাকে জানিয়ে দিলো, "ভাল কোম্পানিতে চাকরি থাকলে আজকাল কিছুই নগদে কিনতে হয় না। টিভির দোকানে হাজার টাকা জমা দিয়েছি পোস্টাপিস থেকে টাকা তুলে, বাকি মাস-মাস শোধ হবে। তোমার জামাইয়ের কারখানার একটা স্পেশাল প্রেস্টিজ আছে, বাবা। টিভির দোকানদার তো ওর কারখানার আইডেনটিটি কার্ড দেখে এক কথায় কিস্তিতে জিনিস দিতে রাজি হয়ে গেলো।"

সদানন্দর মনে পড়লো, জগদীশ স্কুটারটাও ওইভাবে কিনেছে। এখন চড়ো, পরে টাকা দাও স্কিমে। "বাবা, এর নাম ফ্রি মোবাইল স্কিম!" বললো জগদীশ।

"পাখা দুটোও ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে, বাবা", মন্নু সগর্বে জানালো।

খুব খুশি হতে পারলেন না সদানন্দ। সুধাংশুবাবু স্যার বলতেন, "এ সংসারে কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না—সব জিনিসের জন্যে মূল্য দিতে হয়। হাতে-হাতে দাম না দিলে খরচ আরও বাড়ে।"

এসব চিন্তাকে শশধর পাত্তা দিলো না। বললো, "নিজের সামর্থ্যের মধ্যে থাকা—ওসব হলো পুরনো বস্তাপচা ধারণা, সদানন্দ। এখন যে যত বড়লোক সে তত বেশি ধার করে। তুমি আমাদের ওগিলভি কোম্পানির কথা ধরো—কোম্পানি কত টাকা বাজারে ধার করেছে জানো? তেত্রিশ কোটি টাকা। তেত্রিশ কোটি দেবতা ধরলে মাথা-পিছু এক টাকা—কিছুই নয়।"

সদানন্দের সত্যিই মনে হলো তিনি সেকেলে হয়ে গিয়েছেন। কিস্তিটা ঠিক ধার নয়, একটা আধুনিক জিনিস। খাটো, রোজগার করো, ভোগ করো, কিস্তি দাও, এর মধ্যে কিন্তু-কিন্তু কিছু নেই।

মন্নু বললো, "বাবা তুমি এতেই চিন্তা করছো! ওদের কারখানায় অনেকে কিস্তিতে ফ্রিজ কেনা শুরু করেছে। বাড়িতে একটা ঠাণ্ডা আলমারি থাকলে কত সুবিধে বলো তো!"

জগদীশ সগর্বে বললো, "সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কোম্পানির নাম শুনলেই ফ্রিজের দোকানদারও খাতির করবে, বাবা।"

সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কোম্পানির জন্যে সদানন্দ মনে-মনে গর্ব বোধ করলেন। শশধর হঠাৎ বলে বসলো, "সদানন্দ, এ তোমার সাধের গুগিলভি কোম্পানি নয়। সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির ইউনিয়ন জানে কী করে ম্যানেজমেন্টের ট্যাঁক থেকে পয়সা বার করতে হয়।"

"যে যেরকম খরচ করতে পারে, শশধর। যার যে রকম ব্যবসা।"

শশধর খ্যাঁক করে উঠলো। "না গো না। রস বার করে নেবার কায়দা জানা চাই। খেজুর গাছ দেখলে কী শুকনো কাঠ ছাড়া কিছু মনে হয়? কিন্তু যারা কায়দা জানে তারা ঠিক রস বার করছে। তবে মিষ্টি কথায় রস বেরোয় না, একটু-আধটু চাঁচতে হয়।"

মন্টু সগর্বে স্বামীর কারখানার প্রশস্তি শুরু করলো, "ওদের খুব ভাল কোম্পানি, বাবা। ওয়ার্কারদের হাত ধোবার জন্যে প্রত্যেক সপ্তাহে যা সাবান দেয় তাতে আমার চার সপ্তাহের কাচাকাচি হয়ে যায়। ম্যানেজমেন্ট বোঝে অনেক সাবান বাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই—ইউনিয়ন ভীষণ কড়া। সাবান কমালেই কারখানার প্রোডাকশন অর্ধেক হয়ে যাবে।"

জগদীশ বললো, "যারা সুইডিশ কারখানার টাউনশিপে থাকে তারা কয়লা পায়। সারা মাসের ইলেকট্রিকের জন্যে মাত্র দু টাকা দিতে হয়। তাই অনেকে সুইচই নেভায় না। খরচ তো কোম্পানির। আমরাও দাবি করছি, যারা বাইরে থাকে তাদেরও দু'টাকায় ইলেকট্রিক দিতে হবে। কিন্তু একটা পাজি জেনারেল ম্যানেজার এসেছে সে এসব কথা কানে তুলছে না। ইউনিয়নের নকুড়বাবু বলেছিলেন, এই বজ্জাতি করলে শ্রমিকদের হয়তো সংগ্রামের পথে যেতে হবে।"

শশধর বললো, "সদানন্দ; আমাদের ম্যানেজারকে একবার সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কারখানায় পাঠালে হয় ট্রেনিং-এর জন্য—কর্মীরা

কীসব সুখসুবিধে ভোগ করছে তা নিজের চোখে দেখে যদি ওঁর একটু চক্ষুলজ্জা হয়।"

মনু ইতিমধ্যে একটা প্লাসটিকের টিফিন কৌটোতে কিছু খাবার পুরে ফেলেছে। "ছোটসায়েবকে দিতে বলো, একটু গরম করে। মায়ের তো আজ ব্রতর দিন, মাছ মাংস ছোঁবে না।"

"বাঃ! আছো বেশ সদানন্দ! জামাইবাড়ি খাওয়া-দাওয়াও করলে আবার ছাঁদাও বাঁধলে।" রসিকতা করলো শশধর।

সদানন্দও ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, "ভাগ্য করে আসতে হয়, শশধর। এই সম্বন্ধ ঠিক করতে আমাকে কত খুঁজতে হয়েছে তা তো তুমি জানো।"

বাড়িতে গৃহিণী সত্যবতী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। সদানন্দকে বললেন, "তোমার কি লাজলজ্জা নেই? রোজ জামাইবাড়ি গিয়ে খেয়ে আসছো।"

"মনু বার-বার করে বললো তাই তো গেছি। না গেলে ওর নতুন টিভিটা দেখাই হতো না।"

টিভির খবরটা পেয়ে সুখী হলেন সত্যবতী। "মা, মা! দেখো এদের," চোখ বুজে প্রার্থনা করলেন সত্যবতী। "মনুকে বলতে হবে, সিদ্ধেশ্বরী তলায় যেন পুজো দিয়ে আসে টিভির জন্যে। সংসারে ভাল কিছু এলে প্রথমেই মাকে মনে করতে হয়।"

সদানন্দ বললেন, "আমি বসে নেই। বাড়ি ফেরবার পথে ওদের নাম করেই ঠাকুরের থালায় পাঁচটা টাকা দিয়ে এসেছি।"

কথাটা শুনে খুব খুশি হলেন সত্যবতী। স্বামীর যত দোষই থাকুক, এই ঠাকুর-দেবতার ব্যাপারে কিছুই ওঁর নজর এড়ায় না।

সত্যবতী মানুষটি সাদাসিধে। এই পঞ্চাশ বছর ধরে গৃহস্থ বাঙালীর সরল মূল্যবোধ ও বিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপন করে আসছেন।

সদানন্দ মাঝে ভেবেছেন, বিশ্বসংসারটা কীভাবে চলছে, এই কল-কারখানায় কীভাবে মানুষ রুজি-রোজগার করছে, কীভাবে আমরা সবাই প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছি, এ-সব কথা বোঝাবেন সত্যবতীকে। সত্যবতীর কিন্তু এসবে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। তাঁর ধারণা, কল-কারখানা নয়, ঠাকুর-দেবতার দয়াটাই আসল কথা, ওঁরা সন্তুষ্ট থাকলে লক্ষ্মীর প্রসাদ থেকে কোনো সংসার বঞ্চিত হবে না।

এই যে ছোটসায়েবের জন্যে স্বামী খাবারের কৌটো নিয়ে এসেছেন জামাইবাড়ি থেকে, এতেও লজ্জা লাগলো সত্যবতীর। "তুমি কী যে করো।"

সদানন্দ উভয় সঙ্কটে পড়ে গিয়েছেন। নিজে একটা ভাল জিনিস খেলেন, আনন্দ হলো। একজন সেই ভাল জিনিস ছেলেকে পাঠাতে চাইছে, তিনি কীভাবে সন্তানকে বঞ্চিত করেন? আবার সামাজিকতার প্রশ্ন তুলছেন গৃহিণী। শেষে সদানন্দ বললেন, "আসল কথাটা হলো আন্তরিকতা। শুধু মন্নুর কথাতে আমি খাবারের কৌটো আনতাম না, যদি-না জগদীশ নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো।"

সত্যবতী বিছানায় শুয়ে বললেন, "ছোটসায়েবের একটা চাকরি জুটলে মা সিদ্ধেশ্বরীকে আমি সোনার নথ গড়িয়ে দেবো। কী যুগ পড়লো বাবা? ছোটসায়েব বলে কিনা, নথ গড়িয়ে দিতে হবে, তবে ঠাকুরকে নয়, যিনি চাকরি করে দেবেন তাঁর বউকে!"

এই চাকরির ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর। ছেলেটা বেকার বসে আছে। কয়েকজনকে খবরাখবর রাখতে বলেছেন সদানন্দ। কিন্তু কেউ তেমন গায়ে মাখছে না।

এই মুহূর্তে ছেলের চাকরির কথাটা ভাবতে চাইছেন না সদানন্দ। রাতের ঘুমটা নষ্ট হবে। শুধু ভেবেই যাবেন, কোনো পথ খুঁজে পাবেন না।

সেবার প্রায় সারা রাত ধরে কেবল ঐ একই ভাবনা, যা চাকরি-বাকরির অবস্থা, ছেলেটার কী হবে। কাজের বাজার মোটেই ভাল নয়। অবশেষে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ফেললেন সদানন্দ।

হঠাৎ সদানন্দ দেখলেন, ছেলে সাধারণ কাজ নয়, খোদ অফিসারের চাকরি পেয়েছে। তারপর অদ্ভুত কাণ্ড। সদানন্দ দেখলেন, ছোট-সায়েব তার বাবার ডিপার্টমেন্টেই অফিসার হয়েছে। শশধর তখন বন্ধুর সঙ্গে রসিকতা করছে, 'এবার ছেলের হুকুম অমান্য করবে কী করে?' মিষ্টি হেসে সদানন্দ উত্তর দিচ্ছেন, 'সায়েবের হুকুম মানবো না কেন? কোনো সায়েবকে তো কখনও অমান্য করিনি।' দূর থেকে সদানন্দ হঠাৎ দেখলেন, তাঁর ছোটসায়েব শাদা শার্ট, রঙীন টেরিলিন প্যান্ট ও নীল রঙের সিল্ক টাই পরে তাঁর ডিপার্টমেন্টের দিকে গটমট করে হেঁটে আসছে। সদানন্দ তখন ভাবছেন, ছেলেকে তিনি কী বলে সম্বোধন করবেন। মিস্টার তড়িৎ মজুমদার অথবা ছোটসায়েব বলে ডাকার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারখানার একটা ডিসিপ্লিন বলে কথা আছে! তাহলে কি 'স্যার' বলতে হবে তাঁকে? এইসব কথা ভাবছেন, এমন সময় ঘুমটা ভেঙে গেলো। মশারির মধ্যে অনেকগুলো মশা ঢুকে পড়েছে। ফুটোর সংখ্যা ডজনখানেক!

সত্যবতীর সঙ্গে ওই প্রসঙ্গ তুলে আজকের ঘুমটা নষ্ট করবেন না সদানন্দ। তিনি বিছানায় ঢুকবার সময় দেখে নিয়েছেন ফুটোগুলো সব ক'টা সযত্নে মেরামতি করেছেন সত্যবতী।

সত্যবতী জানতে চাইছেন, "জামায়ের টিভিটা কেমন দেখলে?"

"মনুর ঘরখানা অন্য রকম দেখতে হয়ে গিয়েছে! প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেলে খুব ভাল লাগে। কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া কমে যায়। টিভি ছাড়া আজকাল সত্যিই সংসার মানায় না।"

যে-জামাই টিভি কিনে ফেলে সে অর্ডিনারি জামাই নয়। "এই জামায়ের সঙ্গে তুমি মেয়ের বিয়ে দিতে দ্বিধা করেছিলে!" এবার

সুযোগ বুঝে স্বামীকে মিষ্টি খোঁচা দিলেন সত্যবতী।

"সে তো অন্য ব্যাপার। মেয়ের বিয়ে তো একবারই হবে। আর বিয়ে হয়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। সুতরাং যথাসম্ভব ভেবেচিন্তে তো দেখতেই হবে।"

"তোমার খোঁজখবরের চাপে আগের পাত্রটা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তুমি কী বলে থানার মেজ দারোগাকে ছেলের খোঁজ নিতে বলেছিলে?"

একটু অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছেন সদানন্দ। "মেজ দারোগা যদি আমাদের ইস্কুলের ছাত্র হয়, সুধাংশুবাবু স্যরের কাছে যদি পড়ে থাকে, তাহলে আমি তাকে অনুরোধ করতে পারি না? পুলিশের কাছে মানুষ সম্বন্ধে কত বেশি খবর থাকে তা তুমি জানো?"

"পুলিশ কাউকে ভাল বলে না!"

"বলে। কেন বলবে না? পুলিশেরও তো জামাই দরকার হয়। তোমার জগদীশের ব্যাপারে তো ভালই বলেছিল।"

সত্যবতী এবার স্বামীকে একটু বিপাকে ফেলতে চান। "পুলিশ ভাল বলা সত্ত্বেও তো তুমি দেড় সপ্তাহ কিন্তু-কিন্তু করেছিলে!"

সেটা কেন, তা সত্যবতী ভালভাবেই জানেন। পাত্রের পরিবারের কথা ভাবছিলেন সদানন্দ। শ্বশুর শাশুড়ি দেওর ননদ নিয়ে জগদীশের সংসারটা বেশ বড়। সত্যবতী তখন খোঁটা দিয়েছিলেন, "তুমি আর লোক হাসিও না। আকাশ থেকে নেমে লেখাপড়া-শেখা ছেলে আপিসে কাজ করতে যায় না। চব্বিশ বছর ধরে কেউ তাকে প্রতিপালন করে, তবে সে রোজগেরে হয়। মেয়ে দেবার সময় সবাই বোঁটা ছাড়া ফল খুঁজলে কী করে চলবে?"

সদানন্দ শেষ পর্যন্ত আপত্তি করেননি। হাজার হোক জামায়ের মাথার ওপর নিজস্ব ছাদ রয়েছে, তা টালির চালের হলেও। শ্বশুর কাজ করেন, বেশ কর্মক্ষম রয়েছেন এখনও। দুই ভাসুরও কাজ করে। দেওর আছে। শাশুড়ি এখনও রানী ভিক্টোরিয়ার মতন রাজত্ব

চালাচ্ছেন। আইবুড়ো ননদও রয়েছে গোটা দুয়েক। সদানন্দ ভেবেছিলেন, ভালই হলো, মনু সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে সুখে থাকবে।

সদানন্দ এবার পাশ ফিরলেন। গৃহিণী কি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন? ওঁর মস্ত সুবিধে এইটে—ঘুমের পা-ধরে কখনও ওঁকে সাধ্য-সাধনা করতে হয় না।

সদানন্দর এবার মনে পড়ছে, মনুর বিয়ের কয়েক মাস পরেই শ্বশুর-বাড়িতে অশান্তি শুরু হলো। সদানন্দ দেখলেন, মনুর শরীর শুকনো হয়ে যাচ্ছে। অমন সুন্দর রঙ ক্রমশ পুড়ে যাচ্ছে।

সত্যবতী প্রথম দিকে সদানন্দকে এসব বিষয়ে বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে দিতেন না। বলতেন, "তোমার মেয়ে কোনোকালেই হৈমবতী ছিল না। চিরকালই ওর রঙ কালো, আর তুমি ভাবছো মনু মেমসায়েব।"

"কিন্তু রোগা হচ্ছে কেন? বিয়ের জল পড়লে মেয়েদের তো এইসময় একটু মোটা হওয়ারই কথা।"

"এখন কোনো মেয়েই বিয়ের পরে গায়ে-গতরে মোটা হতে চায় না। এইটাই এযুগের নিয়ম—যত হাল্কা তত সুন্দরী।" সত্যবতী আবার মুখ ঝামটা দিয়েছেন স্বামীকে।

সে সব তো কলকাতার সায়েব পাড়ায়। গঙ্গার পশ্চিম পারে এই কৈবর্তপাড়ায়, ছুতোরপাড়ায়, জেলেপাড়ায় মা-দুর্গার মতন মেয়েদেরই তো নামডাক। মহিষাসুরমর্দিনী মা-দুর্গা তো হাড়-জিরে-জিরে রোগা নন। গায়ে একটু মাংস না-থাকলে দুর্দান্ত অসুরের সঙ্গে অমনভাবে লড়বেন কী করে?

সত্যবতী বলেছেন, "তুমি কারখানার কাজ জানো, ওই নিয়ে ব্যস্ত থাকো। হাড়-জির-জিরেদেরই আজকাল 'সিলিম' বলে, সেই রকমই হতে চায় সব মেয়ে।"

"তাই যদি হবে, তা হলে মনুর ননদ দুটি তো বেশ 'পুরুষ্টু'।"

"ও মা!" জিভ কেটেছেন সত্যবতী। "তুমি মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পরের মেয়ে কী রকম গোলগাল তার দিকেও নজর রাখছো?"

"নজর রাখতে হয় না! কোথাও গিয়ে দু-দণ্ড বসলেই সব নজরে পড়ে যায়।" সদানন্দ তর্ক করেছেন স্ত্রীর সঙ্গে। "না-হলে কুটুমবাড়ি কেন? কন্যাসম্প্রদায় করে একেবারে হাত-পা ধুয়ে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেই হয়। বাপ-মা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের খবর করবেই।"

সত্যবতী তখনকার মতন জিতলেও, কিছুদিন পরে লক্ষ্য করেছেন, মনু সত্যিই রোগা হয়ে যাচ্ছে।

চিন্তিত সদানন্দ বলেছেন, "আমি ভাবছি তারিণীডাক্তারকে একদিন ওখানে নিয়ে যাই। পকেট থেকে ফি দিয়ে মেয়েটাকে একটু ভাল করে দেখিয়ে নিই।"

সত্যবতী সন্তুষ্ট হননি। "লোকে-তোমাকে পাগল বলবে। তেমন দরকার মনে করলে এখানে এনে লুকিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে দাও।"

"তুমি বেশ বলো! কিছু লুকনো যাবে? তারিণীডাক্তার তো ওষুধ দেবে। সেই সব ওষুধ শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে খাবে কী করে?"

সত্যবতী আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন, "গোত্রান্তর হলে মেয়েদের সব পাল্টে যায়। তারিণীডাক্তার তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির ডাক্তার নয়।"

ডাক্তার না নিয়েই সদানন্দ কয়েকবার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছেন। খুব স্বস্তি বোধ করেননি। ওখানে আন্তরিকতার অভাব অনুভব করেছেন।

সত্যবতী তখনও স্বামীর সঙ্গে একমত হননি। "জামাই-বাড়িতে গিয়ে তুমি নিজের জন্যে কী করে জামাই আদর প্রত্যাশা করলে?"

মণ্ডামিঠাই আশা করেননি সদানন্দ। আন্তরিকতার সঙ্গে মেনুর

সাইজেরও কোনো সম্পর্ক নেই অনেকসময় এক কাপ চা দিয়েও চূড়ান্ত আন্তরিকতা দেখানো যায়।

সত্যবতী তখন স্বামীকে বুঝিয়েছেন, "শোনো, আগাম খবর না দিয়ে যখন-তখন কুটুমবাড়ি যেতে নেই। তুমি যে নিজের খেয়াল-খুশি মতো হুড়ুস করে ওখানে হাজির হলে তোমার মেয়ে তখন হয়তো সংসারের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। সে কি সেসব ফেলে পা-ছড়িয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করতে বসবে ?"

কথাগুলো মুখ বুজে শুনেছেন সদানন্দ, কিন্তু সম্পূর্ণ একমত হতে পারেননি স্ত্রীর সঙ্গে।

তারপরের ব্যাপারটা তো সাদামাটা। সত্যবতী নিজেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বড় যৌথ পরিবারের জাঁতাকলে মেয়েটাকে গুঁড়িয়ে ফেলবার ব্যবস্থা হয়েছে। শ্বশুরবাড়ির কোথাও বিন্দুমাত্র স্নেহস্পর্শ নেই। মেয়েটা সময়মত জল-খাবার পর্যন্ত পায় না। বিরক্ত হয়েছেন সদানন্দ ও তাঁর স্ত্রী। ও-বাড়িতে মাসমাইনের কাজকর্মের লোকের সঙ্গে তাঁর মেয়ের কোনো পার্থক্য নেই।

পরিবারের গৃহিণী সম্পর্কে অনেক অপ্রিয় খবরাখবর এঁদের কানে এসেছে। সহ্য করতে ইচ্ছে হয় না। সব অন্যায় মেনে নিয়ে মাথা নিচু করে বেঁচে থাকার কী মানে হয় ?

সত্যবতী প্রথম দিকে বলতেন, যে সয় সে রয়। কিন্তু তিনিও পরবর্তী পর্যায়ে চুপ করে থাকেন। মনু নিজেই বাপের বাড়িতে এসে বিরক্ত হয়ে বলেছে, "পরের বাড়ির মেয়েকেই শুধু অত্যাচার সইতে হবে কেন মা ? মেয়েরা মুখ বুজে সয়ে যাবে, কোনো প্রতিবাদ করবে না জেনেই তো অত্যাচার বেড়ে যায়। অবহেলার সীমা থাকে না।"

শ্বশুরবাড়ির লোকজন সম্পর্কে মনু ক্রমশ ভীষণ বেঁকে বসেছে। কিছুক্ষণের জন্যে বাপের বাড়ি এসে সে বুকটা হাল্কা করে যায়। তার চোখের জল সদানন্দকে কাতর করে তুলেছে। রাগের মাথায়

তিনি বলেছেন, "তোর মা যাই বলুক, কোনো অন্যায় সহ্য করবি না, সে যে-ই হোক। মেয়েরা মুখ বুজে সহ্য করে-করেই এই জাতটার সর্বনাশ করেছে।"

জামাই সম্বন্ধেও প্রশ্ন তুলেছেন সদানন্দ। "আমি তোকে বলছি, স্বামীর অত্যাচারও মুখ বুজে সহ্য করবি না। তোর বাবা তো এখনও বেঁচে আছে। ওগিলভি কারখানায় তার একটা চাকরিও রয়েছে।"

সত্যবতী স্বামীকে শান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। "শাশুড়ি, জা, ননদের কোঁদলে তুমি আবার জগদীশকে টেনে আনছো কেন? সে বেচারা কী দোষ করলো?"

"শ্বশুরবাড়িতে বউয়ের ওপর কী রকম অত্যাচার হচ্ছে তা স্বামী ছাড়া কে দেখবে?"

সত্যবতী ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছেন। "বউয়ের হয়ে স্বামী যখন তর্কে নামে তখন যৌথ পরিবার থাকে না। সেটা হলো ভাঙবার পর্ব।"

"ভাঙে, ভাঙবে! যা গোটা থেকে আমার মেয়ের শুধু কষ্ট আর চোখের জল, তা ভাঙলে কী এসে যায়?"

সত্যবতী বলেছেন, "সব ঘরের বউ যদি নিজের মেজাজ-মর্জি অনুযায়ী জীবন কাটাতে চায় তাহলে সনাতন ঘর-সংসার থাকে কী করে?"

সদানন্দ উত্তর দিয়েছেন, "আমি তর্কে নামতে চাই না। যে যার নিজের মতন থাকবেই বা না কেন? ক'দিনের এই স্বাধীনতা? তারপর তো সারাজীবন ছেলে মানুষ করা, হাঁড়ি ঠেলা এসব রয়েছে।"

"বড় হাঁড়ির অনেক সুবিধেও," সত্যবতী মনে করিয়ে দিয়েছেন। "এই যে মনু, এখানে চলে এসেছে, জগদীশ তবু খেতে পাচ্ছে। একলা-দোকলার সংসারে তা কি হতো?"

"তুমি আর বড় সংসারের কেত্তন গেয়ো না, মা। আমার কান্না লাগে এক-এক সময়।"

মেয়ের এই কথা শুনে সদানন্দ নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেননি। "জগদীশকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি। তার সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলতে চাই। কদ্দিন ওই জেলখানায় আমার মেয়েকে থাকতে হবে?"

"দোহাই, তোমাকে আর ওই কাজটি করতে হবে না। সোজাসুজি যা কথাবার্তা তা মেয়ে-জামাই নিজেদের মধ্যে করবে। ওর মধ্যে আমাদের ঢোকা মহাপাপ। লোকে বলবে, মেয়ের বাপের বাড়িই ফুসমন্তর দিয়ে সুখের সংসারটা ভেঙে দিলো।"

সদানন্দর রাগ একটুও কমেনি। "কে কি আবোল-তাবোল কথা বললো তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি আমার মেয়ের মুখে হাসি দেখতে চাই। আমি চাই ওর কোমরটা ভেঙে না যাক।"

"তুমি যাই বলো, একসঙ্গে থাকার সুবিধেও আছে। যেমন···"

সত্যবতীর কথা শেষ হতে দিলেন না সদানন্দ। "তুমি আমাকে রামায়ণ-মহাভারতের সতীসাবিত্রী লেকচার শুনিও না। তুমি কি খবরের কাগজ পড়ো না? ঘরে-ঘরে নতুন বিয়ে-হওয়া বউয়ের কী যন্ত্রণা চলেছে তার খবরাখবর রাখো?"

এই সব আলাপ-আলোচনার মধ্যে সময় কিছুটা কেটেছে। মন্টুর মেয়েটা সংসার আলো করে এসেছে। কিন্তু যৌথ পরিবারের মানসিকতার সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেনি মন্টু।

যৌথ পরিবারে মাথাপিছু খরচ অনেক কম। কিন্তু বিরক্তির মাথায় মন্টু বলেছে, "এর থেকে একবেলা খেয়ে থাকা ভাল।"

সদানন্দ নিজেও এই কথাটা কোনো বইতে পড়েছেন, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

সত্যবতী অবশ্য একমত নন। তাঁর সন্দেহ, যাদের অনেক সুখ আছে তারাই কেবল ওই ধরনের কথা বলার সাহস পায়।

পুরনো কথা ভাবতে-ভাবতে সদানন্দ বিছানায় পাশ ফিরলেন। ছেলে ও মেয়ের সুখ-দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই তাঁদের জীবনে। ওদের সুখেই তাঁদের সুখ, ওদের দুঃখেই তাঁদের দুঃখ।

নড়বড়ে খাটের আওয়াজে মৃদু বকুনি দিলেন সত্যবতী। "কী হলো তোমার? এখনও ঘুমোওনি! পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী লাভ? তোমার মেয়ে তো এখন আর শ্বশুরবাড়ির জেলখানায় নেই। তুমি নিজেই তো শেষ পর্যন্ত বললে, 'শশধর একটা ছোটখাট বাসা দেখো। অন্তত দু'খানা কামরা যেন থাকে।' তারপর মনুকে তুমিই তো লুকিয়ে-লুকিয়ে কামরা দুটো দেখিয়ে আনলে। ঘর দু'খানার জন্যে প্রথম দু' মাসের ভাড়া তুমিই তো দিলে। তারপর মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁরে মনু, জগদীশ এখন হাতে কত পায় রে?" মনু বললো, "বাবা, যাই পাক, একবেলা খেয়েও ঘর ভাড়া ঠিক দিয়ে যাবো।" তুমি বললে, "ভাড়া একটু বেশি, কিন্তু অন্য যে-বাড়িটার খবর পেয়েছিলাম, ওখানে কল-পায়খানা ভাগের। মনুর অসুবিধে হতো।"

সত্যবতী বলেছিলেন, কম খাবো সেও ভাল, কিন্তু অন্যের সঙ্গে কল-পায়খানা ভাগ করা বড্ড বিশ্রী। মনুর সে অভ্যেসই নেই।"

পাশ ফিরতে-ফিরতে সদানন্দ ভাবলেন, বুকে বল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, তবেই অভীষ্ট লাভ হয়। যে-জগদীশ পৈতৃক যৌথ পরিবারের খাঁচা থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছিল না, সেই তো এখন নিজের ক্ষমতায় টিভি কিনলো।

অবশ্য অনেক অস্বস্তিকর মুহূর্তও এসেছিল। জগদীশ যখন আলাদা হয়ে যাবার সিদ্ধান্তটা বাড়িতে জানিয়েছিল তখন সে এক কাণ্ড! বাড়িতে সবাই গুম হয়ে গিয়েছিল। কারুর মুখে দু'দিন কোনো কথা ছিল না। যেন মহা অপরাধ করে বসেছে জগদীশ।

একবার কথা উঠেছিল সদানন্দ নিজেই মনুর শ্বশুরবাড়ি থেকে মালপত্র নতুন ভাড়াটে-বাড়িতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তদারকি করবেন। আজকালকার ঠেলাওয়ালাদের একটুও বিশ্বাস নেই, সারাক্ষণ সঙ্গে

একজনের থাকা দরকার। মনুর পক্ষে তো এ-কাজ সম্ভব নয়।

এর ফলাফল কী হতে পারে তা সদানন্দর মাথায় ঢোকেনি। প্রস্তাব শুনেই সত্যবতী খুব বিরক্ত হলেন। "মরে গেলেও তুমি ওমুখো হবে না। এমনিতেই হাঁড়ি আলাদা করে দেবার সমস্ত দোষটা ওরা মেয়ের বাপের বাড়ির ওপরে চাপাবে।"

সদানন্দ এবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর মুখটা স্মরণে আনবার চেষ্টা করলেন। সুধাংশুবাবু স্থর শিখিয়ে দিয়েছিলেন, যখনই ঘুমের দরকার তখনই ঠাকুরের ছবিটা কপালের কেন্দ্রে টিপের মতন ভাবতে চেষ্টা কোরো।

সদানন্দ সেই সঙ্গে ভাবলেন, সব ভাল যার শেষ ভাল। ওই সব হাঙ্গামা পেরিয়ে মেয়ের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত টিভি তো এলো! এবার বেশ ভাল সময় আসছে। পাঁজিতেও সে রকম একটা ইঙ্গিত রয়েছে। কারখানাতেও পঞ্চানন বলছিল, "দাদার এবার ভাল সময়ের শুরু। কর্ম্মস্থলে রবি ও বুধের যোগ! মানে, কেউ আর আপনার নাগাল পাবে না।"

"তাহলে তোর আর দুঃখ কী?" কপালের মধ্যিখান থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ফিস-ফিস করে কথা বললেন। "সদানন্দ, তুই বরং নিশ্চিন্তে একটু ঘুমো।"

♣

ভাল সময় যখন আসে তখন বোধ হয় এইভাবেই আসে। ছোটসায়েব একটা চাকরির ইন্টারভিউ-র চিঠি পেয়েছে ফরাক্কা থেকে। ইন্টারভিউ কলকাতায়।

"ফরাক্কা! সে আবার কোথায়? সে তো বাংলাদেশে?" সত্যবতী দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন।

"আঃ! মা! ফরাক্কা কোন দুঃখে বাংলাদেশে হতে যাবে ওখানকার ব্যারেজের জল নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ইণ্ডিয়ার প্রায়ই খিটিমিটি বাধছে।" ছোটসায়েব নিজেই বলেছে।

ব্যারেজ কী জিনিস, তাও সত্যবতী ভালভাবে জানেন না।

"জলাধার। জল যেখানে ধরে রাখা হয়," সদানন্দ বুঝিয়েছেন "তুমি একদিন বরং মন্নুর ওখানে যেও, টি ভি-তে প্রায়ই দেখায় ফরাক্কার জলাধার।"

"খোকা তো সাঁতার জানে না। জলের মধ্যে ওকে ছাড়বো কী করে? কোনো প্রশ্নই ওঠে না।" সত্যবতী এসব বিপদ কিছুতেই ডেকে আনবেন না।

"ওরে বাপু, জলাধার ছাড়াও অন্য অনেক কিছু হচ্ছে ওখানে। যেমন ধরো তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র।"

"তাপ মানে তো ভীষণ গরম! এমন গরম যে সমস্ত কিছু ইলেকট্রিক হয়ে যাচ্ছে, আমাকে আর বোঝাতে হবে না।"

সদানন্দ অনেকক্ষণ ধরে গৃহিণীকে বোঝালেন, ফরাক্কায় চাকরির ইন্টারভিউয়ে গেলে ছোটসায়েবের কোনো শারীরিক ক্ষতি হবে না। আর সে যদি ওখানে কাজ পেয়ে যায় তাহলে সত্যবতী নিজেও ছেলের কাছে থেকে যেতে পারেন।

সত্যবতী সদর্পে বললেন, "সে বড় জোর প্রথম তিন-চার মাস!" তারপর ছেলের বউ খোঁজ করে, যার ধন তার হাতে তুলে দিয়ে সত্যবতী ফিরে আসবেন নিজের সংসারে। ছেলের চাকরি খোঁজা এবং বউ জোগাড় করা এই দুটো কাজই এখনও পড়ে আছে। এর পর স্বামীর কারখানা যাওয়ার তদারকি করে ও রাত্রে দুটো ভাত রেঁধে তাঁর দিন চলে যাবে।

সদানন্দ হাল্কা চালে মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর চাকরি চিরকাল থাকবে না। কয়েক বছর পরেই রিটায়ার বলে একটা জিনিস আছে। ওগিলভি কারখানায় নিয়মকানুন খুব কড়া।

সত্যবতী বলেছেন, "আমি ও ব্যাপারে চিন্তা করি না। শশাবাবু এবং তুমি তো একই ক্লাসে পড়েছো। একই সঙ্গে রিটায়ার করে বৈঠকখানায় বসে গল্পগুজব করবে।"

"সে-গুড়ে বালি! আমি আর শশা একসঙ্গে রিটায়ার করছি না। যদিও বয়স আমাদের দুজনেরই এক। শশার বাবার অনেক দূরদৃষ্টি ছিল।" ইস্কুলের খাতায় শশধরের চার বছর বয়স কমানো ছিল। জীবনের শেষ পর্যায়ে কিছু সুবিধে পাওয়া যাবে বলে। জন্ম থেকেই এদেশে মিথ্যাচার! নিজের বয়সটাও ভাঁড়ানো।

সদানন্দর কারখানায় সেবার বেশ মজা হয়েছিল। ওঁদের রামানন্দবাবুর ওই রকম পাঁচ বছর বয়স কমানো ছিল। হঠাৎ শোকে-তাপে রামানন্দবাবুর ধর্মে মতি হলো। তারপর একদিন অনুশোচনা হলো বয়স ভাঁড়ানোর এই মিথ্যাচার তিনি গোপন রাখবেন না। সবাই ওঁকে বারণ করলো, তবু রামানন্দবাবু শুনলেন না—খোদ কারখানার ম্যানেজারের কাছে নিজের হাতে পিটিশন দিলেন। আবেদন করলেন, 'আমার বয়স বাড়িয়ে দাও—কেড়ে নাও ওই মিথ্যে পাঁচ বছর।'

সত্যবতী অত শত বোঝেন না। জানতে চাইলেন, "শেষ পর্যন্ত কী হলো? নিজের সর্বনাশ নিজেই করলেন শোকের প্রকোপে?"

সদানন্দ বললেন, "সবাই ভয় পেয়েছিল খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু আইন বড় আশ্চর্য জিনিস, মনুর মা। নিজের খেয়ালেই জগন্নাথের রথ চলে, একা কারও সাধ্য নেই তার পথ বেঁকায়।"

ম্যানেজারসায়েব রামানন্দর চিঠি পেয়ে সোজা ফরওয়ার্ড করলেন পার্সোনেলে। পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট নোট লিখে ঐ চিঠি পাঠালো খৈতান কোম্পানি উকিলের আপিসে। তারপর পার্সোনেল থেকে রামানন্দবাবুর কাছে উত্তর এলো, ম্যাট্রিক পরীক্ষার সার্টিফিকেটে যে-বয়স লেখা আছে তাই শিরোধার্য, ঐ রেকর্ড ছাড়া কোম্পানি অন্য কিছুই মানবে না। ওখানে রামানন্দবাবুর যা বয়স রেকর্ড হয়েছে, তা

এতোদিন পরে কোম্পানি পাল্টাতে পারবেন না।"

একেই বলে আইন। একবার রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে মিথ্যাকেও আর সত্যে ফিরিয়ে আনা যায় না।

এই রামানন্দবাবুও পাগল। তিনি ঠিক করলেন, ছাড়া যখন পাচ্ছেন না তখন এই পাঁচ বছর তিনি কারখানায় কাজ করবেন। কিন্তু মাস মাইনের টাকাটা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে দিয়ে আসবেন। "এইটেই হবে আমার শাস্তি। সারাদিন খেটে মরবো, কিন্তু টাকাটা পাবো না।"

সত্যবতী বলেছেন, "শোকে মানুষের বুকটা পুড়ে ঝামা হয়ে যায়। এই মানুষটা কত বিষয়ী ছিল, কত হিসেবী ছিল। এখন একেবারে উদাসী হয়ে গেলো। নিজের যন্ত্রণা ভুলতে মানুষটা যে বিবাগী হয়ে যায়নি এই ভাল। আহা রামানন্দবাবুর বউটি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, আমি ওঁকে সিদ্ধেশ্বরী তলায় কালীপুজোর রাত্রে কতবার দেখেছি।"

♣

সেই রামানন্দর সঙ্গে ভোরবেলায় সদানন্দর দেখা হয়ে গেলো ওগিলভি ইণ্ডিয়ার মেন গেটে।

আজ মর্নিং শিফট্। রামানন্দ বললেন, "এই যে ব্রাদার! সুখবরটা পেয়ে গিয়েছি! তা এই নাও একটা লজেন্স—মুখে পুরে দিয়ে কাজে চলে যাও। আমি ভাই আজকাল পকেট ভর্তি লজেন্স রাখি। শুধু মুখে মিষ্টি কথা বলে লাভ নেই, জিভেও একটু মিষ্টি জোগাতে হবে।"

এমন কিছু একটা ব্যাপার নয়। কিন্তু অনেকেই মনে হচ্ছে জেনে গিয়েছে সদানন্দর কর্মজীবনে আজ স্মরণীয় দিন।

শার্ট খুলে গেঞ্জি পরে কারখানার একপ্রান্তে ইনস্পেকশন বিভাগের একটা সবুজ রঙের টেবিলের সামনে বসলেন সদানন্দ।

এই ডিপার্টমেণ্টে চেয়ারগুলো অদ্ভুত ধরনের। হাত নেই, পিঠ নেই, শুধু পায়া আছে। বসবার জায়গাটাও অত্যন্ত ছোট—ওগিলভিসায়েব নিজে অতো মোটা হয়েও কী করে নিজের হাতে এই চেয়ার ডিজাইন করেছিলেন ভগবান জানেন।

নগেন মহাপাত্র বলেছিল, "বাঁশের ডগায় বাঁদরকে বসতে দেখেছিলেন বোধ হয় সায়েব।"

চেয়ারগুলো আবার রিভলভিং—বোঁ করে যে-দিকে প্রয়োজন ঘুরে যায়।

নগেন মহাপাত্রর মুখে আজ এক গাল হাসি। "আজ তো আপনারই দিন, দাদা!" সে অভিনন্দন জানালো সদানন্দকে।

কোম্পানিতে আজ তিরিশ বছর পূর্ণ করলেন সদানন্দ মজুমদার। "আজ তো আপনার কাজ করার কথা নয়, দাদা। কার্ড পাঞ্চ করে সকাল থেকে স্রেফ জামাই-আদরে ঘুরে বেড়াবেন। যাকে বলে কিনা নো ওয়ার্ক উইথ ফুল পে—যা অনেক সরকারী আপিসে রোজ হয়ে থাকে!"

কাজের মানুষ সদানন্দ প্রশ্ন করলেন, "কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কটা যখন কাজের, তখন কাজ না করলে চলবে কেন, নগেন?"

নগেন বললো, "অন্য সময় সম্পর্ক যাই হোক, তিরিশ বছর পূর্ণ হলে আমাদের এই কারখানায় খুব খাতির। খোদ ওগিলভিসায়েবের সময় থেকে এই নিয়ম চলে আসছে।"

সত্যি, কেন এই নিয়মটা এখানে চালু করা হয়েছে, তা সদানন্দ নিজেই জানেন না। অকুস্থলে আবির্ভূত হয়ে ইউনিয়নের কমরেড সত্য চাকী এবার ফোড়ন দিলেন, "বুঝতে পারছেন না কেন? কোম্পানির মনোভাব হলো, তিরিশ বছর ধরে তোমাকে পটাপট গুগলি দিচ্ছি, তুমি তা সত্ত্বেও উইকেটে টিকে রয়েছো। বাহাদুর লোক তুমি। সুতরাং একবার হাতে হাত মেলানো যাক।"

নগেন ও সদানন্দ খুব হাসলেন। সত্য চাকী বললেন, "তাছাড়া

ম্যানেজমেন্টের কতকগুলো বদ উদ্দেশ্য আছে—শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে দেওয়া। কমবয়সী ওয়ার্কারসের দেখানো, মন দিয়ে বছরের পর বছর কাজ করলে ম্যানেজমেন্ট তোমাদের কেমন আদরযত্ন করে তা নিজের চোখে দ্যাখো।"

অফিসার মিস্টার হাজারিকাকে এবার একই জায়গায় দেখা গেলো। সদানন্দর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। আজ বিকেলে তো ডবলু-এম-এর আপিসে মিটিং।"

হাজারিকা দূরে সরে যেতেই সত্য চাকী বললেন, "কী রকম অভিনয় দেখাল! যেন সদানন্দদাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে সারা রাত ধরে উনি জেগে বসে আছেন! অথচ আসল ব্যাপার হলো আজ সকালে কারখানায় এসে লেবার ডিপার্টমেন্টের কার্ড দেখেছেন। তারপরেই টুপি পরানো!"

সত্য চাকী আরও বললেন, "আজ আর চক্ষুলজ্জা করবেন না, দাদা। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ান, শুয়ার-কা-বাচ্চা কারখানায় কোনো শালা আপনাকে কিছু বলবে না।"

সদানন্দ মুচকি হাসলেন। তারপর নিজের মনেই প্যাকিং বাক্স খুলে নির্ধারিত ইনস্পেকশনের কাজ শুরু করলেন। সামান্য চাকরি তাঁর কিন্তু দায়িত্ব বিরাট—বাইরে যাতে খারাপ মাল বেরিয়ে গিয়ে কোম্পানির বদনাম না হয় তা দেখবার শেষ দায়িত্ব এই সদানন্দ মজুমদারেরই।

অফিসার মিস্টার হাজারিকা একদিন বলেছিলেন, "এখন পৃথিবীর বড় বড় দেশে 'জিরো ডিফেক্ট' আন্দোলন চলেছে প্রতি শপফ্লোরে। এর অর্থ, কাজ এমনভাবে করো যেন ভুল ধরাবার কোনো প্রয়োজনই না থাকে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর যদি ওগিলভি কোম্পানির প্রতিটা প্যাকেট নির্ভুল হয় তাহলে আর সদানন্দর এই কাজের প্রয়োজন হবে না। প্রথমে ভুল করে পরে তা ঠিক করার থেকে শুরুতেই নির্ভুল জিনিস তৈরির সাধনা থাকলে পৃথিবীর সবারই

মঙ্গল হবে।"

একের পর এক ওগিলভি প্যাকের ওজন যাচাই করতে-করতে সদানন্দর মনে পড়লো, এই তো সেদিন যেন তিনি কাজে যোগ দিলেন। অথচ তিরিশটা বছর দেখতে-দেখতে কেটে গেলো।

কারখানার নিম্নতম গ্রেডে সদানন্দ মজুমদার যোগ দিয়েছিলেন। গোড়ার দিকে তাঁকে কারখানার মেঝে থেকে ছেঁড়া-ফাটা প্যাকিং কাগজগুলো তুলতে হতো। তারপর অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে এই ইনস্‌পেকশন বিভাগে এসেছেন।

নগেন মহাপাত্রর মতে, সদানন্দর তেমন কিছু উন্নতি হয়নি—অন্য দেশে সুইপার হয়ে ঢুকে লোক নাকি কারখানায় বড়সায়েব হিসেবে রিটায়ার করে। মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করলেও এ-দেশে কিছু উন্নতি হয় না—যে একবার ওয়ার্কম্যান হয়ে চাকরিতে ঢুকেছে সে প্রতিভায় আলবার্ট আইনস্টাইন হলেও চিরকাল ওয়ার্কম্যান থেকে যাবে। তাছাড়া কারখানায় শ্রমিকদের মাইনে-পত্তর যেটুকু বাড়ে তো কোম্পানির দয়ায় নয়, সে-তো ইউনিয়নের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে। তিন-চার বছর অন্তর একটা নতুন এগ্রিমেন্টের সময় হয়, ইউনিয়ন চার্টার অফ ডিমাণ্ড দেয়, ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ইউনিয়নের সংগ্রাম কমিটির খিটিমিটি চলে মাস দশেক ধরে, তারপর কিছু বেতন বেড়ে যায়। কে ভাল কাজ করেছিল, কে খারাপ কাজ করেছিল সেসব কারও মনে থাকে না। এদেশের কলকারখানায় মুড়ি-মিছরির এক দাম। মনুষ্যত্বেরও কোনো পৃথক সম্মান নেই—সবই চলছে গোলে হরিবোল দিয়ে।

হাজারিকার কাছে চমৎকার একটা শব্দ শুনেছিলেন সদানন্দ—'বারগেনেব্‌ল স্টাফ'।

কমরেড সত্য চাকীর কাছে একবার তার অর্থ জানতে চেয়েছিলেন সদানন্দ। সত্য চাকী বলেছিলেন, "বুঝলেন না? যাদের সঙ্গে 'বারগেন' অর্থাৎ কিনা দরদস্তুর করা যায়। পচা মাছের বাজারে

যেমন দু-দশটা পয়সা নিয়ে দুই পার্টিতে আধ ঘণ্টা ধরে টানাটানি হয়।"

কথাটা ভাল লাগেনি সদানন্দর। মিস্টার হাজারিকাকেও তিনি একদিন একই প্রশ্ন করেছিলেন।

"একদম ভুল বুঝবেন না, সদানন্দ," সায়েব বলছিলেন। "আমরা হচ্ছি কভেনেন্টেড, আর কর্মীরা হচ্ছে বারগেনেব্‌ল। আমাদের চাকরিটা চুক্তির ওপর—পাঁচ বছর অন্তর চুক্তি, আবার নতুনভাবে সই নাও হতে পারে। আর কর্মীদের ওই লংটার্ম এগ্রিমেন্ট। নামে তিন বছর। কিন্তু হাতে-কলমে হতে-হতে চার বছর লেগে যায়। 'কথায় বলে, লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না, আর কোটি কথা না হলে এগ্রিমেন্ট হয় না কারখানায়।' কী যে এত কথাবার্তা হয়, তা শেষ পর্যন্ত কোনো পক্ষেরই মনে থাকে না। ইউনিয়নকেও দোষ দেওয়া যায় না, ঝপ করে কাজের কথাটা হয়ে দু-পক্ষের সই সাবুদ হয়ে গেলে লোকে দালাল বলে সন্দেহ করবে। কর্তাদের আশীর্বাদ গোপনে নিয়ে একটু-আধটু কয়েকদিন নিয়ম-মাফিক কাজ, গণ-অবস্থান এবং ডজনখানেক গেটমিটিং করতেই হয়। শ্রমিক সংগ্রাম সম্পর্কে শ্রমিকরা নিজেরাই যে অন্ধকারে রয়েছে। মেজাজ দেখিয়ে একটু আধটু ভাঙচুর না হলো তো কেমন সংগ্রাম হলো?"

গুগিলভি কারখানায় সদানন্দকে নিয়ে একটু পরেই আরও হৈ-হৈ কাণ্ড! নগেন মহাপাত্র বলে উঠলো. "দাদার, আজ দ্বিতীয় জামাই ষষ্ঠী! কোম্পানির ফটোগ্রাফার এসেছে, দাদার ছবি নেবে!"

ছবির ব্যাপারটায় বেশ লজ্জায় পড়ে গেলেন সদানন্দ। সেই মন্টুর বিয়ের সময় একবার বরপক্ষ ছবি নিয়ে গিয়েছিল কনের মা ও বাবার। তার আগে একবার ছবি তুলেছিলেন তিরিশ বছর আগে—চাকরিতে যোগ দেবার প্রথম দিনে। আইডেনটিটি কার্ডে সেই পুরনো ছবিটাই এখনও পর্যন্ত লাগানো আছে।

তিরিশটা বছর কেমন হুট করে কেটে গেলো। তখন একমাথা চুল ছিল সদানন্দর। একটু রোগা-রোগা ভাব। চোখে চশমাও ছিল না। এখন অর্ধেক মাথা জুড়ে টাক। কাজের সময় চশমা লাগে সদানন্দর। ওজনও কিছুটা বেড়েছে। তবে তেমন নয়। দাঁতও দুটো পড়েছে, তবে বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

টুপি পরা ছোকরা ফটোগ্রাফার নির্দেশ দিলেন, "আপনি নিজের মনে নিজের কাজ করে যান। আমার দিকে একেবারে তাকাবেন না!"

"সে কি ব্যাপার বাবা! আমরা কি মিনিস্টার, না সিনেমা স্টার যে ফটোগ্রাফার সামনে ঘুর-ঘুর করবে অথচ তাকে হিসেবের মধ্যেই আনবো না?"

ফটোগ্রাফার ছোকরাটি একটু ফড়ফড়ে! নগেন মহাপাত্রকে সোজাসুজি শুনিয়ে দিলো, "আপনারও ওগিলভি কোম্পানিতে তিরিশ বছর সার্ভিস হোক, তখন আপনারও ছবি তুলবো।"

"সদাবাবু ভাগ্যবান, অন্তত তিরিশটা রান তুলে ফেললেন। আমাদের সে-ভাগ্য নাও হতে পারে। যেভাবে কোম্পানি অটোমেটিক যন্তর-টন্তর বসাচ্ছে।" মন্তব্য করলো নগেন মহাপাত্র।

"তেমন হলে আমার এই ফটোগ্রাফি লাইনে ঢুকে যাবেন। যতই ক্যামেরার মধ্যে কমপিউটার বসুক, এই নিতাই সাহাকে দরকার হবেই। জাপানীদের বাপের সাধ্য নেই যে ফটোগ্রাফারলেস ক্যামেরা তৈরি করে।"

নিতাই সাহা সদানন্দকে জানালো, "আপনার এই ছবি বোধহয় হেড আপিসের জার্নালে ছাপা হবে। মুখের ভাবটা এমন করুন যেন, তিরিশ বছর পূর্তির দিনেও আপনি নিজের খেয়ালে কাজ করে চলেছেন!"

ফ্ল্যাশ বাল্‌ব জ্বললো, টপাটপ ছবি উঠলো। নগেন মহাপাত্র টিপ্পনি কাটলো, "ডবল দাড়ি কামিয়ে ঝকঝকে জামা পরে বউদিকে নিয়ে দাদার আজ কারখানায় আসা উচিত ছিল।"

এরপর বিরতির সময়েও আজ এক রাউণ্ড তাস খেলতে বসা

গেলো না। সত্যিই ভি-আই-পি হয়ে উঠেছেন সদানন্দ। হেড আপিস জার্নালের সম্পাদিকা মিস বসুধা সেন নিজেই কারখানায় এসেছেন সদানন্দর সাক্ষাৎকার নিতে।

সুন্দরী, সপ্রতিভ ও সুদেহিনী বসুধা সেন নোটবুক ও ডট পেন নিয়ে হাজারিকা সায়েবের ঘর আলো করে বসে আছেন। ডট পেনটা নাড়াচাড়া করতে-করতে সুতনুকা সম্পাদিকা জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন লাগছে বলুন, সদানন্দবাবু?"

সদানন্দ কর্মক্ষেত্রে কখনও এ রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হননি। রোজগার করতে এসে ভাল লাগা খারাপ লাগার প্রশ্নই ওঠে না এই সংসারে। তবু একটা কিছু উত্তর দিতে হবে।

তাই সদানন্দ অন্তর থেকেই বললেন, "বেশ ভাল লাগছে, তিরিশটা বছর কেটে গেলো। তবে রুজিরোজগারের জায়গা তো। কী রকম লাগছে সেটা বড় কথা নয়—ভাল লাগাতে হবে, প্রতিদিন আসতে হবে এবং কাজও করতে হবে।"

ফিক করে হেসে ফেললেন বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞা বসুধা। "এই ত্রিশ বছরে কোম্পানি আপনাকে কী দিয়েছে, আপনার মনে হয়?"

সদানন্দ কিছুই চেপে রাখলেন না। "আমার তো মনে হয় সবই পেয়েছি এই চাকরির দৌলতে। এই ধরুন ঘর-সংসার। ওগিলভি কোম্পানিতে কাজ জোগাড় করতে না-পারলে আমার কী বিয়ে হতো? বেকারের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় না। এই চাকরির জোরেই মেয়ে এবং ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, মানুষ করেছি। মেয়ের বিয়েও দিয়েছি। সে এখন সুখে স্বামীর সঙ্গে ঘর সংসার করছে।"

ছেলের-ব্যাপারে চুপ করে গেলেন সদানন্দ। "ইস্কুলে পড়িয়েছি—কিন্তু কিছু গতি করা যায়নি। বেকার বসে আছে। আমাদের এই অঞ্চলে কাজকর্ম কোথায়? মানুষ দেখলেই মালিকরা আঁতকে ওঠেন। মানুষের দোষ, না মালিকের দোষ জানি না—কিংবা হয়তো দু'জনেরই দোষ—কিংবা স্রেফ বাঙালীদের ভাগ্য। সব ব্যাপারে পড়ে

মার খাবার জন্যেই আমাদের জন্ম।"

বসুধা সেন প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। "আপনার রেকর্ড দেখেছি আমি—কোনোদিন লেট করেন না আপনি। এর কারণ কি?"

আবার অস্বস্তিতে পড়লেন সদানন্দ। "কোম্পানিতো কখনও আমাকে লেট করে মাইনে দেয় না, সুতরাং আমি কী করে লেট করবো? তাছাড়া ওটা বোধহয় অভ্যেসের ব্যাপার। আমাদের ইস্কুলের মাস্টারমশাই সুধাংশুবাবু স্যর চাইতেন না আমরা কেউ দেরি করি। তাছাড়া লেট করলে কারখানাও বা চলবে কী করে? যেখানে মিলে মিশে কাজ সেখানে একজনের দেরিতে বাকি দশজন যারা ঠিক সময়ে এসেছে তাদের প্রচণ্ড অসুবিধে হবে।"

বসুধা সেন জিজ্ঞেস করলেন, "টানা তিরিশ বছরের সাফল্যের রহস্যটা কী?"

সদানন্দ আবার অসুবিধায় পড়ে গেলেন। কাগজের লোকদের সঙ্গে জীবনে তিনি কখনও কথা বলেননি।

একটু ভেবে সদানন্দ বললেন, "রহস্য আর কোথায়? নিয়মিত হাজিরা দিয়েছি। সায়েবরা যা কাজ বলেছেন তা সাধ্যমতো করেছি, মাইনে পেয়েছি, বোনাস পেয়েছি, ক্যানটিনে খেয়েছি, সময় কেটে গিয়েছে। আমরা সামান্য মানুষ, এইভাবেই আমাদের জীবন কাটে। কোম্পানিও যে এই ত্রিশ বছরে ছোট্ট অবস্থা থেকে কিছুটা বড় হয়েছে এটাও আমাদের ভাগ্য। আরও ভাল হোক। আরও বড় হোক কোম্পানি, এই চাই।"

অন্য কর্মীদের প্রতি সদানন্দর কোনো বাণী আছে কিনা জানতে চাইলেন বসুধা সেন। সদানন্দ অনেক ভেবেও কিছু বলতে পারলেন না। "আমার মতন একজন সাধারণ লোকের কী বলার থাকতে পারে? স্বাস্থ্য নিয়ে, সুখ নিয়ে, চাকরি নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে সবাই বেঁচে থাকলেই আমি খুশি।"

বসুধা সেন এর পর জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওগিলভি কোম্পানির

কর্তৃপক্ষকে কিছু বলবার আছে নাকি সদানন্দর ?

এবারে আরও বিপদে পড়ে গেলেন সদানন্দ। নিজের ছেলের কথাটা মনে পড়ে গেলো। সদানন্দ শুনেছেন অনেক জায়গায় কর্মীদের আপনজনদের নতুন চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তিরিশ বছর ধরে যে-মানুষ নীরবে কোম্পানির সেবা করেছে তার আপনজনও কোম্পানিতে নিশ্চয় অনুগতভাবে কাজ করবে। তা ছাড়া ছোট-সায়েবের একটা হিল্লে হলে সদানন্দর আর কোনো বড় দুশ্চিন্তা থাকতো না।

কিন্তু হেড আপিসের এই সুবেশিনী সুহাসিনী মহিলাকে কিছুই বলতে পারলেন না সদানন্দ।

ছেলের চাকরির বিষয়ে গৃহিণীর সঙ্গে একবার নিভৃতে আলাপ হয়েছিল সদানন্দর।

সত্যবতী বলেছিলেন, "যা দিনকাল পড়েছে তাতে নিজের গুণে কেউ আর চাকরি পায় না। সবই বাবা-কাকারা জোগাড় করে বসিয়ে দেয়।"

ছোটসায়েবের কাকা নেই, সুতরাং পুরোপুরি দায়িত্বটা যে বাবার সে ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন সত্যবতী।

চাকরি, চাকরি, চাকরি। চাকরির চিন্তা ছাড়াও পৃথিবীতে আরও অনেক কিছু ভাববার আছে। কিন্তু ছোটসায়েব ও সত্যবতী ওই একটা বিষয়েই সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে আছেন।

যখন যে-বিষয়টা মাথায় ঢোকে সেটা নিয়েই মরীয়া হয়ে ওঠেন সত্যবতী।

সদানন্দর মনে পড়লো, মন্নুর বিয়ের ব্যাপারেও সত্যবতী এক সময় এই রকম একরোখা হয়ে উঠেছিলেন। সকাল-সন্ধ্যা সদানন্দকে উত্যক্ত করে মারতেন। "চোখ বুজে, হাত গুটিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছো! মেয়ের বর কি তোমার ঠিকানা খুঁজে, নিজেই টোপর

মাথায় দিয়ে এ-বাড়িতে এসে হাজির হবে ?"

সদানন্দ বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক শুভ জিনিসের একটা সময় আছে। "সময় হলেই বিয়ের ফুল ফুটবে !"

সত্যবতী বলতো, "আজকাল কোনো কিছুই নিজে থেকে হয় না। আম কাঁঠালও জোর করে পাকাতে হয় !"

তারপর ভগবানের আশীর্বাদে মেয়ের বিয়ে হলো। সদানন্দ সুখী এবং সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিছুদিনের জন্যে। কিন্তু মন্নুর শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি আরম্ভ হলো।

সে-অশান্তি মন্নুকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আলাদা করে তবে কেটেছে। এখন সত্যবতী আবার ছোটসায়েবের কাজকর্মের ব্যাপারে উঠে-পড়ে লেগেছেন।

সত্যবতী বলেছেন, "ছোটসায়েবের জন্যে তুমি কিছুই ভাবছো না।"

"আমার ভাবনার কী দাম আছে, মন্নুর মা ? যা দিনকাল।"

সত্যবতী ফোঁস করে উঠেছেন, নিদারুণ অপ্রিয়ভাবে জানিয়েছেন, "এসব কথা ছেলের বাবা হওয়ার আগে ভাবা উচিত ছিল।"

সত্যবতীর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। দিনকাল অনেক পাল্টেছে, সময় আরও খারাপ হয়েছে, একথা কোনো বেকার ছেলের মা বিশ্বাস করবে না।

সত্যবতীর সোজা কথা। "দিনকাল আরও খারাপ হয়েছে বলে কারও কিছু হচ্ছে না ! সবার ছেলেই হাত গুটিয়ে বাড়িতে চুপচাপ বসে আছে ?"

সত্যবতী বলেছেন, "ঘরের বউ হলেও আমি দোকানে যাই আজকাল। ছুতোরপাড়া বাস স্ট্যাণ্ডে কত কমবয়সী ছেলে সকাল-বেলায় সাজগোজ করে অফিস যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ছেলে কেন, মেয়েও দেখতে পাই।"

এরপরে সত্যবতীর মন্তব্য, "এ কি অনাসৃষ্টি বাবা ! ছেলেদের চাকরি জুটছে না, সেই সময় মেয়েদের কাজে ঢোকার কোনো মানে

হয়? ছেলেদের চাকরি না হলে মেয়েদের বিয়ে হবে কী করে?। চাকুরে মেয়েরা কি বেকার স্বামীর গলায় মালা দেবে?"

না, যতই অসুবিধে থাকুক কোম্পানির প্রতিনিধির কাছে মুখ খুলবেন না সদানন্দ মজুমদার। যা বলবার যথা সময়ে মিস্টার হাজারিকাকে বলা যাবে।

বিকেলের দিকে সদানন্দর জন্য আরও সম্মান। একতলার ঠাণ্ডা মিটিং রুমে ছোট্ট সভা করে খোদ ওয়ার্কস্ ম্যানেজার নিজে অভিনন্দন জানালেন। ইচ্ছে করলে স্টিলের আলমারি অথবা দামি ঘড়ি নিতে পারেন সদানন্দ। ঘড়ি নিয়ে তাঁর কী হবে? বিয়ের সময় পাওয়া ঘড়িটা এখনও চমৎকার সময় দিচ্ছে। স্টিলের আলমারিটা একেবারে কোম্পানির শো-রুম থেকে বাড়ি চলে যাবে।

যা ভেবেছিলেন সদানন্দ তাই। বাড়িতে বেশ উত্তেজনা। সত্যবতী তো বাড়ির সামনে তিন চাকার ভ্যান দাঁড়াতে দেখে অবাক। আরও অবাক হলেন, যখন তারা জানতে চাইছে এইটা সদানন্দ মজুমদারের বাড়ি কিনা। আচমকা ঝকঝকে আলমারি আসায় বাড়িতে এবং পাড়ায় চাপা উত্তেজনা।

শশধরটা ভীষণ ফচকে। সেদিন বিকেলে বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ রসরসিকতা করলো।

"আলমারি দেখে তোমার গিন্নি তো মাথায় হাত দিয়ে বসবেনই। উনি সন্দেহ করে বসে আছেন, কোথাও ছাদনাতলায় ঢুকে তুমি আবার আলমারি আদায় করলে কিনা! তোমার গিন্নি সরল মানুষ, কী করে বুঝবেন ওগিলভি কারখানাতেই তুমি জামাই-আদর পেতে শুরু করেছো।"

একটু পরেই মনু ও জগদীশ হৈ-হৈ করে হাজির হলো। মনু বললো, "আজকের রিকশ খরচ তুমি দেবে, মা। শশাকাকু বাড়ি

ফেরার পথে আমায় বলে গেলো, "তোর বাবা আজ আপিসে খুব 'অনার' পেয়েছে। যা দেখে আয়।"

জগদীশ বললো, "খবর পেয়েই আমরা ছুটে এসেছি। আজ কারখানায় যাওয়া হলো না।"

সদানন্দ একটু লজ্জা পেলেন। তারপর বললেন, "যারা ওগিলভি কোম্পানিতে তিরিশ বছর কাজ করে তারা সবাই এই একটু সম্মান পায়। এমন কিছু ব্যাপার নয়!"

"কী বলছো বাবা? এমন কিছু নয়? দরজায় আয়নাসমেত এমন অলিভগ্রীন রঙের স্টিল আলমারির এখন দাম কত জানো?"

সদানন্দ বলতে পারলেন না। জগদীশ জানালো, "আমাদের আপিসে অনেকেই কিস্তিতে আলমারি কিনছে। দাম বেশ কয়েক হাজার টাকা।"

স্বামীর কোম্পানি সম্বন্ধে মনুর এখন অনেক গর্ব। সে বললো, "তোমরাই হেরে গেলে বাবা! ওগিলভি কোম্পানিতে তিরিশ বছর খেটে যে আলমারি পাচ্ছো, ওর কারখানায় তিন বছর কাজ না করেই লোকে সেই আলমারি কিস্তিতে বাড়িতে আনছে।"

মনে-মনে খুশিই হলেন সদানন্দ। মুখে বললেন, "সব কোম্পানিতে তো সব ব্যবস্থা এক নয়, মা!"

জগদীশ বললো, "এই সুযোগ-সুবিধাগুলো নির্ভর করে কারখানার ইউনিয়ন কতটা পাওয়ারফুল তার ওপর। ইউনিয়ন যদি মালিকের দালাল না হয়, নেতাদের যদি কব্জির জোর থাকে তা হলে ঝটপট ওয়ার্কারদের রোজগার বাড়তে বাধ্য।"

সদানন্দ একটু সেকেলে। তিনি বললেন, "কোন কারখানা কেমন চলছে, কোন কোম্পানির কেমন রোজগার হচ্ছে, তার ওপরেও অনেকখানি নির্ভর করে বোধ হয়।"

"এসব ব্যাপারে তোমার জামাই তোমার থেকে অনেক বেশি

বোঝে, বাবা।" আদরের মন্থু সঙ্গে-সঙ্গে মন্তব্য করলো।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জগদীশ বললো, "ওসব সেকেলে ধারণা, বাবা। জেনে রাখবেন, সব কোম্পানিরই অঢেল ক্যাশ। লাখ লাখ টাকা ওরা কর্তাব্যক্তিদের ভোগের জন্য উড়িয়ে দেয়, কোটি কোটি টকা ওরা সরকারী ট্যাক্স দেবে, তবু প্রাণ খুলে ওয়ার্কারদের হাতে দুটো পয়সা দেবে না। এইটাই দুনিয়ার নিয়ম। অথচ ইউনিয়নের মোচড় পড়ুক, প্রোডাকশন কমতে শুরু করুক—তখন বাবাজীবনরা সুড়সুড় করে পয়সা বের করে দেবে।"

একটু উদ্বিগ্ন হয়েই জামাইয়ের মুখের দিকে তাকালেন সদানন্দ। জামাই কিন্তু সবজান্তার মতন বললো, "ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয় বাবা, এই সাবজেক্টে। আমাদের সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মস্ত সুবিধে—একটার জায়গায় দুটো ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে কোম্পানি বাধ্য হয়েছে।"

জগদীশের বক্তব্য, একটা ইউনিয়ন হলেই একচেটিয়া মনোবৃত্তি—শ্রমিকদের জন্যে গতর নড়তে চায় না। আর দুটো ইউনিয়ন মানেই কমপিটিশন—সভ্যদের জন্যে, কে কতটা করতে পারে তার প্রতিযোগিতা। দু'নম্বর ইউনিয়ন প্রতি শিফটের শেষে বিনামূল্যে ডিমের ওমলেট দাবি করেছে। শ্রমিকদের খাটতে হয়, খেটে খেটে যে-রক্ত জল হচ্ছে তার তুলনায় সামান্য একটা ডিমের ওমলেট কী এমন? প্রথম ইউনিয়নের ঘুম ভাঙলো তখন। তারা বলেছে, প্রত্যেককে এক গেলাস দুধও দিতে হবে। শুধু চা খেয়ে-খেয়ে পেটে আলসার হলে কে দেখবে?"

গম্ভীর সদানন্দ জানতে চাইলেন, "শেষ পর্যন্ত কী হলো?"

জগদীশের সানন্দ সংযোজন: "দু'দিন ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টে গো-স্লো করতেই সুড়সুড় করে সুইডিশ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি নরম হয়েছে। ডিমের ওমলেট স্যাংশন হয়েছে, কিন্তু দুধের ব্যাপারটা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। ওটা বোধ হয় যাচ্ছে 'শ্রমবিরোধী' কমিশনারের আপিসে।

লেবার কমিশনারের আপিসে যা যায়, তা ফয়সালা হতে অনেক দেরি হয়। কিন্তু এক নম্বর ইউনিয়ন বলেছে, যখনই অর্ডার হবে তখন এরিয়ার পাওয়া যাবে। যদ্দিন আন্দোলন চলেছে ততদিন প্রতি শ্রমদিবসে এক গেলাস দুধের দাম আদায় করা হবে।"

"ডিমটা পেয়ে তা হলে তোমাদের কারখানায় শান্তি ফিরে এসেছে? কর্মস্থলে শান্তিটা বড্ড প্রয়োজন, কাজ করতে গিয়ে ঝুট-ঝামেলায় কে পড়তে চায়?"

শ্বশুরের প্রশ্নে হেসে ফেললো জগদীশ। "সুইডিশ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানির শ্রমিকরা বুঝে গিয়েছে আন্দোলন ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। পাকা আমও গাছ থেকে পড়বার জন্যে হাওয়া চাই। তবে ওমলেট দেবার প্রথম দিনেই এক নম্বর ইউনিয়ন গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে। কিছু নিরামিষাশী উত্তর প্রদেশী ব্রাহ্মণ ওয়ার্কার আছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে টুলস-ডাউন করলো। ডিম তারা খায় না। কোম্পানির ম্যানেজার বলেছে, ডিম নিয়েই চুক্তি হয়েছে। ডিম ছাড়া অন্য কোনো দাবি ছিল না। যারা ডিম খাবে না, তারা ওমলেট বাড়ি নিয়ে যেতে পারে।"

ইউনিয়নের দাবী, "ওসব আজে-বাজে কথা রাখো। ডিমের বদলে পেঁড়া না দিলে আগুন জ্বলবে কারখানায়।"

ম্যানেজার বললো, "তা হলে এ-ব্যাপারেও সরকারের কাছে যাওয়া যাক। শুরু হোক আর একটা সরকারি ফাইল।"

কিন্তু এক নম্বর ইউনিয়ন অতো বোকা নয়। বললো, "ততদিন তাহলে কারখানা বন্ধ থাক। এই সব পণ্ডিতজীরা বয়লারের আগুন নিভিয়ে দেবে।"

"তারপর?" সদানন্দ জিজ্ঞেস করলেন।

"শেষপর্যন্ত কোম্পানি নরম হলো। এখন ডিম অথবা পেঁড়া, যে কোনো একটা দিতেই হচ্ছে কোম্পানিকে।"

"দুর্গা দুর্গা। মিটে গিয়েছে, এইটাই ভাল," কপালে হাত

ঠেকালেন সদানন্দ মজুমদার।

"মিটলো কই? অত সহজে কারখানায় কিছু মিটতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়"

"কেন? পেঁড়া তো সবাই খেতে পারে। ওতে তো কোনো বাধা নেই।"

জগদীশ বললো, "এবার কমরেড বোঁচকা সামন্ত মাঠে নেমে পড়লেন। বোঁচকাদাকে চেনেন তো? আপনাদের ক্যাজুয়াল কর্মীদেরও তো উনি নেতা।"

"তোমাদের ওখানে ক্যাজুয়াল কর্মী অনেক বুঝি?"

"ক্যাজুয়াল তো আছেই। পনেরো কুড়ি বছর ধরে যখন যেরকম টুকটাক কাজ পায় করে। এদের তো ডিমও দেওয়া হয় না, পেঁড়াও দেওয়া হয় না। বোঁচকাদা এইরকম একটা অবস্থার জন্যেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। ক্যাজুয়াল কর্মীরা অনশন শুরু করেছে ম্যানেজারের আপিসের সামনে। বোঁচকাদা নিজেও আছেন রিলে-অনশনে।"

অনশন বুঝতে পারছেন সদানন্দ, কিন্তু রিলে-অনশনটা কী, তা ঠিক মাথায় ঢুকছে না।

জগদীশ বললো, "খুব সোজা জিনিস, বাবা। এখন ওইটাই তো স্টাইল। কে সেই ইংরেজ আমলের বোকা যতীন দাসের মতন না-খেয়ে না-খেয়ে মারা যাবে? এখন বোঁচকাদা গণঅবস্থান ও গণঅনশনে এসে ঘণ্টা দশেক বসে থাকেন, তারপর অন্যরা এসে ডিউটি শুরু করে। এবং বোঁচকাদা খাওয়া-দাওয়া সারতে যান। ফলে ম্যানেজারের অফিসের সামনে অখণ্ড অনশনও চলেছে, অথচ কারও তেমন প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে না।"

"ম্যানেজার তা হলে খুবই বিপদে পড়ে গিয়েছেন?" সদানন্দ মজুমদার ওই ভদ্রলোকের ব্যাপারটাও একটু বুঝতে চান।

"খুব প্যাঁচে পড়েছেন। তবে কথাবার্তা কিছুই বলছেন না।

কথা বলবার যে উপায় নেই—কারণ বোঁচকা সামন্তর ইউনিয়ন তো স্বীকৃত ইউনিয়ন নয়। কোম্পানি ওদের রেকগনাইজ করেনি। কোম্পানির হিসেবে ওরা থেকেও নেই। সেদিন গণঅবস্থানে ধৈর্য হারিয়ে ম্যানেজার ওদের বলতে যাচ্ছিলেন, 'কী পাগলামো করছেন। কাজে ফিরে যান।' কিন্তু পার্সোনেল ম্যানেজার মিস্টার ডি ধর হাঁ-হাঁ করে উঠে ম্যানেজারকে থামালেন।

ধৈর্যবাবু বললেন, "স্বীকৃত ইউনিয়নরা ইতিমধ্যেই আমাকে চিঠি ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আনরেকগনাইজড ইউনিয়নের সঙ্গে কোম্পানি কথা বললেই তারা প্রতিবাদে গণ অবস্থান শুরু করবে। তখন এমন অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে যে ম্যানেজারের বাবার সাধ্য হবে না কারখানা চালু রাখে।"

কথা না বলে ম্যানেজার বাবু তখন মিস্টার ধৈর্য ধরকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে। মস্ত উকিলের কোম্পানি। সব ব্যাপারে ওঁরা পরামর্শ দেন।

আমাদের খবর, আইন-কোম্পানি বলেছে, "ভুলেও ওদের সঙ্গে কথা বলবেন না। তা হলে বোঁচকা সামন্তর ইনডাইরেক্ট স্বীকৃতি পেয়ে যাবে।"

মিস্টার ধৈর্য ধরও জাঁহাবাজ লোক। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ সেরে ফিরে এসেই অন্যপথ বার করে ফেললেন। ম্যানেজার প্রথমে ধৈর্য ধরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন। মিস্টার ধর সেই কথাগুলো রিলে করলেন স্বীকৃত এক নম্বর ইউনিয়নের সুরেনবাবুর সঙ্গে। সুরেনবাবু চুপি চুপি এসে ম্যানেজারের কথাগুলো বোঁচকাদাকে জানালেন, তারপর বোঁচকাদার কথাগুলো আবার মিস্টার ধরকে জানালেন, মিস্টার ধর আবার ধৈর্যসহকারে তা ম্যানেজারকে রিপোর্ট করলেন। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা ধরে ছোটাছুটি চললো। অর্থাৎ সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না।"

শ্বশুরের কোম্পানিতে আলাপ-আলোচনা কীভাবে হয়, জানতে চাইছে জগদীশ।

মন্নুতো সোজা বলেই বসলো, "বাবা, তোমরা অনেক পিছিয়ে আছো সুইডিশ ইঞ্জিনীয়ারীং কোম্পানি থেকে।"

সদানন্দ উত্তর দিলেন, "আমাদের ইউনিয়নে এতোদিন পুরনো সুরেনবাবু ছিলেন। সেকেলে গান্ধিবাদী মানুষ। শ্রমিকদের সব সময় বলতেন, কাজ করতে হবে। কাজ না করে টাকা চাওয়ার মধ্যে আমি নেই। মহাত্মা গান্ধির মতনই হেঁটোর ওপর কাপড় পরতেন, নিজে রেঁধে খেতেন, বিয়ে-থা করেননি। নিজের চাহিদা নেই, অপরকেও বলতেন হুড়মুড় করে চাহিদা বাড়িও না।"

সুরেনবাবু গত হয়েছেন। এখন নবীন নেতারা চালাক হচ্ছেন। কমরেড সত্য চাকী এসেছেন। সুইডিশ কোম্পানির খবরাখবরও তিনি নিচ্ছেন।

মন্নু বললো, "সামনের বছরে ওদের দুটো ইউনিয়নও আরও দাবী করবে। ভালই হবে—ওদের মাইনে আরও বেড়ে যাবে।"

সদানন্দ একবার ভাবলেন বলেন, "যদি থাউকো কিছু টাকা একেবারে এসে যায় তাহলে টিভির কিস্তিটা একবারেই শোধ করে দিস।"

এই কিস্তির ব্যাপারটা সদানন্দর ভাল লাগে না—অপ্রয়োজনে ধার জিনিসটা সুধাংশুবাবু স্যরও পছন্দ করতেন না। একবার যেন বলেছিলেন, আজেবাজে ধারের বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখে অনেক সমাজে মানুষ তো একেবারে বন্দী হয়ে পড়ছে। কিস্তি শোধ করতে গিয়ে কারখানার শ্রমিকরা যন্ত্রের মতন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন এসব কথা বলে লাভ নেই।

মন্নু আবার ভায়ের কথা তুললো। "মা ঠিকই বলছে। সায়েবরা রোজ তো তোমার গলায় মালা দেবে না। একদিন দিয়েছে। তখন তুমি সহজেই ছোটসায়েবের চাকরিটার কথা তুললে পারতে।"

সদানন্দ বললেন, "ঠিক সুযোগ পাওয়া গেলো না, মন্নু। সুধাংশুবাবু বলতেন, মানুষ যখন তোমাকে সম্মান করছে তখন নিজেকে

কিছুতেই ছোট করবে না।"

মন্নুর মা এবার বিরক্তি চাপতে পারলেন না। "কথায়-কথায় সুধাংশুবাবুকে স্মরণ করাটা কিছুদিন বন্ধ রাখো। সুধাংশুবাবু তো কোনোদিন কারখানায় চাকরি করেননি, বিয়ে থাও করেননি। উনি কী করে বুঝবেন, এখনকার মানুষদের দুঃখ কী, সংসারে তাদের কী প্রয়োজন?"

বাবার হেনস্থা দেখে অস্বস্তি বোধ করলো মন্নু। স্বামীর সামনে বাবার এই সমালোচনা তার ভাল লাগছে না। সে বললো, "আজকে গলায় মালা দিয়ে কালকেই নিশ্চয় সায়েবরা ভুলে যাবেন না। বাবা আবার সুযোগ পাবে। তখন ছোটসায়েবকে ঢোকাবার কথাটা তুলবে।"

জগদীশ বলে উঠলো, "আমার মেশোমশাই যেখানে কাজ করেন, সেখানে এসব পয়েন্ট আলোচনাই করতে হয় না। একজন ওয়ার্কার একজন নতুন লোককে ঢোকাতে পারে। এটাই নিয়ম হয়ে গিয়েছে। মেসোমশাইয়ের বড় ছেলেটা তো স্কুল ফাইনাল পাশও করলো না—মেসোমশাই নিয়ে গিয়ে কোম্পানিতে ঢুকিয়ে দিলেন। এখন দু হাজার টাকা পাচ্ছে ওভারটাইম ছাড়া! কিন্তু ওই মাথা-পিছু একজন। মেসোমশায়ের মেজ ছেলে বি-কম-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে তবু ঢুকতে পারছে না কোথাও। প্রাইভেট টিউশনি করে দু'শো টাকা আনছে বাড়িতে—মাসিমার কী দুঃখ।"

মন্নুর মা আবার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। "সব সময় মাথা উঁচু রেখে লাভ নেই। দরকার হলে ইউনিয়নের কর্তাদের সঙ্গেও একটু কথা বলো। নিজে না পারো, শশাঠাকুরপোর পরামর্শ নাও। ওঁর বুদ্ধি তোমার থেকে অনেক বেশি।"

শশধর সামন্ত নিজেই অবাক হয়ে গেলো, যখন শুনলো খোদ বন্ধু পত্নী তাকে খোঁজ করেছেন।

"কেমন আছেন ঠাকুরপো?" জিজ্ঞেস করলেন সত্যবতী তাঁর ঘোমটা টেনে দিয়ে।

"শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেশ ভালই আছি। তরতর করে দিন কেটে যাচ্ছে, অথচ কত লোকের যে দিন কাটছে না, তা আন্দাজ করার মতন বুদ্ধি ভগবান দিয়েছেন।"

শশধর যে আগে ঘন ঘন আসতো এবং এখন আসে না, তা মনে করিয়ে দিলেন সত্যবতী।

হা-হা করে হাসলো শশধর। "আসবো কী? বুড়োবয়সে নতুন উপসর্গ! আমাকে আর সদানন্দকে একই রোগে ধরেছে! নাতনীর মুখটা মাঝে-মাঝে না দেখলে মনটা ছটফট করে। আগে আমি সদানন্দকে ক্ষেপাতাম, 'তুমি বড্ড বেশি নাতনির নেওটা হয়ে উঠছো।' তখন সদানন্দ বলতো, 'আগে নাতি-নাতনি হোক তখন বুঝবে মজাটা! আসলের চেয়ে সুদ যে বেশি মিষ্টি তা সুদ না পাওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় না।' আমি তখন ওর কথা বিশ্বাসই করতাম না। আর খুকুমণির বিয়েটাও তো আমার ঠিক পছন্দ ছিল না, তা তো জানেনই। সদানন্দর কাছে এসেই কান্নাকাটি করেছি। বলেছি, মেয়েটা জলে পড়ছে তবু আমার আটকাবার সামর্থ্য নেই। আমি তো সদানন্দকে বলেওছিলাম, বিয়ে হলে ওদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সদানন্দ তখন ওই সুধাংশুবাবুর কথা বলেছে, যা অনিবার্য তা মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

মিষ্টি হেসে সত্যবতী জানালেন, "উনি তখনই তো বলতেন, শশধর যতই সম্পার্কচ্ছেদের ভয় দেখাক মেয়েকে এক সপ্তাহ না দেখে ও থাকতে পারবে না।"

শশধর রসিকতা করেছিল, "সদানন্দ কারখানার ওয়ার্কম্যান হলে কী হবে, ওর দূরদৃষ্টি মুনি-ঋষিদের মতন। ওর উচিত, ছোটখাট একটা আশ্রম স্থাপন করা—পাপী-তাপী যে আসবে তাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে। আমার ব্যাপারে ও বলেছিল, 'রেগে আছো, রেগে থাকো—আমি বারণ করছি না।' কিন্তু রাগের মাথায় এক কাঁড়ি প্রতিজ্ঞা করে বোসো না।' আমি বলেছিলাম, 'আমার ইচ্ছে হলে আমি প্রতিজ্ঞা করবো। এটা আমার স্বাধীনতা।' সদানন্দ তখন বলেছিল, 'বুদ্ধিমান লোকরা আগাম প্রতিজ্ঞা করে নিজেদের বেঁধে ফেলেন না, যখন যা প্রয়োজন, তা তাঁরা মুখ বুজেই করেন'।"

চোখ দুটো বড় বড় করলো শশধর। "খুব দামী কথা বলেছিল সদানন্দ। তখন রাগের মাথায় আত্মীয়স্বজনের সামনে জামায়ের সম্বন্ধে যেসব কটুকথা বলেছি, তা ভাবলে লজ্জা হয়। এখন বাবাজী সম্বন্ধে বেশ ভাল ধারণা হয়ে গিয়েছে। ছেলেটি ঈশ্বরের আশীর্বাদে সত্যিই খারাপ নয়। পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা ধরে—অথচ ওই গোলমালের সময় আমি ভেবে পেতাম না, আমার মেয়ে কেমন করে মজলো, ওর মধ্যে কী ভাল জিনিস দেখলো?"

সত্যবতী মৃদু হাসলেন। "সবই ঠাকুরের দয়া প্রথমে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি, তারপর মিটমাট, সেইটাই তো ভাল। প্রথমে খুব ভাব-সাব এবং পরে ভাঙাভাঙি হওয়া থেকে আগেরটাই ঢের ভাল।"

এরপর জামায়ের গল্প আরম্ভ করলো শশধর। "আমার গিন্নির সঙ্গে তো আপনার দেখা হয়। জামাই সম্বন্ধে সব শুনেছেন নিশ্চয়।"

সত্যবতী আবার মৃদু হাসলেন। "আপনি তো এখন জামাই বলতে অজ্ঞান, উনি বলছিলেন।"

আবার হেসে উঠলো শশধর। "সদানন্দকে আমি আক্রমণ করবো। জামাই-রোগটা তো ওকে অনেক আগেই পাকড়াও করেছে —এখন আমরা দু'জনেই তার থেকে ভুগছি।"

"উনি তো মেয়ে বলতে অজ্ঞান। মনুর শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে যা একটু দুঃখ ছিল তা কেটে গিয়েছে।"

শশধর হাসলো। "আমার মেয়ের অবশ্য ওই সব হাঙ্গামা ছিল না। জামায়ের মা-বাবা কেউ এখানে থাকে না। কাছাকাছি আপন-জন বলতে আমরাই। সংসারে আমার খুকুমণিই সব। ওর কথাই শেষ কথা।

শশধর বলে চললো, "জামায়ের সরকারী চাকরি—মাঝে-মাঝে ট্যুরে যেতে হয়, তখন আমরা ছাড়া মেয়ের কেউই নেই। খুকুমণি আগে ওই সময় আমাদের কাছেই চলে আসতো। এখন পারে না।"

ফিসফিস করে শশধর বললো, "বুঝতেই পারছেন? বাড়িতে অনেক দামি জিনিসপত্তর। আর যা সব চোর আজকালকার—স্টিলের আলমারিও পাঁচমিনিটে আমুল বাটারের মতন গলিয়ে ফেলবে। ফলে আমাকেই গিয়ে থাকতে হয় রাত্রে খুকুমণির ওখানে।"

সত্যবতী বললেন, "একযাত্রায় পৃথক ফল কেন? খুকুমণির মাকেও তো নিয়ে যেতে পারেন ওখানে। আপনাদের তো পিছু-টান নেই।"

শশধর যা সদানন্দকে বলেছে তা আর সত্যবতীকে জানাতে পারলো না। "জামায়ের অনেক দামি জিনিস আমার ওখানেই চালান করে দিয়েছে। এক জায়গায় সব রাখতে সাহস পায় না। যা আজকাল হাঙ্গামা হয়েছে—সরকারী কর্মচারির পিছনে কাঠি দেবার জন্যে সি. বি. আই না কি সারাক্ষণ তৈরি হয়ে আছে। আরে বাবা, মুরোদ যদি থাকে তাহলে আগে মন্ত্রিদের ধরো। যারা লুকিয়ে দেশের বাইরে টাকা পাচার করছে তাদের ধরো। যত হম্বিতম্বি ওই সাধারণ লোকেদের ওপরে—কে কত টাকার বাজার করছে, কে ক'খানা রুপোর থালা করেছে, তা জানবার জন্যে সারাক্ষণ উসখুস হলে চলবে কেন?"

শশধর যে এ ব্যাপারে বেশ অস্বস্তি বোধ করেন, তা তাঁর স্ত্রী

জানেন। কিন্তু মেয়ের মুখ চেয়ে কিছু বলার থাকে না।

তাছাড়া খুকুমণির মা বলেন, "উপরি রোজগার আজ আছে, কাল নেই। যখন না-লক্ষ্মী আসছেন তখন হা-ঘরের মতন উড়িয়ে না দিয়ে একটু-আধটু গুছিয়ে নেওয়া ভাল। কাল যদি জামাইকে অন্য কোথাও বদলি করে দেয়, তখন তো সামান্য মাইনেটুকু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না!"

"এসব নিয়ে তর্ক করা যায় না, মেনে নিয়েছে শশধর। শুধু বাড়ি ছেড়ে, একসঙ্গে বেরুতে গেলে একটু ভাবতে হয়।"

এই তো এক ডজন চুড়ি গড়িয়ে খুকুমণি মায়ের কাছে রেখে গেলো।

খুকুমণির মা সেই জিনিস ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে বেশ আনন্দ পেলেন। তারপর স্বামীকে শোনালেন, "খুব তো তখন বলেছিলে, মেয়েটা জলে ঝাঁপ দিলো, নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনলো। আমি অত করে বললাম, নিজের মেয়ের ওপর একটু বিশ্বাস রাখো। সব কিছুই খারাপ হতে যাবে কেন? তা সে-কথা তোমার কানেই ঢুকলো না!"

শশধর এবার সত্যবতীকে বললো, "সদানন্দ এবং আমার জামাই-ভাগ্য যে ভাল তা সবাই স্বীকার করে। আমার তো মনে হয় মন্নুর স্বামী যেরকম চালাক-চতুর তাতে কাজে আরও উন্নতি করবে। ভাগ্যক্রমে ঢুকেছেও ভাল জায়গায়—খোদ সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কোম্পানিতে। ওখানে যেসব সুখসুবিধে দেয় তা শুনলে আমরা ওগিলভি কোম্পানির লোকরা লজ্জা পাই।"

সত্যবতীর মন্তব্য, "ওঁকে তো বলছি, জামায়ের বাড়িতে টি-ভি এসেছে, মেয়ের ঝকঝকে সংসার হয়েছে এই বলে লাফালাফি করলেই তো চলবে না। ঘরের মধ্যেই তো সমস্যা শুয়ে রয়েছে ময়াল সাপের মতন।"

সত্যবতীর মুখের দিকে তাকালো শশধর। "আপনি ছোটসায়েবের

কথা বলছেন ? খুব মন দিয়ে পড়াশোনাটা চালিয়ে যাচ্ছে না ?"

সত্যবতী বললেন, "ওর বাবা রাগ করেন, কিন্তু সবার যে সব জিনিস হয় না তা বোঝেন না। উনি সেদিন বকাবকি করছিলেন, তখন বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হলো তোমারও তো লেখাপড়া হয়নি। আমড়া গাছের ডাল থেকে আমের জন্যে টানাটানি করলে কি সুবিধে হবে ?"

শশধর খুব হাসলো। "বাপের কাছে ছেলেমেয়েদের হেনস্তা হতে দেখলে মায়েরা ভীষণ রেগে যায়। আমি দেখছি, খুকুমণির মা-ও ওইরকম। আর যাই করো, ওঁর সামনে মেয়ের নিন্দা করা যাবে না।"

এবার ছোটসায়েবের সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনলো শশধর। তারপর বললো, "চিন্তা করবেন না, যিনি জন্ম দিয়েছেন তিনি অন্নও দেবেন। তবে বুঝি, সময় ভাল নয় চিন্তা একটু হয়। দিনকাল পাল্টেছে। হুট করে চাকরিও জোটে না। আর কোম্পানির মালিকরা এতো খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, মানুষ দেখলেই আঁতকে ওঠে। আরে বাবা, মানুষ না থাকলে তোমার কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতো কে ? মানুষ না থাকলে তোমার কোম্পানির মাল কিনবে কে ? তুমি তো নিমিত্ত মাত্র---মানুষকে খাটিয়ে আবার মানুষকেই বিক্রি করতে হবে তোমাকে।"

সত্যবতীও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। "আপনারা সায়েবদের বোঝান না কেন ? ওদেরও তো ঘর সংসার আছে, ভাইবোন আছে।"

ফোঁস করে উঠলো শশধর। "কর্তাদের এক-এক জনকে দেখলে মনে হয় এদের বউ ছাড়া দুনিয়ায় কিছুই নেই। কয়েকজন আবার বিলেত-আমেরিকা থেকে কী শিখে আসছে ভগবান জানেন। এরা পারলে স্রেফ যন্তর দিয়ে আপিস চালাবে। আপনাদের বাড়ির পাশের ওই লেখকমশাই তো খুব ভাল গল্প লিখেছেন—সেদিন রেডিওতে নাটক হলো। ওঁকে একদিন পাকড়াও করে ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।"

বন্ধুর স্ত্রীকে শশধর বললো, "আপনি চিন্তা করবেন না। অনেক

কোম্পানিতে ইউনিয়নের কব্জির জোর আছে—তারা শর্ত করে নিয়েছে একজন কর্মীর একজন ক্যানডিডেটকে চাকরিতে নিতেই হবে। আমাদের কারখানার ব্যাপারটা আমি ভাল করে খোঁজ নেবো'খন। তবে ম্যানেজারগুলো খুব চালাক। লিখিত চুক্তি থাকলেও অ্যাটর্নি আপিসে গিয়ে তার ফুটো বার করবে।"

"ম্যানেজার বলে বসবে, পোস্ট খালি হলে তবে তো চাকরি। পোস্টই হচ্ছে না। কিন্তু আমিও ছাড়ছি না। আমাদের নগেন আছে, এসব ব্যাপার খুব ভাল বোঝে। মালিক যদি বুনো ওল হয়, তাহলে এই নগেন হলো বাঘা তেঁতুল। ঠিক একটা পথ বার করে দেবে। আর নগেনের ছেলেটা তো হাসপাতালে চিকিৎসা বিভ্রমে মারা গিয়েছে, বংশে বাতি দেবার কেউ থাকছে না, সুতরাং ওর নিজের কোনো স্বার্থ নেই।"

সত্যবতী এবার স্বামী সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে গেলেন। শশধর আশ্বাস দিলো, "আপনাকে আর বোঝাতে হবে না। সদানন্দ এসব ব্যাপারে ভীষণ মুখচোরা—নিজে থেকে কাউকে কিছু বলতেই চাইবে না। কিন্তু যুগ অন্য, এখন মুখ না খুললে, দাবি না জানালে, কোনো শর্মা হাতের মুঠো খুলবে না।"

শশধর জিজ্ঞেস করলো, "বন্ধু আমার গেলেন কোথায়?"

সত্যবতী জানালো, "দু'টি রোগে ধরেছে। মেয়ের আব্দার—বাবা, এখানে এসে মাঝে-মাঝে টি-ভি দেখতে হবে। টিভিটা ছুতো, মেয়েকে দেখাটাই আসল ব্যাপার। না-হলে কেউ আধমাইল সাইকেল চালিয়ে টি-ভি দেখতে যায়? ওখান থেকে ফিরে বাড়িতেও বিশেষ বসেন না আজকাল। খুব ভাব হয়েছে ওই পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের সঙ্গে। সুধাকরবাবু ওঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ কী সব কথাবার্তা বলেন।"

"এই সেরেছে! আমার জামাই বলছিল, লেখকদের সঙ্গে, সাংবাদিকদের সঙ্গে বেশি কথা বলা খুব বিপজ্জনক।"

"আমার জামায়ের আপিসে একজন লেখক আছেন, তিনি তো শ্রীমানের সঙ্গে কথা বলে-বলে একটা গল্পই লিখে ফেললেন—খুকুমণির বিয়েটা যেরকম ভাবে হয়েছিল ঠিক সেই গল্পটা। আমাকে দেখেননি ভদ্রলোক, কিন্তু জামায়ের কাছে ডেসক্রিপশন শুনে-শুনে আমাকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, ঠিক যেন আমি! সেই গপ্পো পড়ে খুকুর মা তো আমাকে এক হাত নিলো। ঠিক যেভাবে অকারণে আমি রেগে উঠি লেখক সেভাবে দেখিয়েছেন—লেখকরা নাকি কখনও মানুষ চিনতে ভুল করেন না।"

পরের সপ্তাহেও শশধরের সঙ্গে সদানন্দর দেখা হলো না। হবে কী করে? মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে তিনি তখন পাশের বাড়িতে লেখক সুধাকর নন্দীর ভাবের আদান-প্রদানে ব্যস্ত।

কারখানার কর্মীদের মধ্যে যে গল্প-উপন্যাস পড়ার প্রবণতা আছে, তা সাহিত্যিক সুধাকর নন্দী জানতেন না। শহরতলীর এই অঞ্চলে বসবাস করে তাঁর চোখ খুলে যাচ্ছে। একের পর এক নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

প্রতিবেশী সদানন্দ মজুমদার কাঁচুমাচু মুখ করে এসে মাঝে-মাঝে সুধাকরের লেখা বই চেয়ে নেন।

সুধাকর ভুক্তভোগী। লেখককে হাতের গোড়ায় পেলে অনেকে দুম করে বই উপহার চেয়ে বসেন। তাঁদের ধারণা, বইগুলো যেন গাছের ফল—লেখক ইচ্ছে করলে যত খুশি বিনামূল্যে পেতে পারেন। কিন্তু এরও যে হিসেব আছে, লেখককেও যে নিজের বইয়ের জন্যে দাম দিতে হয় তা অনেকের মাথাতেই ঢোকে না।

গোড়ায় সুধাকর নন্দী তাঁর প্রতিবেশীকেও ভুল বুঝতেন। কিন্তু সদানন্দ মজুমদার সোজা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি শুধু বইটা পড়তে

চান। তাঁদের লাইব্রেরিতে বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে না।

পাওয়া যাবে কী করে? পয়সার অভাবে এ-অঞ্চলের ছোটসাইজের লাইব্রেরিগুলো এখন সব লেখকের বই কিনতে পারে না। তবে অনেক মেম্বার যদি আগাম স্লিপ দেয় তাহলে হয়তো সুধাকরের বইও ওখানে কিছু রাখা হবে।

সুধাকর আশ্চর্য হয়েছিলেন। বইটা নেবার ঠিক দু দিন পরে সদানন্দ উপন্যাসটা সযত্নে মলাট দেওয়া অবস্থায় নিজেই ফেরত দিয়ে গিয়েছিলেন। বইটা যে আদ্যোপান্ত পড়া হয়েছে তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

সদানন্দ বলেছিলেন, "ফরাসী দেশটা যে এতো সুন্দর তা আপনার বই পড়ে প্রথম জানলাম।"

সুধাকর নন্দী একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবেশীকে ঠকানোর মানে হয় না। তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, ফ্রান্সে নিজে কখনও না গিয়েই তিনি তাঁর গল্পের নায়ককে ফরাসী দেশে পাঠিয়েছেন।

বইটি পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সদানন্দ। লেখক মানুষ, মনের মধ্যে কতরকম আবেগ বয়ে যায়।

সুধাকর এবারেও তাঁর উৎসাহী পাঠককে ঠকাননি। বলেছিলেন, "আবেগটাবেগ কিছু নয়। সব কিছু হয় প্রকাশকের নির্দেশে। আবেগ থাকলে বইয়ের বিক্রি বাড়তে পারে। তাছাড়া সব নায়ককেই এই কলকাতা অথবা ওয়েস্টবেঙ্গলে গাদাগাদি করতে হবে কেন?"

সদানন্দ এরপর আর একখানা বই লেখকের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন।

"এই বইটাতে নায়ক···" লেখক একটু ভিতরের ব্যাপার বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সদানন্দ হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

ভিতরের একটা লাইনও বলবেন না, আমি নিজেই সব খুঁজে বার করে নেবো। আমার বন্ধু শশধরের একটুও ধৈর্য নেই—চান্স পেলেই

জেনে নিতে চায় গল্পটায় শেষ পর্যন্ত কী হবে। আমি ঠিক উল্টো—সুধাংশুবাবু স্যর যেরকম বলে দিয়েছিলেন ঠিক সেইরকম মেনে চলি। উনি বলতেন, প্রত্যেকটা বই লেখক একটা বিশেষ চিন্তা অনুযায়ী সাজিয়ে নেন। সেইটাকে মেনে নি বই না পড়লে বইয়ের মূল কথাটাই হারিয়ে যেতে পারে।”

সুধাকর নন্দী এবারে বিস্মিত। কারখানার একজন সাধারণ কর্মীর কাছ থেকে এরকম মন্তব্য তিনি প্রত্যাশা করেননি।

এই বইটাও কয়েকদিন পরেই লেখক সুধাকর নন্দীর হাতে ফিরে এসেছিল।

সদানন্দ প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে ব ছিলেন, “তাজ্জব ব্যাপার জিমবাওয়ে বলে যে একটা দেশ আছে আমি তাই জানতাম না। আমরা যখন ইস্কুলে পড়েছি তখন···স্বীকার করছি আমি ভূগোলে ফেল করতাম, ভোলানাথবাবু আমাকে মাত্র একুশ নম্বর দিয়েছিলেন। কিন্তু জোর করে বলতে পারি, আমাদের ভূগোল বইতে ওইরকম কোনো দেশের নাম ছিল না।”

সুধাকর নন্দী বললেন, “সময়ের স্রোতে পুরোনো কত দেশ মানচিত্র থেকে মুছে যাচ্ছে, আবার নতুন কত দেশ জন্ম নিচ্ছে। মানুষও যেমন চিরকাল বাঁচে না, দেশও তেমনি চিরকাল থাকবে টিকে এই গ্যারান্টি আজকাল দেওয়া যায় না।”

“উঃ সত্যি অসাধারণ মানুষ আপনি। দুর্দান্ত বর্ণনা দিয়েছেন জিমবাওয়ে দেশটার। ওখানকার রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, দোকানপাট, লোকজন সব আমার চোখের সামনে ভাসছে।”

সুধাকর নন্দী এবারেও নিজেকে রহস্যাবৃত করলেন না। স্বীকার করলেন, বড় বড় ম্যাপ এবং মার্কিনদেশ থেকে প্রকাশিত ভূগোলের বই পড়ে পড়ে তিনি দেশটার ছবি এঁকেছেন।

সুধাকর শান্ত হয়ে বললেন, “মুশকিল হয়েছে কি, কিছু লোক এখন আফ্রিকার গল্প পড়তে চাইছে। ইংরিজি হলে সায়েব লেখকরা

ওখানে হুশ করে চলেই যেতেন, আমাদের দেশের লেখকদের তো সেই আর্থিক সাশ্রয় নেই।"

প্রতিবেশী পাঠক সদানন্দ মজুমদার এই মুহূর্তে সুধাকরের সামনে মাথা নিচু করে বসে রয়েছেন।

প্রিয় সুধাংশুবাবু স্যরের আর একটি মন্তব্য সদানন্দর মনে পড়লো, লেখক আর ভগবান এক জিনিস। সদানন্দ বললেন, "যা ইচ্ছে তাই সৃষ্টি করতে পারেন আপনারা।"

খুব লজ্জা পাচ্ছেন সুধাকর নন্দী। লেখকের মধ্যে ভগবান আছেন, কিন্তু তাঁরা মস্ত লেখক—বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ। রাম!, শ্যামা এবং সুধাকর নন্দী সে দলে নন। এঁরা সংসার চালানোর জন্য লেখেন।

কিন্তু পাশের বাড়ির গোবেচারি মানুষটিকে এসব কথা বেশী বলে লাভ নেই। সদানন্দ সবিনয়ে নিবেদন করলেন, "সময় পেলে যদি আপনার নায়ক কুণাল আর নায়িকা শকুন্তলাকে একবার রটারডামে পাঠাতেন।"

"রটারডাম!" মাথা চুলকোলেন সুধাকর নন্দী। "ইউরেকা। এই চমৎকার মতলবটা আমার মাথায় তো আগে আসেনি।" প্রবল উৎসাহে সুধাকর বললেন, "আমার কাছে দু তিন খানা পুরনো ইউরোপিয়ান ট্রাভেল গাইড বুক আছে। আপনাকে এখনই বলে দিতে পারি কুণাল আর শকুন্তলা যদি কখনও রটারডামে যায় তাহলে তারা কোন হোটেলে থাকবে। হোটেলটা এয়ারপোর্ট থেকে কত কিলোমিটার দূর তাও আপনি জেনে রাখতে পারেন। ওই হোটেলে পাঁচ বছর আগে কত ঘর ভাড়া ছিল তাও বলে দিচ্ছি। সব জায়গায় হুড়হুড় করে পয়সার দাম কমে যাচ্ছে। সুতরাং গল্প লেখার সময় হোটেলের ঘর ভাড়া ডবল করে দেবো।"

সদানন্দ মজুমদার সবিস্ময়ে ভাবছেন, লেখক ভদ্রলোকটি সত্যিই মহাপণ্ডিত।

কিন্তু সুধাকর বললেন, "মোটেই পণ্ডিত নই। ফোডরস্ গাইড বুক থেকে দেখে-দেখে আমি এমন সব হোটেলের নাম দিই যা সত্যিই আছে। তবে-না উপন্যাসটা সত্যি-সত্যি মনে হবে।"

দুঃখ এই, এতো কষ্ট করেও সমস্ত পাঠককে কাছে টানা যায় না। ফ্রান্সের পটভূমিকায় লেখা সুধাকরের বইটা এখন প্রায় পোকায় কাটছে। প্রকাশক ধৈর্য হারিয়ে শেষ পর্যন্ত না সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে সিকি দামে ঠেলে দেয়। গুদোম সাফের লিস্টিতে পড়ে গেলে বইপাড়ায় সে-লেখকের সম্মান কমে যায়, অন্য প্রকাশকরাও তাঁকে এড়িয়ে চলেন।

সুধাকর নন্দীর বিস্ময়বোধ বাড়ছে। তিনি এবার সদানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, "এতো জায়গা থাকতে আপনি রটারডাম ভ্রমণ চাইছেন কেন? নামটা অবশ্যি বেশ রোমাঞ্চকর।"

লজ্জা পেয়ে গেলেন সদানন্দ। "আমাদের ওগিলভি কারখানার ফিনিশিং ডিপার্টমেন্টে যেসব মাল চেকিং করি সেগুলো প্রায়ই রটারডামে যায়। আমরা তো অতশত বুঝি না। চেক করে প্যাকিং বক্স-এর ওপর একটা লেবেল সেঁটে দিই। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো জায়গাটায় আপনার নায়ক-নায়িকা একবার গেলে আমাদেরও একটু দেখা হয়ে যেতো।"

সুধাকর নন্দী নিজেই হিটারে চা বসিয়ে দিয়েছেন। ওঁর ঘরের এক কোণে চা তৈরির সরঞ্জাম রয়েছে। স্ত্রী আর কতবার চা সাপ্লাই করবেন, তাঁর হাজার সংসারের হাঙ্গামা রয়েছে। তাছাড়া বাড়িতে কোনো কাজের লোক নেই।

সুধাকর নন্দী বললেন, "আমার একজন নায়ককে ফরেনে পাঠিয়ে তাকে রাতারাতি স্বনির্ভর করে তুলেছিলাম। দেখিয়েছি, যে-পুরুষ মানুষ এখানে জল গড়িয়ে খেতো না সে-ই ম্যানচেস্টারে গিয়ে নিজে ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ তৈরি করছে। বইটা বেরবার পরে আমি নিজেও চায়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠলাম গল্পের বর্ণনা অনুযায়ী। এখন আমি অনায়াসে হিটার জ্বালাই, চা করি। দুধ এবং চিনির বালাই নেই

সুতরাং নো হাঙ্গামা।”

সদানন্দ আবার অন্তত দু চামচ চিনি না ঢেলে চা খান না। কারখানার সবাই তাই। ক্যানটিনে চায়ে মিষ্টি কম হলে হৈ-হৈ পড়ে যায়। আজকাল চিনিতেও কিছু গোলমাল হচ্ছে, দু চামচেও এক কাপ চা মিষ্টি হতে চায় না। জামায়ের কারখানায় কোম্পানির কাছে শ্রমিকদের জন্যে সাপ্তাহিক সুগার অ্যালাউন্সের চিঠি গিয়েছে ইউনিয়ন অফিস থেকে—যেমন সাবান অ্যালাউন্স পেয়ে থাকে শ্রমিকরা।

সুধাকর নন্দী বললেন, “যারা সেলফ-এমপ্লয়েড তারা কাকে আর পিটিশন লিখবে? স্বনির্ভর মানুষকে নিজেই সব ব্যবস্থা করে নিতে হয়।”

মৃদু হেসে সুধাকর ড্রয়ার খুললেন, “জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্যে গোটা কয়েক চিনির পুরিয়া রেখে দিয়েছি।” কটা পুরিয়া সযত্নে সুধাকর এগিয়ে দিলেন তাঁর অতিথির দিকে।

“রটারডামের ব্যাপারটা আমি ভুলছি না, সদানন্দবাবু। খুব চুপিচুপি কাজটা সেরে ফেলতে হবে। লেখক চিন্তামণি দাশের কানে খবরটা পৌঁছলে একুশ দিনে বই বার করে ফেলবে রটারডাম শহরের ওপর—তাতে একটা ছেলে চুরির ব্যাপার থাকবে, একটা মোটর দুর্ঘটনা, একটা খুন এবং একটা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার। আমি অনেটাই নিচে নেমেছি আগে। কিন্তু এখন কীরকম দ্বিধা আসে। মনে হয় জনসাধারণকে ঠকাচ্ছি—জীবনটা তো অমন ফর্মুলায় ফেলা নয়। এখানে সবসময় রোমাঞ্চকর কিছু ঘটে না।”

সদানন্দ একটু বিস্মিত হলেন। লেখকদের নিজের মনের মধ্যেও যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে সে কথা তো সুধাংশুবাবু স্যর কোনোদিন ক্লাশে বলেননি।

সুধাকর বললেন, “কমার্শিয়াল লেখক চিন্তামণি দাশ কী রকম জানেন? আপনাদের ওই ওগিলভি কোম্পানির প্যাকিং-এর কথা

শুনলো তো। আপনাদের হাওড়া গুদামেই একটা বড় প্যাকিং বাক্সের মধ্যে গল্পের নায়ককে ঢুকিয়ে দিলো। সেই বাক্স খিদিরপুরে জাহাজে লোড হয়ে সোজা নামলো রটারডাম বন্দরে। ওইখানে রাত্রিবেলায় প্যাকিং বাক্স ভেঙে চিন্তামণি দাশের নায়ক রটারডামের রাস্তায় বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তিন সপ্তাহ ধরে একজন মানুষ কী করে ওই বাক্সে থাকলো, কী খেলো, কী ভাবে ঘুমলো এসব বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে যাবে না চিন্তামণি দাশ।"

একটু ভাবলেন সুধাকর নন্দী। তারপর বললেন, "ভদ্রলোকের ওপর রাগ করি, তবে ভেবে দেখলে খুব দোষ দেওয়া যায় না। বই পিছু আড়াইশ টাকা পায় চিন্তামণি দাশ। প্রতি তিন সপ্তাহে বেচারাকে একখানা বই ডেলিভারি দিতে হয়। পারবে কী করে বেশি ভাবতে?"

জীবন্ত লেখকদের জীবনযাত্রা সদানন্দকে বেশ কৌতূহলী করে তুলছে। লিখলে টাকা পাওয়া যায় এবং সেই টাকায় অনেকের সংসার চলে, এসব কথা সদানন্দর মাথায় আগে কখনও ঢোকেনি।

সুধাকর নন্দীও গল্পের নতুন উপাদান সংগ্রহ করছেন। পাঠক সমাজ সম্বন্ধে তাঁর অন্য ধারণা ছিল। ইস্কুলের মাস্টার, অফিসের কেরানি এবং তাঁদের স্ত্রী ছাড়া আর কেউ বাংলা বই পড়ে তা তাঁর আন্দাজের বাইরে ছিল। বিশেষ করে কারখানার শ্রমিকরাও যে বাংলা বইয়ের পাঠক হতে পারে তা ভাবতে ভাল লাগছে।

সদানন্দকে প্রশ্ন করে সুধাকর জানলেন, কারখানায় যেসব ভিন্ন প্রদেশের কর্মী আছে তারা এখনও বইতে আগ্রহী নয়। এদের মধ্যে বিহারের মানুষ আছে, উত্তরপ্রদেশের মানুষ আছে। ওগিলভি কোম্পানির কিছু কাজ তো উৎকলবাসীদের একচেটিয়া। এ অঞ্চলে অন্ধ্রের মানুষও আছে বেশ কিছু। কবে এরা ভাগ্য সন্ধানে নিজেদের দেশ ছেড়ে এই

অভাগা কলকাতায় এসেছিল তা এরা নিজেরাই জানে না। কিন্তু বংশপরম্পরায় জুট মিলে, কেমিক্যাল কারখানায় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে এরাকাজ করে চলেছে। ভাগ্যের পরিবর্তন কিছুই হয়নি—এদের অনেকে চমৎকার বাংলা এবং হিন্দি শিখে ফেলেছে।

সদানন্দ বললেন, "আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই লাইব্রেরি থেকে বই নেয়। বেশিরভাগই তো টি-টি-এম-পি (টেনে-টুনে-ম্যাট্রিক-পর্যন্ত), অনেকে আবার রেড-আপ-টু-ক্লাস-এইট। মানে অনেক চেষ্টা করে ক্লাশ সেভেন পেরিয়ে ক্লাশ এইটে উঠে পড়াশোনায় হোঁচট খেয়েছে চিরকালের জন্যে। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় মাস্টারের তাড়নাতেও যারা বইকে গোমাংসবং এড়িয়ে যেতো তারাই সময়কালে কারখানার লাইব্রেরিতে এসে নতুন বইয়ের জন্যে লাইন দেয়।"

বেশ ভরসা পেলেন সুধাকর নন্দী। ভারতবর্ষের ক'টা লোক আর ম্যাট্রিক পাশ করেছে? তার সঙ্গে তো বই পড়ার কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়। রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, রামপ্রসাদও তো ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসেননি, ওটা কোনো ব্যাপারই নয়।

"তা দিন কাল কেমন কাটছে বলুন?" সুধাকর নন্দী এবার সদানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন "এক একবার মনে হয় মানুষের জীবনে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই।"

"দুর্গা, দুর্গা!" কপালে হাত ঠেকালেন সদানন্দ। "কথাটা ঠিক নয়, সুধাকরবাবু। মানুষ ভীষণ চালাক। দেবতাকে ফাঁকি দেবার জন্যে সুখটা লুকিয়ে রাখে, আর দুঃখটাই ঢাক বাজিয়ে জাহির করে।"

"এ-কথা আপনি ভেবে-চিন্তে বলছেন, সদানন্দবাবু?"

"এই দেখুন না, আমার কথা। আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ি নিয়েও হাজার যন্ত্রণা ছিল। তারপর সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, এই মনে করে ওদের আলাদা করে দিয়েছি। এখন স্রেফ সুখ। আমার জামাই টি-ভি কিনেছে।"

সদানন্দ আবার শুরু করলেন, "বলুন এটা মস্ত সুখ কিনা?

জামাইকে কিস্তি দিতে হচ্ছে বটে, কিন্তু আমার মেয়ের বাড়িটা সারাক্ষণ ঝলমল-ঝলমল করছে।"

সদানন্দ বলে চললেন, "আমি এখন ভাবি, কেন সায়েবরা আলাদা আলাদা থাকায় বিশ্বাস করে, কেন যৌথ পরিবার সম্বন্ধে ওদের এতো ভয়। আপনারই একটা বইতে তো পড়েছি, বিলিতি মেমসায়েব বলছেন, জয়েন্ট ফ্যামিলি মানে তো জেলখানা।"

"এখন মেয়ের মুখে হাসি দেখছি এবং কথাটা বিশ্বাস করছি আমারও দেখুন, আপিসের সাহেবরা গলায় মালা দিলেন, বাড়িতে গোদরেজের আলমারি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এসব কখনও কি স্বপ্নেও ভেবেছি? কমবয়সে ভয় পেয়েছি লেখাপড়া হলো না, সুতরাং সারাজীবন লোহাপিটে মরতে হবে। কিন্তু কারখানার কাজে নেমে দেখলাম লোহাপেটা জিনিসটা অত কষ্টকর নয়। আমি সত্যি কথা বলতে কি বেশ সুখী। মেয়েটাকে ওই শ্বশুরবাড়ির জেলখানা থেকেবার করে ভাড়া-বাড়িতে প্রতিষ্ঠে করে দেবার মনোবল দেখানোর পর থেকেই সব ক্রমশ ভাল হতে শুরু করলো। আমার যে সুদিন এসেছে তা অস্বীকার করলে দেবতার কাছে নেমকহারামি করা হবে।"

সদানন্দ এবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। "আপনি লেখক মানুষ, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ভগবান আপনাদের কত চিন্তার খোরাক দিয়েছেন।"

হাসলেন সুধাকর। রটারডাম সম্বন্ধে সময় পেলেই তিনি একটু পড়াশোনা করে নেবেন। তারপর বললেন, "আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, গল্পের নায়ক-নায়িকাদের কথায়-কথায় ফরেনে পাঠাই বটে, কিন্তু কাজটা করে মনে তেমন সুখ পাই না।"

চোখ দুটো বড় করলেন সদানন্দ। সুধাকরের নায়ক-নায়িকারা যখন প্যারিস, লণ্ডন, রোমের বড়-বড় রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ অথবা ডিনার করে তখন তো তাদের একবারও অসুখী বলে মনে হয় না। বরং ওদের সুখ অনেক সময় সাধারণ পাঠকের মনে একটু না-

পাওয়ার বেদনা আনে।

মনে হয়, বিশ্বসফরকারী নায়করা কত ভাগ্যবান, আমি তো কিছুই পেলাম না। প্যারিস তো দূরের কথা, বোম্বাই শহরে যাওয়ার সামর্থ্যও হবে না। সুতরাং দেখে নেওয়া যাক লণ্ডনের কোন রেস্তোরাঁয় কী রকম খাওয়ায়।

সদানন্দ একবার হিসেব করেছিলেন, সুধাকরের নায়ক-নায়িকা প্যারিসের এক ভোজনালয়ে ডিনার খেয়ে কত টাকা বিল দিলেন। তারপর দেখলেন, টাকার পরিমাণটা তাঁর সমস্ত মাসের মাইনের থেকেও বেশি।

কথাটা শুনে সুধাকর নন্দী বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলেন। জানতে চাইলেন, "আপনার মনের অবস্থাটা তখন কী রকম হলো?" লেখক হিসেবে ব্যাপারটা তাঁর জানা দরকার।

সদানন্দ লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন, "আমার তৎক্ষণাৎ মনে হলো, আপনি ভীষণ অপচয় করছেন। একটা ডিনারে অতগুলো টাকা উড়িয়ে দেবার কী প্রয়োজন ছিল? ওখানে কি কম দামের খাবার জায়গা নেই? কুণাল ও শকুন্তলা কি ওইরকম একটা সাধারণ দোকান খুঁজে বার করতে পারতো না?"

সুধাকর আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন। "গল্পের নায়ক-নায়িকাকে ভাল জায়গায় খাওয়াতে আমার পকেট থেকে তো কোনো খরচ হচ্ছে না, সদানন্দবাবু। আমার কাছে সব সমান। যে-লোক এখানকার রাস্তায় পয়সার অভাবে ভুট্টা খাচ্ছে তাকেই আমিএক খোঁচায় প্যারিস হিলটন হোটেলে পাঠিয়ে দিতে পারি।"

তবু সদানন্দর দুঃখের কথাটা সুধাকর বুঝলেন। ঝুটমুট এতোগুলো পয়সা গল্পের মধ্যে নষ্ট হলেও সীমিতবিত্ত সাধারণ পাঠকের মনে লাগে।

সুধাকর নন্দী আবার স্বীকার করলেন, তাঁর নায়কদের কথায়-কথায় লণ্ডন প্যারিস রোমে ঘুরে বেড়ানো তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। "আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি সদানন্দবাবু। আমি আর্থিক দিকটা একটু

সামলে নিতে পারলেই এবার এই ছুতোরপাড়া, ধোপাপাড়ার গল্পে ফিরতে চাই।"

"সে কি। পৃথিবীতে এতো জায়গা থাকতে শেষপর্যন্ত এই ছুতোরপাড়া। সেটা কি কাজের-কাজ হবে সুধাকরবাবু? ওই যে ওদের দু'জনে নৌকো করে ভেনিস ঘুরে বেড়ানোর সময় আকাশে চাঁদ উঠলো, আমাদের নায়িকা শকুন্তলা চাপা গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে লাগলো, আপনি এরকম চমৎকার সীন তো আর এই ছুতোরপাড়ার গল্পে আঁকতে পারবেন না।"

সদানন্দ বৈঠকখানা থেকে বিদায় নেবার পর সাহিত্যিক সুধাকর নন্দী তাঁর মোটা ডাইরিটা বার করলেন। ওখানেই তাৎক্ষণিক চিন্তাগুলো তিনি প্রথম সুযোগেই লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

সুধাকর নন্দী লিখছেন: ট্র্যাশ ভ্রমণ-রোমান্স লিখে-লিখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার নায়িকা শকুন্তলা এখন আর বিদেশে যেতে চাইছে না। সাগরের ওপারে গ্ল্যামার আছে কিন্তু প্রাণ নেই। আমি এখন ঘরের কথা লিখতে চাই।

এই সদানন্দ মজুমদার মানুষটিকে আমি যত দেখছি তত ভাল লাগছে। শ্রমিক সমাজ সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত পরিবেশে বড় হয়ে যাঁরা নিম্নবিত্ত হয়েছেন তাঁদের মানসিকতা আমাকে আকর্ষণ করছে।

সদানন্দ অবশ্য আমাকে সম্পূর্ণ ভরসা দিতে পারছেন না। বলছেন, "বই লেখার মতন বড় বড় ঘটনা এ পাড়ায় কিছুই পাবেন না, হয়তো আপনার পরিশ্রমটাই বৃথা হবে।"

আমি অবশ্যই একমত হতে পারিনি সদানন্দর সঙ্গে। এখানে এই টিন ও টালির ঠিকে প্রজা সত্বের বাড়িগুলোতে নিটোল গল্প নেই তা

কেমন করে হতে পারে ?

সদানন্দ মাথা চুলকে বললেন, "এই শশধর ও আমার কথা ধরুন। শশধর ও আমি দু জনেই ছাদনাতলায় প্রথম বউকে দেখি। আমরা দু জনেই হনিমুন কাকে বলে জানি না। আমার গিন্নি তো হনিমুন ব্যাপারটা কি তাই ঠিক এখনও বুঝতে পারেন না। বলেন, ঘর সংসার শ্বশুরশাশুড়ি মা বা ভাইবোন দেওর-ননদ সব পড়ে রইলো আর বর-বউ ছুটলো কোনো অচেনা জায়গায়—একি আনন্দ বাবা বুঝি না। যারা ঘর সংসার ভালবাসে তারা এমন কাজ করে না।"

"রোমান্স বলতে, ওই শশধরের মেয়ে খুকুমণির ব্যাপারটা। লুকিয়ে-লুকিয়ে বাবা-মাকে না জানিয়ে রাস্তায় কখন সামান্য পরিচিত পুরুষের সঙ্গে গল্পগুজব করেছে। কিন্তু তারপরেই তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাপের সঙ্গে মেয়ের সংঘাত ছিল প্রথম দিকে, এখন সেসব মিটে গিয়েছে।"

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন বলুন, এতে কী গপ্পো হবে ? কীভাবে ওদের বিয়েটা হয়েছিল তা এখন কারও মনে নেই। এখন আরও দশটা মেয়ের মতন খুকুমণি সকালে রান্না করছে, স্বামীকে আপিস যাবার আগে ভাত দিচ্ছে—দোকানের খাবার সহ্য হয় না বলে টিফিন বাটি পুরে দিচ্ছে ব্যাগে। মাঝে-মাঝে ওরা সিনেমায় যায়, ফেরবার পথে মণিহারী দোকানে টুকিটাকি জিনিস কেনে। এতে গপ্পো হয় আপনার ?" সদানন্দ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। জানাশোনা হলো, একটু টানাটানি হলো, বিয়ে হলো, তারপর একঘেয়ে ঘরসংসার শুরু হলো। স্রেফ এর থেকে কী গল্প বার করা যায় ?

আমি খুকুমণির ব্যাপারটা নিয়ে মনের মধ্যে খেলা করছি। আচ্ছা, খুকুমণি লুকিয়ে-লুকিয়ে প্রেম করলো তারপর ছেলেটি সময়মতো কেটে পড়লো ?

এটা আজকালকার যুগে পাড়ায়-পাড়ায় এতো হচ্ছে যে কোনো

গল্পই নয়।

আচ্ছা, প্রবঞ্চনার পরে যদি খুকুমণি বিষ খায়? কিংবা গলায় দড়ি দেয়? তাহলেও কোনো গল্প হয় না। এরকম কিছু সত্যি ঘটলেও তা নিয়ে থানা-রিপোর্টার খবরের কাগজে এক লাইন ছাপিয়ে দেবে কোনোও এক পাতায়—সে-খবর নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। প্রণয়ে ব্যর্থতা আজকালকার যুগে কোনো গল্পই নয়।

বেশ বাবা, খুকুমণির গায়ে আমি কেরোসিন ঢালছি না। আমি দেখাতে পারি, যথাসময়ে ওদের বিয়ে হয়ে গেলো। তারপর· ·

তারপর ধরুন প্রকাশ পেলো শশধরবাবুর জামাইটা পয়লা নম্বর জোচ্চোর। খুকুমণির কষ্টের শেষ নেই।

তা হলেও তো একালে কোনো গল্প হয় না। এরকম ঘটনার সূত্র এদেশে ডজন-ডজন পাবেন। সদানন্দ ও শশধর এঁরা দুজনেই এইধরনের অনেক খবর এনে দেবেন।

তারপর সদানন্দবাবু মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছেন। "একটা মেয়ে বাপের অমতে বিয়ে করে, ভগবানের আশীর্বাদে একটু সুখে আছে, ঘর-সংসার সাধ্যমতো সাজিয়েছে, মনের আনন্দে স্বামীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। স্রেফ একটা গল্প তৈরির জন্যে তার সোনার সংসারে আপনি কেন আগুন ধরিয়ে দেবেন?"

আমি বুঝছি, ছেলেমেয়ের বাবা হিসেবে সদানন্দবাবু আমার কাছে একটা পিক্যুলিয়র আবেদন করছেন।

আসলে আমি খাতায়-কলমে কী করি, তাতে ছুতোরপাড়ায় রক্ত-মাংসের খুকুমণির কিছু এসে যাবে না। সে যেমন আছে তেমনই থাকবে।

তবু সদানন্দবাবু যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন লেখকের দিকে। বলছেন, "মুরোদ থাকে তো এই হাসিখুশি খুকুমণির দু-দণ্ডের সুখ নিয়েই গল্পটা শেষ করুন।"

কিন্তু পৃথিবীর সবাই জানে এইভাবে এ-যুগের গল্প-উপন্যাস শেষ করা যায় না। তাছাড়া· ·আমার মাথায় অন্য চিন্তাও ভেসে উঠছে। এই সুখে

দিন যাপনের ব্যাপার দিয়ে যদি গল্প শেষ হয় তা হলে ধোপাপাড়া ছুতোরপাড়ার আইবুড়ো মেয়ের বাপ-মায়েরাও সন্তুষ্ট হবেন না।

তাঁরা বলবেন, "আপনি মেয়েদের বেপরোয়া প্রেমে উস্কানি দিচ্ছেন—রাস্তার অজানা ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। এইসব জানাশোনার কী বিপদ, তা শিবপুর থানায় যে-কোনো ছোট দারোগাও আপনাকে বলে দিতে পারতেন।"

আমি শশধরবাবু, খুকুমণি এবং তার পছন্দ-করা স্বামীকে মাথার মধ্যে রেখে নানাভাবে গল্পের ছক সাজিয়ে যাচ্ছি। উপন্যাসের নানা সম্ভাবনার কথা ভাবছি।

যেমন ধরুন, আমি খুকুমণির বিবাহপ্রস্তাবে উৎসাহ দেখাচ্ছি না। লেখকের সমস্ত সহানুভূতিটা আমি পিতা শশধর সামন্তর ওপর ঢেলে দিয়েছি।

শশধর সামন্ত মধ্যবিত্ত পরিবেশে বড় হলেও আর্থিক মাপকাঠিতে নিম্নবিত্ত। কারখানায় কর্মীদের রুক্ষতা, কাঠিন্য, ঘসঘসে ভাব ওঁর মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে। এই অবস্থায় ধরুন যদি ওগিলভি কোম্পানির কেমিক্যাল কারখানা থেকে ফেরার পথে শশধর সামন্ত একদিন দেখলো, রাস্তায় একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় সন্ধ্যা আটটার সময় তার মেয়ে খুকুমণি একটা অচেনা ছেলের সঙ্গে বুঁদ হয়ে গপ্পো করছে।

মাথায় রক্ত চড়ে উঠলো শশধরের। মেয়ের ইজ্জৎ রক্ষা করার জন্যে সে খাপ্পা হয়ে উঠলো। তারপর কথা কাটাকাটি, প্রায় হাতাহাতি এবং হৈচৈ।

এই অবস্থায় শশধরের ব্লাডপ্রেসার হিমালয় শীর্ষে আরোহণ করলো এবং কোনোক্রমে বাড়ি ফিরে শশধর অচৈতন্য হয়ে পড়লো।

এরপর যমে-মানুষে টানাটানি শুরু হলো। এই অবস্থায় কলমের এক খোঁচায় আমি শশধরের অকাল মৃত্যু ডেকে আনতে পারি। কিন্তু তাহলে তো আর একটা স্বাদহীন পানসে বাংলা গল্পের সৃষ্টি হবে।

আমি বরং শশধরকে জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি রেখে গল্পটাকে ঝুলিয়ে রাখি। এই সময় খুকুমণির প্রেমিকের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা বেরিয়ে আসুক—সেবায়, যত্নে, সমধুর ব্যবহারে তার ব্যক্তিত্ব অনেক ওপরে উঠে যাক। সেইসময় একদিন শশধর সামন্ত আবার চোখ খুলুক। ভুল বোঝাবুঝির অবসান হোক, একটা নতুন পারিবারিক ভালবাসার জন্ম হোক—

এই পর্যন্ত লিখে সাহিত্যিক সুধাকর নন্দী তাঁর ডাইরি বন্ধ করে রাখলেন সাময়িক ভাবে। ব্যাপারটা ঠিক এগোচ্ছে না।

কয়েকদিন পরে সাহিত্যিক সুধাকর নন্দীকে আবার ফাউনটেন পেন খুলে উদাসভাবে নিজের চেয়ারে বসে থাকতে দেখা গেলো।

সুধাকরের সামনে এক পেয়ালা ব্ল্যাক কফি। যখন নিজের ভাবনা-চিন্তাকে সুতীক্ষ্ণ করার প্রয়োজন হয়, যখন একটা কোনো বিশেষ ধারণার ওপর সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন সুধাকর তাঁর পানীয়তে দুধও মেশান না।

এই আইডিয়াটা সুধাকর পেয়েছিলেন বিলিতি এক উপন্যাসের নায়কের কাছ থেকে। কালো এবং তিক্ত—ব্ল্যাক অ্যাণ্ড বিটার—তবেই না মস্তিষ্কের কোষগুলো সজাগ হয়ে উঠবে। বুঝবে, মালিক অকস্মাৎ হুঁশিয়ার সংকেত পাঠিয়েছেন, দ্রুতপ্রস্তুতি চাই।

সুধাকর নন্দী তাঁর মোটা নোট বইটা সামনে খুলে রেখেছেন। কলমেও কালি পুরে নিয়েছেন কয়েক মিনিট আগে।

লিখতে-লিখতে মনের আকাশে যখন নতুন ভাবনার বৃষ্টি নামে তখন সুধাকর কলমটা ভর্তি করে নেন। নতুন কালি ভর্তি হলেই সুধাকর দেখেছেন লেখার সজীবতা বাড়ে। সুধাকরের এই কলমটার সব ভাল কিন্তু এক সঙ্গে বেশি কালি ওঠে না। কয়েক পাতা লিখলেই ফুরিয়ে যায়।

সুধাকর জানেন, অনেক মানুষই এই রকম। অল্প সময়েই এরা নিঃস্ব হয়ে যায়, হারিয়ে যায় সমস্ত সঞ্চয়।

কিন্তু তাই বলে তাকে ত্যাগ করা যায় না। যে অঞ্চলে সুধাকর নন্দী ভাগ্যের খেয়ালে উঠে এসেছেন এখানকার মানুষগুলোও সেই রকম—অনেককিছু অনেকক্ষণ ধরে জমিয়ে রাখার মতন ভাণ্ডার তাদের নেই। কিন্তু তবু এদের ভালবাসায় পড়ে গিয়েছেন সুধাকর নন্দী।

কয়েকদিন হলো ব্যাংককের পটভূমিকায় একটি কাহিনী রচনা করেছেন সুধাকর নন্দী—যা তাঁর প্রকাশক "প্রমোদ উপন্যাস" বলে প্রচার করছেন।

প্রকাশকের ধারণা, সামাজি৲ সমস্যা সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা শুনবার জন্যে মানুষ আজকাল উপন্যাস খুলে বসে না। সাধারণ পাঠক চাইছেন দৈনন্দিন সমস্যা থেকে দু'দণ্ডের মুক্তি।

তাই "প্রমোদ" কথাটি বহুচিন্তা করে খুঁজে বার করেছেন প্রকাশকের প্রচার সচিব।

সুধাকরের প্রতি প্রকাশকের নির্দেশ ছিল, "গল্পটা যখন থাইল্যাণ্ডের পটভূমিকায় তখন সহজেই প্রমোদের এভারেস্ট শৃঙ্গে উঠে যেতে পারবেন আপনি। আপনি যদি প্রগতিবাদীর মানসিকতা দেখাতে চান, তা হলেও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি স্রেফ ভিয়েৎনাম ফেরত মার্কিনী সৈন্যদের ব্যাংককে প্রমোদবিহারের ওপর অনুসন্ধানী আলো ফেলুন।"

সুধাকর বলেছিলেন, "ভিয়েতনামের যুদ্ধ কবে মিটে গিয়েছে, আমার গল্প তো এখনকার পটভূমিকায়।"

প্রকাশক ছাড়বার পাত্র নন। মার্কিনী ম্যাগাজিন থেকে সুধাকরকে কাটিং পাঠিয়েছিলেন, নারীমাংসলোলুপ সমৃদ্ধ জাপানী পুরুষদের ভ্রমণ-বিলাস সম্বন্ধে।

সুধাকর নন্দী ওই ব্যাংককের হোটেলেই একটি কলকাতার মেয়েকে হাজির করেছেন। করতে বাধ্য হয়েছেন বলতে পারা যায়। কারণ গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে নিজেদের দেশের চরিত্র না থাকলে কোথায়

কী যেন ঘাটতি থেকে যায়। সাধারণ পাঠক-পাঠিকা কখনও দূর দেশের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে চায় না।

প্রকাশকের ইচ্ছা, সুধাকরের পরবর্তী লেখাটিও প্রমোদ উপন্যাস হোক। "পৃথিবীতে কোন বড় শহরে প্রমোদ হয় না? আপনার তো কোনো অসুবিধাই নেই। টপাটপ এক-একটা শহরের বর্ণনা দেবেন এবং রমনীয় প্রমোদের পরিবেশ তৈরি করবেন। আপনি খালি মাঠে গোল করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন, অন্য লেখকরা আপনাকে হিংসে করবে মশাই," রসিকতা করেছেন প্রকাশক।

প্রথমে ইঙ্গিত ছিল ম্যানিলার প্রতি। সুধাকর মানচিত্র খুঁজে শহরটার অবস্থিতিও দেখে নিয়েছেন—ফিলিপাইনসে।

"গপ্পো তো ওখানকার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে," আবার রসিকতা করেছিলেন প্রকাশক।

সুধাকরের ডায়রিতেও লেখা আছে, কলকাতার এক সুরসিক পুরুষ সাংবাদিক ম্যানিলা ভ্রমণে গিয়ে ওখানকার হোটেল-রেস্তোরায় মহিলাঘটিত কাণ্ড কারখানায় তাজ্জব হয়ে ফিরে এসে মন্তব্য করেছিলেন, ম্যানিলা আসলে উয়োম্যানিলা।

কিন্তু কোথায় যেন বিরক্তি ও অতৃপ্তি আসছে সুধাকরের মনে। অনেকদিনের পুরনো কলমটাও ইদানিং আপত্তি জানাচ্ছে—ম্যানিলায় যেতে এই মুহূর্তে তারও যেন প্রবল অনিচ্ছা।

কলম হাতে নিয়েই চোখ বুজলেন সুধাকর নন্দী। মানসচক্ষে তিনি ম্যানিলায় বিচরণ করতে চান। রঙিন পিকচার বুকে তিনি ম্যানিলা শহরের শতাধিক রঙিন চিত্র ইতিপূর্বেই সযত্নে দেখে নিয়েছেন।

চোখ বন্ধ, মনকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নায়ক নায়িকার একটা মানসিক খসড়াও প্রস্তুত। তবু ছবি শুরু হচ্ছে না মনের পর্দায়।

প্রেক্ষাগৃহের ঘন অন্ধকারে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সুধাকর নন্দী। কিন্তু কোথায় যেন কী গোলমাল হয়ে গিয়েছে, ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে না।

মনের বোতামটা এবার বেশ জোর করে টিপলেন সুধাকর। কিন্তু কোথায় ম্যানিলা অথবা উয়োম্যানিলা ?

হোটেল, সুইমিং পুল, স্নানরতা স্বল্পবসনা সুন্দরী কিছুই মানসপটে ভেসে উঠছে না, তার বদলে এই ছুতোরপাড়া, ধোপাপাড়ার কয়েকটা ছবি বিনা অনুমতিতে 'প্রবেশ নিষেধ' নির্দেশ অমান্য করছে।

আরও জোরে মনের অদৃশ্য বোতাম টিপলেন সুধাকর নন্দী। কিন্তু উল্টো ফল হলো। এই গ্ল্যামারবিহীন ছুতোরপাড়া ধোপাপাড়া যেন ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড-হোয়াইট ছায়াছবির মতন অনুভূতির সমস্ত পর্দা অধিকার করছে।

সুধাকর নন্দী চোখ মুছলেন, কিন্তু কোনো ফল হলো না—এবার তিনি সদানন্দ মজুমদারের মুখটা পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন।

অস্পষ্ট থেকে ক্রমশ সুস্পষ্ট হচ্ছেন সদানন্দ মজুমদার—ছায়াছবির ফেড-ইন-এর মতন।

সুধাকর দেখতে পাচ্ছেন, একটা বাইসাইকেলে চড়ে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড থেকে পশ্চিম দিকে মোড় ফিরে ছুতোরপাড়ার সরু রাস্তা ধরে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে আসছেন চুয়ান্ন বছরের সদানন্দ মজুমদার। মুখের দাড়িটা যেন আজ সকালে সযত্নে কামানো হয়নি। হলুদ রঙের পাঞ্জাবিটাও ঝকঝকে পরিষ্কার নয়।

সুধাকর বলছেন, "সদানন্দবাবু, এখন আপনি নন। এখন আমি আগামী প্রমোদ উপন্যাসটার রোমাঞ্চকর দৃশ্যগুলো মনের পর্দায় একের পর এক দেখে নিতে চাই।"

কিন্তু সদানন্দর কানে ওসব কথা যেন পৌঁছচ্ছে না—সদানন্দ আপনমনে সাইকেল চালিয়ে লেখকের আরও কাছে এগিয়ে আসছেন।

"প্লিজ, সদানন্দবাবু! আপনি আমার প্রতিবেশী, আপনাকে আমি কখনও এড়িয়ে যাইনি, কিন্তু এখন এইভাবে আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না। আমার অবস্থাটা বুঝুন। আমাকে একটা প্রমোদ উপন্যাস লিখতেই হবে—বাংলা সাহিত্যের ভূগোল আরও বিস্তৃত হবে, কারণ এখনও

পর্যন্ত কোনো আধুনিক লেখক বাংলায় ম্যানিলার পটভূমিকায় মিষ্টি উপন্যাস লেখেনি। এইসময় আপনি কেন পর্দায় ভেসে উঠে আমাকে ডিস্টার্ব করছেন ?"

"সদানন্দবাবু! প্লিজ! আপনি সাইকেল পেডালিং বন্ধ করুন আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করলেও আমার উপন্যাসে চরিত্র হিসেবে আপনি কোনো কাজে আসবেন না।

সদানন্দবাবু "আপনি একজন অর্ডিনারি লোক। ওগিলভি কোম্পানির বাঁধা মাইনের ওয়ার্কার। আপনি তিরিশবছর কর্মজীবন পূর্ণ করেছেন, সেই উপলক্ষে আপিসের খুদে সায়েবরা আপনাকে মিষ্টি কথা বলেছে, আর আপনার জামাই সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং-এর শ্রমিক ছুট করে টি-ভি কিনেছে বলে আপনি একখানা বাংলা উপন্যাসের চরিত্র হতে পারেন না।

"অপ্রিয় হলেও কথাটায় কোনো মিথ্যা নেই, সদানন্দবাবু। আপনি সমস্তজীবনে কোনো নাটকীয় কাজ করেননি—ইস্কুলে গিয়েছেন সাধারণভাবে, চাকরি যোগাড় করেছেন সাধারণভাবে, বিয়ে করেছেন সাধারণভাবে, মেয়ে এবং ছেলেকে মানুষ করেছেন সাধারণ-ভাবে। যতবড় লেখকই হোক,আপনার এই সাধারণ জীবন নিয়ে কেউ উপন্যাস লেখার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না।

"সদানন্দবাবু, আপনি তবুও আমার মনের পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছেন না। আপনি সাইকেলের বেলটা বাজিয়ে এখনও এগিয়ে আসছেন আমার বাড়ির দিকে।

"সদানন্দবাবু, আবার বলছি আমার গল্প-উপন্যাসে ঢুকবার কোনো সম্ভাবনা নেই আপনার।

"আপনি হয়তো ভাবছেন, আপনার জীবনেও নাটক আছে। এই যখন আপনার মেয়ে অনেক আদর করে যার পোষাকী নাম রেখেছিলেন বিমলা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি কিছুই ভুলিনি। বিমলার ডাক নাম যে মনোরমা এবং আপনারা সবাই যে আদর করে

তাকে মন্নু বলে ডাকেন সব আমার খেয়ালের মধ্যে আছে। তবে ওসব কথা আমি নোটবইতে খুঁটিয়ে লিখিনি এই জন্যে যে, ওসব ডিটেল কোনোদিন আমি কোনো বইতে কাজে লাগাতে পারবো না।

"সদানন্দাবাবু, প্লিজ এই সময়ে এইভাবে আমার মনোসংযোগ নষ্ট করবেন না।

"আপনি বলতে চাইছেন, একসময় মন্নুর জন্যে ভেবে-ভেবে কয়েক রাত আপনার ঘুম হয়নি। তখন আপনার আশঙ্কা ছিল কখন কী হয়ে যায়। শ্বশুরবাড়িতে আপনার আদরের মন্নু অসুখী, সে যেন জেলখানায় রয়েছে, সে পরিবারের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সে কখন খেতে পাচ্ছে সে-খবরও শাশুড়ি বা ননদ নিচ্ছেন না।

"সদানন্দবাবু, আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যেদিন শুনলেন মন্নু সকালে জলখাবার পায়নি, অথচ আপনার মন্নু বাপের বাড়িতে চিরকাল সকালে জলখাবার খেয়ে এসেছে। তফাতের মধ্যে, বিয়ের আগে আপনার স্ত্রী অথবা আপনি নিজে জলখাবার নিয়ে তাতে সাধাসাধি করতেন এবং আপনার মন্নু বলতো, খেতে ইচ্ছে করছে না, এখন বিয়ের পর আপনার মন্নুর খেতে ইচ্ছে করছে, অথচ শ্বশুরবাড়ির কেউ বলছে না, বউমা জলখাবার খাও।

"আমি আপনার মুখের ভাবখানা দেখছি সদানন্দবাবু। আপনি বলতে চাইছেন, মেয়ের বাবা-মা এতে দুশ্চিন্তায় পড়বেন না তো কিসে পড়বেন?

"আপনার ধারণা, মস্ত নাটকীয় ব্যাপার এটা এবং সেইমতো আপনি সারারাত ভেবে-ভেবে শেষপর্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন।

"আপনার স্ত্রী আপনাকে বলেছিলেন, মেয়েদের সইতে দিতে হয়। তোমাদের সংসারে এসেও কি আমার প্রথম প্রথম কষ্ট হয়নি? আমারও কি কখনও খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করেনি। কিন্তু ঘোমটার আড়ালে সব কষ্ট লুকনো থাকতো—সয়েছি, তাই রয়েছি।

"আপনি একমত হননি স্ত্রীর সঙ্গে। আপনি বেশ উত্তেজিত হয়ে

একটু চড়া নিয়ে বলেছিলেন, ওসব সেকালের কথা। এরা একালের মেয়ে—এযুগে এসব অত্যাচার চলে না।

"আপনার স্ত্রী তবু বলেছিলেন, এয়োস্ত্রী মেয়ের পক্ষে সময়মতন জলখাবারটা পাওয়াটাই সব নয়। সব চেয়ে দামি হলো স্বামীর ভালবাসা, এরপর সংসারের ভালবাসা। আমার যখন কষ্ট হয়েছে, তখন তুমি লুকিয়ে একবার দুলালের সন্দেশ এনে আমার মুখে পুরে দেবার চেষ্টা করেছিলে। আমার আনন্দ হয়েছিল খুব, কিন্তু খাইনি এই ভয়ে যে, আমি খেলে ব্যাপারটা খারাপ হয়ে যায়। জানাজানি হলে জিনিসটা অনেকদূর গড়াবে। অর্থাৎ আমি একই সঙ্গে খুব খুশি হলাম, অথচ রাগ দেখলাম। তুমি যদি আমার খিদের কথা ভেবে সন্দেশটা লুকিয়ে না আনতে তাহলেও আমার ভীষণ দুঃখ থেকে যেতো।

"সদানন্দবাবু, প্লিজ। লুকিয়ে বউকে দু'চারবার চুম্বন করলো, কেউ দেখে ফেললো, সকালবেলায় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নিয়ে কথা উঠলো, এসব তবুও গল্পে ঢুকতে পারে, কিন্তু আপনি যা সব বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন তা এখনকার কোনো লেখকই কান দিয়ে শুনবেন না।

"প্লিজ, আপনি আমাকে জ্বালাতন করবেন না, আমি এখন ম্যানিলা হোটেলে স্পেশাল 'সনা' বাথ-এর বর্ণনা সংগ্রহ করছি। এই স্নান-বিলাস সম্পর্কে এ-দেশের মানুষের তেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই—কৌতূহলে সুড়সুড়ি পড়লেই তারা আমার বইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। পৃথিবীর সব দেশের পাঠকই নিষিদ্ধ ফল সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী।

"আপনি এখনও সন্তুষ্ট হচ্ছেন না সদানন্দবাবু? আপনি এখনও বিমলা ওরফে মনোরমা ওরফে মনুর সংসার সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইছেন।

"ভাবছেন, আমার ধৈর্য নেই! অশেষ ধৈর্য না থাকলে বাংলা উপন্যাসের লেখক হওয়া যায় না, সদানন্দবাবু।

"সদানন্দবাবু, আপনার পরবর্তী বক্তব্য আমার কাছে পরিষ্কার—আপনি অনেক ভেবে, বহুরাত জেগে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন

মন্নুকে ও তার স্বামীকে যৌথ পরিবার থেকে আলাদা করে দেবেন। দুষ্টরা বলবে, আপনি ঘর ভাঙলেন, কিন্তু আপনি জানেন, আপনি ঘরবাড়ি কিছুই ভাঙেননি, স্রেফ লোহার রুদ্ধদ্বার খুলে বন্দীশালা থেকে নিজের মেয়েকে বার করে এনেছেন।

"এবং তারপর থেকে তারা সুখী—আপনার মেয়ের সোনার সংসার হয়েছে, তার বাড়িতে আনন্দ উছলে উঠছে। টি-ভি এসেছে, জামাই মনের আনন্দে সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কোম্পানিতে ওভারটাইম করছে।

"সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কোম্পানি আপনার ওগিলভি কোম্পানির মতন হাড়কিপ্টে নয়—সেখানে শ্রমিকের দাবিদাওয়া অনেক সহজে আদায় হয়। আর আপনি তো পিতা, যদি পুত্রস্থানীয় কেউ আপনার থেকে বেশি রোজগার করে, আপনি তো খুশি হবেনই। শিষ্যের কাছে, পুত্রের কাছে, জামায়ের কাছে বিদ্যায় অথবা বিত্তে পরাভূত হতে ভারতবর্ষের কোনো বাবা-মা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

"তাহলেও ওই 'সনা' বাথ এবং সেই সঙ্গে সুইডিশ মাসাজ সম্পর্কে আমাকে একটু বিস্তারিত জানতে দিন সদানন্দবাবু।

"আমি অনেক কষ্টে বিদেশ থেকে একখানা মহামূল্যবান বই আনিয়েছি—'নাইটলাইফ ইন গ্রেট সিটিজ'। বিখ্যাত নগরীতে রাত্রিসুখ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লেখা হয়েছে গবেষক ও সমীক্ষকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তি থেকে।

"এই বই সোজাপথে কখনও এদেশে আসতো না—কাস্টমসের লোকরাই জাহাজ থেকে নামামাত্র হজম করতো। এই বই আমি আনিয়েছি এক দর্শনের অধ্যাপকের ব্যক্তিগত ব্যাগেজের মাধ্যমে।

"মোটা কাঁচের চশমার আড়ালে ঢুলু-ঢুলু দার্শনিক চোখ দেখে এয়ারপোর্টের কাস্টমস্-দিদিমণির সাধ্য কি আন্দাজ করেন, প্যাসেঞ্জার এমন রগরগে বই এদেশে নিয়ে আসছেন!

"সরকারী দাদা-দিদিমণির ছাপানো কাগজ সম্পর্কে অতো মাথা-

ব্যথাও নেই। তাঁরা সোনা, হিরে, জহরৎ, গাঁজা আফিম, এল এস ডি, ব্রাউন সুগারের দুঃস্বপ্নেই বেসামাল—কে কোন বই নিয়ে এলো, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

"অথচ এই একখানা ইংরেজী বই থেকেই আমি কতগুলো বাংলা বই একের পর এক লিখে যাবো। এক একটা শহর নিয়ে এক একটা প্রমোদপর্ব। লোকে আমার প্রাণবন্ত বর্ণনা পড়ে মুগ্ধ হবে—তারা ধরেই নেবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, দীর্ঘদিনের সাধনায় আমি একের পর এক দুর্দান্ত উপন্যাস উপহার দিচ্ছি।

"আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, কাস্টমসের দাদা-দিদিমণিরা এখন থেকে আরও সজাগ হোন। আরও ভাল করে তাঁরা ব্যাগেজ সার্চ করুন—কারণ, এই বইয়ের আর কোনো কপি যদি অন্য কোনো রাইটারের হাতে পড়ে যায় তাহলে আমার খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।"

সাহিত্যিক সুধাকর নন্দী তাঁর নোটবইতে লিখে চলেছেন: আজে-বাজে ভাবতে-ভাবতে আমার একটু ঢুলুনির মতন এসেছিল। কোন সময়ে চোখের পাতা বুজে বোধহয় একটু ঘুমিয়েও নিয়েছি। এই সময় আমার বাড়ির কড়া নেড়ে খোদ সদানন্দ মজুমদার গৃহস্বামীর সামনে উপস্থিত হলেন।

ভদ্রলোককে দেখে আমার একটু লজ্জা-লজ্জা লাগলো। লেখার ঘোরে আমি কত আজে-বাজে কথা এঁর সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেছি আমার নোট বইতে। ভদ্রলোক যদি সেইসব মন্তব্য আমার স্বহস্তলিখিত খাতায় দেখেন তাহলে সত্যিই লজ্জার শেষ থাকবে না।

"আসুন, আসুন, সদানন্দবাবু।"

সদানন্দবাবুকে স্বাগতম জানাবার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে আমার। তিনি আমার ভদ্র প্রতিবেশী। এই অসুখী পৃথিবীতেও মোটামুটি সুখে

রয়েছেন বলে বিশ্বাস করেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি সদানন্দকে ইঙ্গিত দিয়েছি, "আমি আপনাকে রেসপেক্ট করি।"

সম্মান করবো না কেন বলুন? সদানন্দ সামান্য কাজ করেন বটে, কিন্তু নিজের কাজ সম্পর্কে তাঁর গর্ববোধ আছে। কারখানার কালচারে থেকেও তিনি মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হননি।

সেই কবে কোন সুধাংশুবাবু স্যরের কাছে কী পড়েছিলেন তার প্রতিটি কথা সদানন্দ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেছেন।

সুধাংশুবাবু স্যর ছোট বয়সেই বিবেকানন্দের খপ্পরে পড়েছিলেন। সন্ন্যাস নিয়ে নিজে আশ্রমে যাননি। কিন্তু আশ্রমটাই তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল। সংসারে থেকেও কেউ-কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যান, কামিনী-কাঞ্চন কিছুই তাঁদের আকর্ষণ করতে পারে না। সুধাংশুবাবু নিশ্চয়ই তাঁদের একজন ছিলেন।

এই সংসার-সন্ন্যাস বোধহয় সাধারণ সন্ন্যাস থেকেও কঠিন। কারণ গেরুয়া কাপড়ের মাহাত্ম্যে যে সব সমস্যা দূরে সরিয়ে রাখা নিতান্ত সহজ, সাদা ধুতি পরে তা এড়িয়ে যাওয়া খুবই কঠিন।

সুধাংশুবাবু স্যরের সেরা ছাত্ররা জজ হয়েছে, ডাক্তার হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছে— কারখানার অর্ডিনারি শ্রমিক সদানন্দ মজুমদার নিশ্চয়ই তাঁর একনম্বর ছাত্র নন। তবু সদানন্দ তাঁকে এই এতো বছর ধরে মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে সযত্নে রেখে দিয়েছেন।

সদানন্দ মজুমদারকে সমীহ করার আরও হাজার যুক্তি রয়েছে। দুনিয়ার জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিমানরা দয়া করে এই ছুতোরপাড়া লেনে এসে নিজের চোখে দেখুন, একজন গৃহস্থ মানুষ সত্যিই নিজেকে সুখী মনে করছেন। ঈশ্বরের সঞ্চয়ে আরও অনেক কিছু আছে মনে করছেন না তিনি। তিনি শুধু বলছেন, যা দিয়েছো সেইটুকু অন্তত রেখো ঠাকুর। দিয়ে ফিরিয়ে নিলে কষ্ট অনেক বেশি হয় প্রভু। পেয়ে হারানোর জ্বালা একমাত্র সেই বোঝে, যে ওই দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়েছে।

আসলে, আমি দেখছি, যারা কম পায় অনেক সময় তাদের সুখ বেশি। আমার যেসব চরিত্র অনেক পেয়েছে, যারা প্রাচুর্যের মধ্যে, ভোগের মধ্যে সারাক্ষণ ডুবে থেকেছে, যাদের আমি প্রখ্যাত বিমান কোম্পানির প্রথম শ্রেণীতে ভেনিসে, লণ্ডনে, পারিতে, নিউইয়র্কে পাঠিয়েছি, তাদের শেষপর্যন্ত আমি সুখ দিতে পারিনি।

সুখ বোধহয় ভীষণ খেয়ালি—কখন কাউকে গাছে চড়িয়ে দেয়, কখন কাউকে ডুবিয়ে দেয় অকারণে, তার কোনো নিয়মকানুন নেই।

ভোগ আসলে নুনের মতো, ওই সদানন্দই একবার সুধাংশুবাবুর কাছে শুনেছিলেন। পরিমাণে খুব কম হলে আলুনি, বেশি হলে পোড়া, মুখেই তোলা যায় না।

সদানন্দ মানুষটি সোজা, মনের সুখ অথবা দুঃখ, আনন্দ বা বিরক্তি কোনোটাকেই চেপে রেখে কথা বলেন না।

এই রকম চরিত্রই লেখকদের পক্ষে ভাল। এক একটা মানুষ থাকে যাদের তল পাওয়া দায়. তাদের মনে কী রয়েছে তা মুখ দেখে অথবা কথা শুনে বোঝা যায় না।

এক একটা চরিত্র এমন জাঁহাবাজ যে অকারণে আপনাকে বিপথে চালিয়েই তাদের নিষ্কাম আনন্দ। তারা যদি উত্তরে যায় তো বলবে দক্ষিণটা একটু ঘুরে আসি। এদের মুখে যখন ভালবাসার মিষ্টি হাসি তখন মনের মধ্যে বিদ্বেষের বিষ। এই সব মানুষকে গল্পের ক্যারাক্টার করার অনেক ঝুঁকি—এবং আপনার অন্য চরিত্রগুলোকেও এরা খারাপ করে দিতে পারে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

সদানন্দ মজুমদারের মুখে কিন্তু আজ তেমন হাসি নেই।

এ রকম তো হবার কথা নয়। সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও তিক্ততা মানুষটার হাসি তো কখনও নষ্ট করতে পারেনি। আমি নিজের ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দিয়ে ওঁর খোঁজ খবর করেছি।

সদানন্দ একটু অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলেন, আমি কী করে বুঝলাম তাঁর মনে চিন্তা আছে?

আমি বলতে পারতাম, আপনার মুখের আয়নাতেই প্রতিনিয়ত আপনার মন প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু তার বদলে, আমি একটু রহস্যময় হাসি হাসলাম, আর বেচারা সদানন্দ মজুমদার ধরে নিলেন, লেখকদের তৃতীয় নয়ন থাকে। যে সব ঘটনা অন্যদের নজর এড়িয়ে যায় তাও লেখকদের দৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ে যায়।

আমি বললাম, ব্যাপারটা মোটেই ঠিক তা নয়, একান্তই বাড়ানো। যিনি গল্প লেখেন তাঁরও স্রেফ এক জোড়া চোখ ও এক জোড়া কান থাকে। তবে প্রয়োজনের তাগিদে তিনি চোখ ও কানকে ওভারটাইম খাটান, তাই মাঝে-মাঝে বাড়তি কিছু নজরে এসে যায়।

♣

সদানন্দর ব্যাপারটা যা জানা গেলো, সকালবেলাতেও তিনি খুব খুশি মনে ছিলেন। যথাসময়ে যখন সাইকেল বার করছেন তখন গৃহিণী বলেছিলেন, কিছু খেয়ে যাও।

সদানন্দ মনোরমার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তার ইচ্ছেতেই আজ একটু হাতে সময় নিয়ে বেরোচ্ছেন। মনু আজ মোহনভোগ করবে সকালে।

মনুর ইচ্ছে, বাবা এই মোহনভোগের জলখাবার খেয়েই আপিসে যাক। মনু বলেছিল, সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং সমবায় ভাণ্ডারে কমদামে খুব ভাল ঘি দিয়েছে, বাবা।

"মাসের শেষে ঘি!" সদানন্দ একটু চিন্তায় পড়েছিলেন। শশধরের জামায়ের মতন তাঁর জামায়ের তো ঘুষের কোনো রোজগার নেই।

এই কথা তো মুখ খুলে মনুকে জিজ্ঞেস করা যায় না, এই সময় খাঁটি ঘিয়ের পয়সা কোথা থেকে আসছে?

কিন্তু নিজের মেয়ের ব্যাপারে সাবধান হওয়াও তো প্রয়োজন। মনোরমা বলেছিল, "বাবা তুমি কিছুই খোঁজখবর রাখো না। ওগিলভি

কোম্পানি তোমাদের ঠকায় বলে ধরে নিও না দুনিয়ার সব কোম্পানিই ওয়ার্কারদের ঠকাচ্ছে। ওদের ওখানে নেতা নকুড় সেন আছেন। গেটমিটিঙে বলেই দিয়েছেন, শ্রমিকের গলা কাটার চেষ্টা যে করবে তার গলাই আগে কাটা পড়বে।”

“এ-সপ্তাহে তোমার জামায়ের অনেক ওভারটাইম হয়েছে।” মনোরমা বাবাকে শুনিয়ে দিয়েছে।

সদানন্দ বলেছেন, “দেখিস, বেশি ওভারটাইম করতে গিয়ে শরীরটা না দুর্বল হয়ে যায়। আমাদের কারখানার গণেন গুঁই তো ওই ওভারটাইমের খপ্পরে পড়ে, আর সময় মতন না খেয়ে গ্যাসট্রিক আলসার ধরালো।”

“তুমিও যেমন!” বাবাকে বকুনি লাগিয়েছে মনোরমা। “ওদের কারখানায় ব্যবস্থাটাই অন্যরকম। ওভারটাইম না থেকেই ওভার-টাইম পাওয়া যায় সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে—যদি তুমি ম্যানেজারের সঙ্গে একটু তর্ক করতে পারো।”

ব্যাপারটায় একটু অস্বস্তি বোধ করলেন সদানন্দ। কিন্তু জামায়ের কর্মজীবনের ব্যাপারে শ্বশুরের নাক গলানো শোভন নয়।

মনোরমা বললো, “ও তো তবুও খুব ভাল, ম্যানেজারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দু-এক ঘণ্টা লিখিয়ে নেয়। অনেকে তো স্রেফ হাঙ্গামা বাধিয়েই ওভারটাইম আদায় করে!”

মনোরমার কাছেই সদানন্দ খবর পেয়েছেন, জামায়ের ও-টির টাকা মেয়ের হাতে আসেনি এখনও। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। ওদের সমবায় ভাণ্ডার খুব ভাল—এখন ঘি নিয়ে পরে দাম দিলেও অসুবিধে নেই। শুধু একটা কাগজে ওয়ার্কারের টিকিট নম্বরটা লিখে সই করে দিতে হয়।

সদানন্দ মনে মনে ভেবেছিলেন, এই সুখের কথাই তো প্রাচীন যুগের মুনিঋষিরা কল্পনা করেছিলেন—যতদিন বেঁচে থাকবে সুখে থাকবে, যত ইচ্ছে ধার করে ঘি খেয়ে যাবে। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

কিন্তু এই রসিকতা মেয়ে-জামায়ের সঙ্গে করা যায় না, হঠাৎ কারও প্রেস্টিজে লেগে-গেলে খুবই বিপদ।

আজ সকালে মোহনভোগের প্রত্যাশা নিয়ে মেয়ের বাড়ির সামনে সাইকেলের বেল বাজালেন সদানন্দ।

মনু সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এলো, কিন্তু মুখে তেমনি হাসি নেই। সাইকেল সমেত বাবাকে ভিতরে আসতে বললো মনোরমা।

জামাইকে দেখতে পাচ্ছেন না সদানন্দ। মনু আঁচলে হাত মুছে বললো, "মোহনভোগ তৈরি করতে একটু দেরি হয়ে গেলো। ছোট এলাচ ও তেজপাতা কিনে না দিয়েই বেরিয়ে গেলো।"

"তুমি কিছু শুনেছো বাবা?" মনু সামান্য চিন্তিত অবস্থায় জিজ্ঞেস করছে।

কী শুনবেন? বিষয়টা কী? কারও কোনো অসুখ-বিসুখ করলো নাকি? না দিল্লির কোনো খবরাখবর জিজ্ঞেস করছে মনু?

দিল্লীর রাজনৈতিক খবরের ব্যাপারে জগদীশের কৌতূহল, সেই রোগটা মনুকেও ধরেছে। কোন মন্ত্রী কতদিন থাকছেন, কোনো মন্ত্রী সত্যিই ঘুষ খেয়েছেন কিনা, খেলে টাকাটা পৃথিবীর কোথায় কোন ব্যাংকে গচ্ছিত রেখেছেন এবং কবে তিনি ধরা পড়ে যাবেন, এসব বিষয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ে কী লাভ?

কত মন্ত্রী এদেশে এলো গেলো, কতবার শপথগ্রহণ হলো, আবার পদত্যাগপত্র দাখিল হলো, তাতে ছুতোরপাড়ার মানুষদের কিছু আসে যায় না। এতে চালের দামও সস্তা হয় না, কারখানায় মাইনেও বাড়ে না। কিন্তু রাজনীতির উত্থান-পতন সম্পর্কে জগদীশের ধারণা অন্যরকম।

মনুকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন সদানন্দ, তিনি খরচ কমানোর জন্যে দৈনিক খবরের কাগজ কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন।

কোন দূর দেশে কী হচ্ছে তা জানবার জন্যে, কড়কড়ে অতগুলো টাকা খরচ করার মানে হয় না। তেমন কিছু থাকলে কারখানায় শশধরই তাকে জানিয়ে দেবে।

শশধরের মেয়ে নিজেই কাগজওয়ালাকে অর্ডার দিয়েছে, দৈনিক কাগজ, সাপ্তাহিক কাগজ, মাসিক কাগজ সব বাবাকে দিয়ে আসবে, আর মাসের শেষে টাকা নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে।

সদানন্দ সুযোগ পেয়ে বন্ধুকে বলেছেন, "তোমার মেয়ে বুদ্ধিমতী। তোমাকে সুখটা দিয়েছে, কিন্তু নিজের হাতে জামায়ের টাকা নেওয়ার অস্বস্তি দেয়নি।"

সদানন্দ নিশ্চিত, আজ রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর জীবনে বড় কিছু ঘটেনি—তাঁরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই বহাল তবিয়ত আছেন। তাঁদের মানসম্মানেও কেউ হাত দেয়নি, দিলে বাসস্ট্যাণ্ডের মোড়ে হীরু কাগজওয়ালা দু'চার কপি বিক্রি বাড়ানোর উত্তেজনায় ওখানেই চিৎকার করে ব্যাপারটা সবাইকে জানাতো।

সত্যি কথা বলতে কি, বাসস্ট্যাণ্ডে দু'চার মিনিট দাঁড়িয়ে হীরুর হাঁক শুনলেই কাগজ পড়া হয়ে যায়। কংগ্রেস কম্যুনিস্ট থেকে আরম্ভ করে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল পর্যন্ত সব খবর হেঁকেই সে খরিদ্দার জোগাড় করে। তেমন দরকার হলে রাশিয়া, আমেরিকা, চায়না সম্পর্কেও সে গলা চড়ায়, বুঝিয়ে দেয়, আজকের কাগজ না কিনলে অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

মন্মর মুখ তখনও শুকনো। সে বড়-বড় ব্যাপারের খোঁজ করছে না। তার উদ্বেগ জগদীশ সম্পর্কে।

কারখানায় কিছু একটা ঘটেছে। বাইরে থেকে কে একজন ফিসফিস করে কী খবর দিলো। জগদীশ প্রথমে বললো, "হতেই পারে না।"

তারপর জগদীশ হুস করে বেরিয়ে গেল। সেই যে গিয়েছে,

এখনও ফেরেনি।

খাঁটি ঘিয়ের মোহনভোগ খেতে-খেতে সদানন্দ বললেন, "কী আর হবে। হয়তো কারখানার কোনো সহকর্মীর কোনো সমস্যা হয়েছে, তাই খোঁজ করতে গিয়েছে।"

চিন্তার কিছু নেই, জগদীশের আজ তো আফটারনুন শিফট— বাড়ির অন্ন খেয়ে, একটু বিশ্রাম নিয়ে, সুপুরি মুখে দিয়ে সে কারখানায় যাবে। রাতের খাবারটা ক্যানটিনে সারবে।

মন্নু মাঝে-মাঝে বলে, ফিরে এসে খেতে পারো. সাড়ে-দশটা এমন কিছু রাত নয়।

জগদীশের মতে, "দৈত্যবাড়ি ফলার ছাড়বো কোন দুঃখে। তিরিশ পয়সায় পুরো মিল। কোম্পানির খরচ হয় আট-দশ টাকা। কোম্পানির টাকা বাঁচিয়ে কী লাভ? টাকা তো এমনিতেই জলে ফেলছে ওরা। অফিসারের বাড়িতে বিছানার চাদর, তোয়ালে পর্যন্ত কিনে দিচ্ছে ওরা। অথচ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা কাজ তুলছে তাদেরও যে ঘাম মুছতে তোয়ালে লাগে এই কথা কোম্পানির কানে উঠবে না যতক্ষণ না ইউনিয়ন "ম্যাক" দেবে।"

এই 'ম্যাক' কথাটির ঠিক অর্থ কী তা সদানন্দর পরিষ্কার জানা নেই। কিন্তু নিজের আপিসেও আজকাল কথাটা প্রায়ই শুনছেন। আগে শুনতেন 'টাইট' দেওয়া।

শশধর ব্যাখ্যা করেছে, "টাইটের থেকে ম্যাক কয়েক গ্রেড ওপরে। তোমার হাত চেপে ধরা, আর পেটে খোঁচা মারা কী এক জিনিস? ম্যাকসিমাম হাঙ্গামা থেকে বোধহয় ম্যাক কথাটা এসেছে। প্যাঁদানো, পেটানো এসব কথা রীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু ম্যাক দেওয়া বললে ম্যানেজমেণ্টও কিছু আইনের হৈ-চৈ বাধাতে পারে না।"

মোহনভোগের প্লেট শেষ করে, একটু জল খেয়ে সদানন্দ আরও কিছুক্ষণ জামায়ের জন্যে অপেক্ষা করলেন। জগদীশ তখনও ফিরছে না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সদানন্দ আবার সাইকেলে চড়লেন, মন্নুকে-

প্রতিশ্রুতি দিলেন, আবার খোঁজ নেবেন তিনি।

পথে জামাইকে দেখতে পেলেন সদানন্দ। স্কুটার চড়ে উল্টোদিক থেকে একটু বিভ্রান্ত ভাবেই জগদীশ সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

স্কুটার ও সাইকেল একই সঙ্গে থামলো। উদ্বিগ্ন জগদীশ বললো, "কিছু একটা গোলমাল হয়েছে সুইডিশ কারখানায়। গেট বন্ধ— ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একবার ইউনিয়ন সেক্রেটারির বাড়িটা ঘুরে আসি। তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আপনি ভাববেন না। বড়-বড় কারখানায় ছোটখাটো গোলমাল সবসময় লেগেই আছে।"

ওগিলভি কোম্পানির গেটে কার্ড পাঞ্চ করার সময় শশধরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো সদানন্দর। শশধরের রসিকতা: "তিরিশ বছরের অ্যাওয়ার্ড পেয়ে তোমার পাংচুয়ালিটিতে পাংচার হলো নাকি সদানন্দ?"

"না গো না। মন্টু আজ মোহনভোগের জন্যে বারবার বলেছিল।"

"বেশ আছো। মেয়ের আলাদা সংসার করিয়ে দিয়ে রোজ মোহনভোগ এনজয় করছো!"

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, "সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে কিছু শুনেছো নাকি?"

শশধর বললেন, "অ্যাদ্দিন ইউনিয়ন ম্যাক দিচ্ছিল কোম্পানিকে, এবার খোদ কোম্পানি ম্যাক ফিরিয়ে দিচ্ছে।"

"মানে?"

"মানে আবার কী! সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং-এ লক-আউট। পঞ্চাশ বছরের শান্তিনিকেতন—কখনও কোনো গোলমাল হয়নি বলে খুব বড়াই করে ক'বছর আগে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। এখন ম্যাক খেয়েছে!"

এই ম্যাক কথাটা মোটেই ভাল লাগছে না সদানন্দর। সবাই পেটের দায়ে বাড়ি থেকে কাজ করতে বেরিয়েছে। কাজ করবে, মাইনে পাবে। এতে ম্যাকের কথা ওঠে কেন?

শশধর বললেন, "এই ম্যাক বড় পিক্যুলিয়ার জিনিস, সদানন্দ। যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে! ম্যাক কখনও ফুরিয়ে যায় না।

"আর একটা মজা আছে—দেনাপাওনার খেলা এটা। যত ম্যাক দেবে, অপরপক্ষ তা গুণে গুণে সুদসমেত ফেরত দেবার চেষ্টা করবে। এই ধরো, আমেরিকান জেনারেল ম্যাক আর্থার। জাপানকে প্রচণ্ড ম্যাক দিলো। তার আগে পার্ল হারবারে জাপানীরা ম্যাক দিয়েছিল মার্কিনীদের। ম্যাক আর্থারের ম্যাক ফিরিয়ে দিলেন। আবার এখন জাপানীরা ম্যাক আর্থারের ম্যাক ফিরিয়ে দিচ্ছে কড়ায়-গণ্ডায়। জামায়ের কাছে শুনলাম, নিউ ইয়র্কে-মার্কিনী সায়েবদের ভদ্রাসন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কিনছে জাপানীরা। হামদা-হামদা আমেরিকান সায়েব-মেম জাপানী কর্তাব্যক্তিদের দাসি-বাঁদির কাজ করতে পেরে বর্তে যাচ্ছে।"

লক-আউট! কথাটা কানে বিঁধছে সদানন্দর। সাধাসিধে লোক তিনি। কাজের জায়গায় মানুষ কাজ করবে, মাইনে পাবে। এর মধ্যে আবার স্ট্রাইক, লক-আউট কেন?

কারখানায় সদানন্দ আজ মন দিয়ে কাজ করতে পারলেন না। সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং সম্বন্ধে সব খোঁজখবর হাতের গোড়ায় আসছে না।

শশধর এসব বিষয়ে অনেক চালু। সে ইতিমধ্যে নগেন মহাপাত্র, কমরেড সত্য চাকীর সঙ্গে কথা বলেছে। এমন কি হাজারিকা সায়েবের সঙ্গেও সুযোগ পেয়ে আলোচনা করেছে।

কেউ কিছুই জানেন না তেমন, তবে লক-আউটের বদলে স্ট্রাইক হলে কমরেড চাকী খুশি হতেন। তাঁর ধারণা, মাঝে-মাঝে কোম্পানির চাকা বন্ধ না-হলে মালিকরা টিট হয় না। লাভ খেয়ে-খেয়ে এরা রক্তচোষা মশার মতন ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে ওঠে।

কমরেড চাকী চুপি-চুপি জগদীশকে বলেছেন, "সুইডিশে লক-আউট হয়ে থাকলে এখানকার সায়েবরাও একটু রওয়াব নেবে। বুকের ছাতি ফুলিয়ে একটু স্টাইলে ঘুরে বেড়াবে। দেখবে আমাদের অবস্থাটা কী রকম।"

সদানন্দ ব্যাপারগুলো কখনই ভাল বুঝতেন না। শশধর নিজেও তেমন জানতো না, কিন্তু এখন অনেকের সঙ্গে কথা বলে তার জ্ঞান বেড়ে গিয়েছে।

বন্ধুকে শশধর বোঝালো, "যিনি কৃষ্ণ তিনিই নারায়ণ—তাঁরই আবার অষ্টোত্তরি শতনাম। ব্যাপারটা হলো কিনা, গেট বন্ধ। কিন্তু শ্রমিকরা বন্ধ করলে তার নাম স্ট্রাইক, মালিক বন্ধ করলে তাই হয়ে গেলো লক-আউট। এখন আরও নতুন নতুন রোগ দেখা দিয়েছে—সাসপেনসন অফ ওয়ার্ক, ক্লোজার।"

"সেগুলো আবার কী?" উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন সদানন্দ।

শশধর বললো, "যেমন দু'দিনের জ্বর হলে ফিভার, সাতদিনের জ্বর হলে রেমিট্যাণ্ট ফিভার, দু'সপ্তাহের জ্বর হলে টাইফয়েড, তেমন মালিক আজকাল দীর্ঘমেয়াদি দুষ্টুমি করে ক্লোজার ডাকে, আমি লেবার ডিপার্টমেন্টের মল্লিকের কাছে জেনে এলাম।"

ক্লোজার মানে তো বন্ধ! উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন সদানন্দ। শশধর বললেন, "এতো বছর তুমি-আমি কারখানায় কাজ করছি অতশত খোঁজ করিনি। এখন দিনকালই আলাদা।"

ছুটির পর এক মুহূর্তও বিলম্ব করেননি সদানন্দ। সোজা সাইকেল চালিয়ে ধোপাপাড়ায় মেয়ের বাড়িতে হাজির হয়েছেন।

সৌভাগ্যক্রমে মনু ও জগদীশকে একসঙ্গেই পাওয়া গেলো। দু'জনে বসেই একমনে টি-ভি দেখছে। যাক, তাহলে ততোটা উদ্বেগের কিছু নেই।

জগদীশের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়া গেলো। জগদীশ শান্তস্বভাবের ছেলে। কারখানায় যেসব সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায়,

তা অবশ্যই ঝট করে নিয়ে নেয়, কিন্তু বড় কোনো হাঙ্গামায় থাকে না।

গতকাল রাত দশটা পর্যন্ত কারখানায় ডিউটি করেছিল জগদীশ। কিছুই বুঝতে পারেনি। আজ ভোরে কখনও ব্যাপারটা ঘটেছে।

কোম্পানি কখন রাতের অন্ধকারে নোটিশ লটকে দিয়েছে বোঝা যায়নি। গেট বন্ধ।

সকালের শিফটে কাজে ঢুকতে গিয়ে শ্রমিকরা ধাক্কা খেয়েছে। তারাও প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। কেউ কেউ তখনই ছুটেছে জনপ্রিয় নেতা নকুড় সেনের বাড়ি। সংগ্রামী নকুড়বাবুকে প্রথমে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। তিনি আবার পার্টি মিটিং করতে গতরাতে উলুবেড়িয়াতে গিয়েছেন, ওখানেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা।

সদানন্দ আশ্বস্ত হলেন, নকুড়বাবু ফিরে এসেছেন বিকেলের দিকে। কর্মীদের আশ্বাস দিয়েছেন, কোনো চিন্তা নেই, "এখনই আমি কড়া বিবৃতি দিচ্ছি। ম্যানেজমেন্টের মুখোশ খুলে নিতে সংগ্রামী শ্রমিকদের একদিনের বেশি সময় লাগবে না। দয়া করে সবাই যেন নিয়মিত দলের মুখপত্র দৈনিক সঙ্ঘবদ্ধ পাঠ করেন।

ব্যাপারটা আসলে কী হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট হচ্ছে না সদানন্দর কাছে। জগদীশও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। মনে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট কোনো কারণে শ্রমিকদের সম্পর্কে বিরক্ত হয়েছে।

নকুড়বাবুর সঙ্গে জি-এম সরস চাটুজ্যের সম্পর্ক এখনও মধুর হয়ে ওঠেনি। আগেকার দিনে জি এম ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় দামী ইণ্ডিয়া কিং সিগারেট এগিয়ে দিতেন নকুড়বাবুর দিকে। গত কয়েকদিন ধরে ম্যানেজমেন্ট অতি সস্তা ব্রাণ্ডের সিগারেট এগিয়ে দিয়েছেন নেতাদের দিকে। এর থেকেই নকুড়বাবু আন্দাজ করেছিলেন, কিছু একটা দুষ্টুমির মতলব ম্যানেজমেন্টের মাথায় আসছে। "শ্রমিক-স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারলে, আজকালকার ম্যানেজাররা আর কিছুই চায় না।"

নকুড়বাবু দুঃখ করলেন, "ঘরের শত্রুরাই বড় শত্রু হয়। খোদ

সায়েবরা এই রকম নীচ মনোবৃত্তির ছিল না। এই চাটুজ্যের বাপ ছিল কারখানার মাস মাইনের শ্রমিক, তাই শ্রমিকদের ওপর তার হম্বিতম্বি বেশি হবেই। শ্রমিকরা দুটো পয়সা পেলে গরীবের সাকসেশ-ফুল ছেলেদের বুকে অম্লশূল হয়।”

জগদীশ নিজেই বললো, “ভাববেন না বাবা। কমরেড নকুড় চাটুজ্যে বলেছেন—নিশ্চিন্তমনে বাড়িতে গিয়ে সপরিবারে লুডো খেলো। কালই কোম্পানি ধাপ-ধাপ করে গেট খুলবে। দুটো ইউনিয়ন মিলে আমরা এখনই সংগ্রাম কমিটি গঠন করছি।”

“তাই যেন হয়!”

মন্নু শুনলো না। বাবার জন্যে পরোটা ভেজে আনলো। খাঁটি ঘিয়ের গন্ধে চারদিক ভুরভুর করছে।

আজ সকালেও মেয়েকে সদানন্দ বলেছেন, “বুঝেসুঝে খরচ করবি, খাঁটি ঘিয়ের অনেক দাম।”

কিন্তু আজ বিকেলে খরচের কথা তুলতেই সাহস পেলেন না সদানন্দ। হঠাৎ যেন জিভ জড়িয়ে গেলো।

দ্রুত সাইকেল চালিয়ে সদানন্দ ছুতোরপাড়ায় নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছেন। সাইকেলখানা ঘরে তুলে রেখে, চোখে-মুখে একটু জল দিয়েই চলে এসেছেন সাহিত্যিক সুধাকর নন্দীর বাড়িতে।

সুধাকর নন্দী ক'দিন আগে কেরোসিনের অভাবের কথা বলে-ছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন কোথায় লাইন দিতে হয়?

সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠেছিলেন, “আপনার মতন মানুষকে কেরোসিন তেলের টিন হাতে লাইনে দাঁড়াতে হলে সমস্ত পাড়ার মুখে চুনকালি পড়বে। আপনারা শুধু মানুষের এবং সমাজের মঙ্গলের কথা ভাববেন, লাইন দেওয়া আপনাদের কাজ নয়।

সুধাকর লজ্জা পেয়ে বলেছিলেন, “বিলেতে লেখকদের রান্না-বান্নাও করতে হয়।”

সদানন্দ মুখের ওপর বলেছিলেন, “এটা বিলেত নয়, এটা ইণ্ডিয়ার ছুতোরপাড়া। আমরা থাকতে আপনার কেরোসিন তেলের অভাব হবে না—যত ইচ্ছে জনতা স্টোভ এবং হ্যারিকেন জ্বালান আপনি।”

এর পর নিজেই তেল এনে দিয়েছেন সদানন্দ। বলেছেন, “আমরা কয়লার উনুন জ্বালাই—জনতা স্টোভের পাট নেই। হ্যারিকেন আছে, কিন্তু লোডশেডিং হলে চুপচাপ অন্ধকারে বসে থাকি। আমাদের তো আপনার মতন লেখাপড়ার দুশ্চিন্তা নেই। তাই তেল না-হলেও আমরা হোঁচট খাবো না।”

সদানন্দ মজুমদারকে নিজের ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে দিলেন সুধাকর নন্দী। “জনতা স্টোভ বেশি জ্বালাই না—একেবারেই বেশি জল গরম করে কাজ সেরে নিই।”

এর পর সদানন্দ বললেন, “এ-পাড়ার সবচেয়ে পণ্ডিত মানুষ আপনি। কত মোটামোটা ইংরিজি বই পড়েন! আপনি নিশ্চয় সব জানেন।”

সুধাকর একবার ভাবলেন বললেন, “সব জানলে তো ভাল হতো! কিন্তু এই জটিল দুনিয়ার প্রায় কিছুই জানা হলো না।”

কিন্তু সদানন্দ মানুষটি সরল—সাহিত্যিক যে সর্বজ্ঞ নন তা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। অকারণে পাঠকের মোহমায়া ভেঙে দিয়েও বা কী লাভ?

সাহিত্যিকের ত্রিনয়নে সব কিছুই ধরা পড়ে যায় এমন বিশ্বাস কিছু পাঠকের মনে থাকলে মন্দ কী? যে-দিন এই মোহ সম্পূর্ণ ভঙ্গ হবে সেদিন মানুষ কষ্ট করে উপন্যাস পড়া ছেড়ে দেবে—সোফাতে শরীর এলিয়ে দিয়ে টেলিভিশন নামক ইডিয়ট বক্সের সামনে জড়ভরত হয়ে বসে থাকা ছাড়া তখন সাধারণ মানুষের আর কোনো কাজ থাকবে না।

এর পর সুধাকর নন্দী তাঁর নোট বইতে লিখেছেন: সর্বজ্ঞর ভূমিকায় নিজেকে অধিষ্ঠিত করে সবিনয়ে জানতে চাইলাম সদানন্দ মজুমদার আমার কাছে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করেন?

সাদনন্দ আমাকে কোনো দার্শনিক প্রশ্নবাণে আহত করলেন না। কেবল জানতে চাইলেন, "লক-আউটের সঙ্গে ক্লোজারের কী তফাত।"

আমি বললাম, "রোগীর যতক্ষণ বাঁচবার আশা আছে ততক্ষণ লক-আউট; আর মালিক যখন আশা ছেড়ে ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে উদগ্রীব তখন ক্লোজার।"

সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক-এর গভীর অর্থ আমার জানা নেই। আমি বললাম, "শ্রমিকদের কল্যাণে হুড়মুড় করে অনেকগুলো ইংরিজি শব্দ কারও অনুমতি না নিয়ে বাংলা ভাষায় ঢুকে গেলো—গো-স্লো, ওয়াইল্ড ক্যাট স্ট্রাইক, স্টে-ইন-স্ট্রাইক, লক-আউট, ক্লোজার, সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক। অন্য দেশ হলে শ্রম সংক্রান্ত সব শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তির অভিধান এতোদিন বাজারে বেরিয়ে যেতো, শ্রমিকদের হাতে-হাতে সেই বই ঘুরতো, মানে বুঝতে কোনো অসুবিধে হতো না।"

সদানন্দকে বললাম, "আমার জানাশোনা বন্ধু আছে—সরল চাটুজ্যে, এক সময় আমার সঙ্গে পড়তো। তার সঙ্গে কলকাতায় দেখা হবে আমার। আমি ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে নিতে পারি।"

ভদ্রলোক যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। "ইনিই তো সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কারখানার হর্তা-কর্তা বিধাতা—নেতারা একেই তো এখন পেঁচা চট্টু বলে ডাকছে। নামে সরল, কিন্তু আসলে নাকি খুব প্যাঁচোয়া।"

সদানন্দ মজুমদার পরের দিন আবার ফিরে এসেছেন সুধাকর নন্দীর কাছে। ভদ্রলোকের মধ্যে অস্থিরতা বেড়েছে। "ছিলাম শান্তিতে, কোথা থেকে যে অশান্তি হাজির হলো।"

"কখনও শান্তি কখনও অশান্তি, এই নিয়ে তো জীবন"—সদানন্দকে সান্ত্বনা দিয়েছেন সুধাকর।

সুধাকর বললেন, "এই আমার জীবনটাই দেখুন না। আগে সাহিত্য সাধনাও ছিল, পাকা চাকরিও ছিল। মাস গেলে মাইনেও ছিল, আবার ভাউচার সই করে লেখার রোজগারও ছিল। তারপর একদিন মনে হলো দু' নৌকায় পা দিয়ে সরস্বতী নদী পেরোনো যায় না। দিলাম চাকরিটা ছেড়ে—সাহিত্যকেই নিজের জিনিস মনে হলো, হাজরে খাতায় সারা জীবন সই করার জন্যে ভগবান আমাকে পৃথিবীতে পাঠাননি এই বিশ্বাসটাই আঁকড়ে রাখলাম।

"মূল্য দিতে হলো। মাস পয়লার মাইনে মানুষকে ভীষণ আয়েশী করে তোলে, উদ্যম উবে যায়, অ্যাডভেঞ্চার চলে যায়।

"তা যা বলছিলাম, সারাক্ষণের সাহিত্যিক হতে গিয়ে আমাকে মূল্য দিতে হয়েছে—আমি কলকাতার বাসা রাখতে পারিনি। লটবহর টেম্পোতে চড়িয়ে কয়েক বছর আগে নদীর পশ্চিম পারে উঠে আসতে হয়েছে। স্ত্রীর পক্ষে কিছুটা অশান্তিও বটে। কিন্তু সব অসুবিধে মেনে নিয়েছি। যা ভাল বলে মনে করা যায় তাতে লেগে থাকতে হলে অশান্তিকে ভয় করা চলে না।"

সদানন্দর কাছে কথাগুলোর বিশেষ অর্থ হলো না। তিনি বলতে চাইছেন, "আপনারা সাহিত্যিক লোক। অশান্তিটা আপনাদের বিলাস—যেমন লোকে শখ করে চিনি-দুধ না মিশিয়ে কালো কফি খায়। আপিসের চাকরিটা আপনি নিজে থেকেই ছেড়ে দিয়েছেন—ওখানে স্ট্রাইকও হয়নি, ধর্মঘটও হয়নি। আর আমার জামাইকে দেখুন না—

হয়তো ম্যানেজারের সঙ্গে একটু ক্যাটক্যাট করে কথা বলে, কিন্তু কাজ তো তুলে দেয়, তবু লক-আউটে পড়ে গেলো।"

সুধাকর নন্দীর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকালেন সদানন্দ আজ সদানন্দ কারখানা থেকে ফেরবার পথে মন্নুর ওখানে গিয়েছিলেন।

মন্নু নিজেই বললো, "তুমি যেন ভেবো না বাবা তোমার জামাই কারখানায় মন দিয়ে কাজ করতো না। সায়েবরা তো ওকে পছন্দ করতো, বলতো মাথা খাটিয়ে কাজ করো, পরে মেশিন অপারেটর থেকে স্টাফ হয়ে যাবে। কিন্তু মুড়ি-মিছরির এক দাম হয়ে গেলো, সিকিউরিটি যখন গেট বন্ধ করলো তখন সবার মুখের ওপরেই গেট বন্ধ করে দিলো।"

এরপর সদানন্দ বলেছিলেন, "দুঃখ করিস না মন্নু। ভিড়ের মধ্যে মানুষের বিচার এইভাবেই হয়—কে ভাল, কে মন্দ, কে মাঝারি তা যাচাই করার অবকাশ থাকে না। মনে লাগে, কিন্তু এই কলকারখানার জগৎটাই এই রকম। সেই সুযোগ নিয়েই তো দু'পক্ষের দুষ্টু লোকেরা যা-ইচ্ছে করে বেড়ায়, আর ভাল মানুষগুলো অযথা কষ্ট পায়।"

সদানন্দ এবার সুধাকর নন্দীকে বললেন, "আমার খুব খারাপ লাগলো। আমার মেয়ের হাতে আজ স্বামীর মাইনে আসার দিন। আমি নিজেও আজ মাইনে পেয়েছি, পকেটের মধ্যে মাইনের খামটা রয়েছে। এমন অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম আপনাকে কী বলবো।

এরপর মেয়ের সঙ্গে বেশি কথা হলো না, জামাই এসে গেলো। সে বললো, "ইউনিয়ন সহজে ছাড়ছে না। নকুড়বাবু ঘোষণা করেছেন, দু' একদিনের মধ্যে কোম্পানিকে দিয়ে বাপ-বাপ করিয়ে গেট খোলাবো। আপনারা ধৈর্য ধরুন, ইউনিয়নের হাত শক্ত করুন। শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ।"

সদানন্দ বললেন, "দেখলাম, ওরা আশা করছে একটা কিছু তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে। বাকি মাইনেও সুড়সুড় করে সকলের হাতে এসে যাবে, গরমেন্ট বলে একটা জিনিস এখনও দেশে আছে।"

সদানন্দ আরও খোঁজ করেছেন ওদের দুটো ইউনিয়নের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে। জগদীশ বলেছে, "একটা সুখবর। দুই ইউনিয়নের একসঙ্গে গোপন মিটিং চলছে—যৌথ সংগ্রাম কমিটি তৈরি হয়ে গিয়েছে, এখন কোম্পানি বুঝবে ঠেলা।"

সদানন্দ তাকালেন সুধাকরের দিকে। "এতো বছর ধরে মাইনের দিনে মাইনে নিয়েছি, কখনও অস্বস্তি হয়নি। অথচ আজ মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বুকের মধ্যে করতে লাগলো।

"বাড়িতে গিন্নি আমার অবস্থা বুঝে বললেন, 'তোমার আবার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। এ-সপ্তাহে না মাইনে পেলে আসছে সপ্তাহে জগদীশ মাইনে পাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখো, জামাই মানুষ বচ করে কত টাকাকড়ি জমানো আছে, ওসব জিজ্ঞেস করে বোসো না।' "

"আজকের খবরের কাগজটা একটু দিন তো।" সুধাকর নন্দী ভাবলেন সদানন্দ দেখবেন জামাইয়ের কারখানা সম্বন্ধে কোনো বিশেষ খবর বেরিয়েছে কিনা।

সদানন্দ কিন্তু খবরের মধ্যেই গেলেন না। অন্য একটা পাতায় কী দেখে এক মিনিটে কাগজ ফিরিয়ে দিলেন।

বললেন, "সত্যিই যাঁরা খবরের কাগজ চালান তাঁরা মস্ত বড় লোক। 'সময়টা কেমন যাবে' কলমে আমার কর্কট রাশিতে লিখছে : 'সন্তানের সুখ সম্পর্কে সাময়িক চিন্তা। সপ্তাহের মাঝামাঝি দুশ্চিন্তার অবসান।' তা হলে বুঝছি ব্যাপারটা মিটে যাচ্ছে?"

মেয়ে মনুর রাশিটাও দেখে নিলেন সদানন্দ—'আজেবাজে খরচ এড়িয়ে চলুন। কফ শ্লেষ্মা সম্পর্কে সাবধান'।

"ঠিক যেন মনুকে উদ্দেশ করেই লিখেছে। আজ যখন এলাম তখন দেখলাম মনুর একটু সর্দি লেগেছে। কাগজের যা দাম হয়েছে রোজ তো কেনা যায় না। মনুটার উচিত ভবানী ফ্রী রিডিং লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রত্যেক দিন সকালে 'শ্রীগুরুর' ভবিষ্যদ্বাণীটা পড়ে আসা।

সে যদি সকালে একটু সাবধান হতো তাহলে নিশ্চয় সর্দি লাগতো না।"

সুধাকরের এসবে বিশ্বাস নেই। তাঁর মতে, দুর্জয় মনোবল ও পুরুষকারই মানুষের বেঁচে থাকবার একমাত্র পথ।

কিন্তু সদানন্দ বললেন, "অনেকেই হয়তো ঠকায়, কিন্তু শ্রীগুরু অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী করেন। বলুন আপনার রাশিটা—মিলিয়ে দিচ্ছি।"

সুধাকরকে বলতে হলো তাঁর রাশি কি। সদানন্দ কাগজে আবার নজর দিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। "উকিল, ফাটকা ব্যবসায়ী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে অপ্রত্যাশিত সুসময়।"

হাসতে গিয়েও হাসা হলো না সুধাকরের। ফাটকা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাহিত্যিককে কাছাকাছি টেনে এনে শ্রীগুরু অবশ্যই রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

সুধাকরের যা বলতে ইচ্ছে করছে, "সদানন্দবাবু, এক সময় পয়সার প্রয়োজনে সাপ্তাহিক কাগজে আমি নিজেও এই কলমটা লিখেছি, স্রেফ কিছু না জেনেই। তবু শত-শত চিঠি আসতো, ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে জানিয়ে। যাই লেখা থাক কিছু মানুষের জীবনে তা ঘটে যেতে বাধ্য।"

কিন্তু এই সময় একজন চিন্তাগ্রস্ত মানুষের বিশ্বাসের ওপর আঘাত হেনে লাভ নেই। তাবিজ, আংটি, বালা, পাথর একটা কিছুর ওপর অসহায় মানুষকে নির্ভর করতেই হবে—তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

সদানন্দকে একই সঙ্গে একটু শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছেন সুধাকর। মানুষ নিজেকে নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত এমন একটা গুজব কথাসাহিত্যের মাধ্যমে আজকাল দিকে-দিকে ছড়ানো হচ্ছে। পশ্চিমের মানুষেরও মনোবৃত্তি সেই দিকে।

কিন্তু এইখানে চোখের সামনে সুধাকর দেখতে পাচ্ছেন সদানন্দর সংসারকে। বিয়ে দিয়ে মেয়েকে পার করলেই তো যথেষ্ট। কে আবার তার সুখ-দুঃখকে প্রতিদিন অনুসরণ করে? এদেশের ছেলেমেয়েরা তাদের পিতৃমাতৃ সৌভাগ্য সম্বন্ধে যদি আরও একটু

অবহিত হতো তাহলে খারাপ হতো না।

সুধাকর একবার ডায়রিতে লিখেছিলেন, "আমার চরিত্ররা আর বিদেশের হোটেলের বার-এ নাইট এবং শোতে ঘুরে বেড়াবে না। আমি লিখবো অবহেলিত এই অঞ্চলের ছোটখাট ভালবাসার কথা। পারিবারিক সম্পর্ক প্রভৃত দুঃখের মধ্যেও কী আশ্চর্যভাবে বেঁচে আছে এই অভাগা দেশে। এদেশের ছেলেমেয়েরা অশেষ সৌভাগ্যবান।"

এর পরেই সুধাকর একটু ফাঁক দিয়ে লিখেছেন—সত্যিই কি সৌভাগ্যবান। সরল—সরল চ্যাটার্জি যে আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে পড়তো এখন নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনায় প্রাইভেট কোম্পানিতে জেনারেল ম্যানেজার হয়েছে. তার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হলো। অনেক কথা হলো সরলের সঙ্গে।

সরল বললো, "বাবা মায়ের অত্যধিক স্নেহই বাঙালী জাতটাকে নষ্ট করছে, সুধাকর। সংসারের প্রশ্রয়ে ভেলভেটের বাক্সে আঙুরের মতন থাকে বলেই বাঙালী ছেলেরা সংসারের বাইরে শক্তি দেখাতে পারছে না। কর্মক্ষেত্রে তারা দুর্বল অপরিণত মানুষের মতন ব্যবহার করে। আর প্রতিযোগিতায় তাদের যে কী শোচনায় হাল হচ্ছে তা তো চোখের সামনেই দেখতেই পাচ্ছো।"

সরল চাটুজ্যে যা করে এবং যা বলে তা প্রচণ্ড মনোবলের সঙ্গেই বলে। অনেকদিন দিল্লির কাছে এক কারখানায় বড় কাজ করে এসেছে সরল।

সে বললো, "পৃথিবীটা যে ক্যাবলাদের ঘ্যানঘ্যানানির জন্যে নয় এই চৈতন্যোদয় হচ্ছে না আমাদের, ফলে আমাদের বিনাশ অনিবার্য।"

"এতো বড় জাতের অগ্রগতি সাময়িক বন্ধ হতে পারে. তার বেশি ক্ষতি হতে পারে না," আমি বলেছিলাম। কিন্তু সরল চাটুজ্যে আমাকে হেসে উড়িয়ে দিলো।

"তুমি সাহিত্যিক মানুষ, ঐ মিথ্যে আশা নিয়েই আঙুল চোষো।

পৃথিবীতে কত জাত, কত জনপদ বাইরের শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে শেষ হয়ে গেলো তার লিস্টি তো বাংলা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় না। সেখানে শুধু সস্তা উত্তেজনা, সস্তা আনন্দ, সস্তা সুখের ইঙ্গিত। সুখী গৃহকোণ থেকে বেরিয়ে কী করে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে নামতে হয়, কী করে সাফল্যকে অপরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হয় তার কোনো ইঙ্গিত নেই। প্রস্তুতি নেই কোথাও। এবং আমি সবচেয়ে দোষ দিই আমাদের বাবা-মাকে। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে যেদিন রাশিয়ায় ট্রেনিং নিতে যাচ্ছি, সেদিন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমার বাবা সারাক্ষণ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ঠাণ্ডা লাগলে আমার টুপিটা যেন কান পর্যন্ত টেনে দিতে না ভুলি। আমি বাজি লড়তে পারি, পৃথিবীর কোনো দেশের বাবা-মা ছেলেমেয়ের জন্যে এইভাবে সারাক্ষণ পুতু পুতু করেন না। তার ফল ভাল হয়নি, সুধাকর। আমরা ভীষণ পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি : আমরা জীবন সংগ্রামের কুরুক্ষেত্রেও পিক্যুলিয়ারলি ব্যবহার করেছি। আমরা এই আদুরে মনোবৃত্তি দিয়ে এখানকার কলকারখানাকেও ধ্বংস করতে বসেছি। ইংরেজরা দেড়শ বছর আগে এখানেই প্রথম কলকারখানা স্থাপন করলো, তবু আজও আমাদের নিজস্ব কোনো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কালচার তৈরি হলো না। চিরনাবালক অথবা চিরনাবালিকা থাকার জন্যেই যেন আমাদের জন্ম।"

♣

সাহিত্যিক সুধাকরের ডাইরি থেকে :

সদানন্দবাবু অনেক আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। জানতে চাইছিলেন, লক-আউট হওয়া সুইডিশ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ভিতরের কোনো খবর আমি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি কিনা।

জামাইয়ের কাজ সম্পর্কে কিছুটা চিন্তিত সদানন্দ বললেন, "এ-সপ্তাহের শেষের দিকে লক-আউট উঠে গেলে তেমন কিছু কষ্ট

হবে না কারও। জগদীশের কারখানার ইউনিয়ন নেতা তো গেট মিটিংয়ে বলেই দিয়েছেন, 'লক-আউট পিরিয়ডের মাইনে আপনাদের ব্যাংকে রাখা হচ্ছে মনে করুন।' ”

সদানন্দ তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে মুখ ভরাবার চেষ্টা করে বললেন, 'নেতারা যা বলেছেন তা সত্যি হলে তো ভালই। কারখানার সমস্ত কর্মীর কয়েকদিন একটু বিশ্রামও হয়ে গেলো, বেপরোয়া আজে-বাজে খরচ সম্পর্কে ভয়ও ধরলো, বিশেষ করে কথায়-কথায় ধার করার সাহসটা বড্ড বেড়ে গিয়েছে।”

এই ধারের ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না। সদানন্দ বললেন, 'অন্য লোকের সমালোচনা কী করে করবো? আমার জগদীশের কথাই ধরুন। আগে টাকা জমিয়ে তারপর টি-ভি কিনলে কী এমন ক্ষতি হতো? আমি তো এতোদিন কাজ করছি, আমি তো এখনও বাড়িতে টি-ভি আনার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। রেডিও জিনিসটা ফেলে দেবার নয়—আকাশবাণীতে সারাক্ষণ কত সুন্দর অনুষ্ঠান হচ্ছে। হ্যাঁ, আমিও টাকা ধার করেছি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি থেকে।”

সদানন্দ মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। “প্রথমবার সমবায় থেকে লোন নিয়েছিলাম মায়ের অসুখের সময়, তা অনেক দিন আগের কথা। ধরুন সে-টাকা কবে শোধ হয়ে গিয়েছে। তারপর মন্নুর বিয়ের সময় আমাকে আবার লোন করতে হয়েছে।”

সদানন্দ বলে চললেন, “আমার হাতে দুটো পাত্র ছিল, দু পক্ষেরই মেয়ে পছন্দ হয়েছিল। বাইরের পাত্রটির দাবি-দাওয়া তেমন ছিল না। আর এই সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কোম্পানির পাত্রটির বাড়ি থেকে দাবি-দাওয়া ছিল। তা আমি ভাবলাম, কোম্পানি ভাল, ছেলে ভাল। কিছু দেনার ভয়ে আমি মেয়েটাকে চোখের সামনে রাখার সুযোগ হাতছাড়া করবো?”

সদানন্দর স্ত্রীও তখন বললেন, “ধার নাও। ধার যে আস্তে আস্তে

কখন শোধ হয়ে যায় বোঝাও যায় না। হাতে মাইনের টাকা আসবে কম, প্রতিবার কিস্তি এবং সুদ কাটা যাবে, তেমনি একজন খাওয়ার লোকও কমে যাবে।”

সদানন্দ বললেন, “মনুর বিয়ের ধারের কিছু বোঝা কমে গিয়েছে। আমি এখনও কিছু ধারের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি—কিন্তু দুনিয়ার সবাই বুঝবে সেটা সখের বোঝা নয়। মেয়েটাকে ভাল জায়গায় দেওয়ার জন্যে যে বোঝা কাঁধে না নিলে নয় সেইটুকু।”

সংসারী সদানন্দবাবুর মনে এমনিই দুশ্চিন্তা অনেক। তাঁর বোঝা আরও ভারি করার কোনো অধিকার নেই আমার। আর তাছাড়া সরকারের স্নেহপ্রশ্রয়ে এদেশের ট্রেড ইউনিয়নও তো শক্তিমান, তারা নিশ্চয় সুইডিশ কারখানায় তাদের সংঘ-শক্তির পরিচয় দেবে। মাইক ভাড়া করে তারা প্রকাশ্যে বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তার সম্পর্কে সন্দেহ ধরিয়ে দেওয়ার আমি কে?

সদানন্দবাবুকে আমি বললাম, “বইতে পড়েছি, মালিকের সঙ্গে পাঞ্জা-লড়াইয়ে নামার আগে ইউনিয়ন অনেকদিন ধরে প্রস্তুতি নেয়। তারা টাকা সংগ্রহ করে, বসে থাকা কর্মীরা যাতে অন্তত খেতে পায় তার ব্যবস্থা করে। আপনি শুধু-শুধু ভাবছেন কেন?”

সদানন্দবাবু উত্তর দিলেন, “ওসব কথা মুখে আনবেন না, সুধাকরবাবু। শশধর ব্যঙ্গ করে বলে, এঁদের সংগ্রাম মানে বক্তৃতা, মিছিল, বড়জোর ইটপাটকেল ছোড়া এবং মারপিট। তারপর হিজ-হিজ হুজ-হুজ। পারিবারিক সাহায্যের ব্যাপারটা আমি ততোটা জানি না। কিন্তু আপনি যখন বইতে পড়েছেন তখন নিশ্চয়ই ওরকম কিছু একটা করে।”

তবে সদানন্দ শুনছেন, সবাই বলছে, লক-আউট উঠলো বলে তখন সদানন্দর সংসার আবার সোনার সংসার হয়ে উঠবে।

সুখের সংসারের স্বপ্ন নিয়েই সদানন্দ আজ বাড়িতে ফিরে যান। আমার সঙ্গে সরল চ্যাটার্জির যে কথাবার্তা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ এখন ওঁর না শোনাই ভাল।

শুনলেই তো চিন্তা। হয়তো নিজের কাছেও কথাগুলো রাখতে পারবেন না। উদ্বেগ লাঘবের জন্য নিশ্চয় চুপি-চুপি গৃহিণীকে বলবেন।

সদানন্দ-গৃহিণী আবার ফিস-ফিস করে মনোরমার কানে তুলবেন। সহধর্মিণী হিসেবে স্বামী জগদীশকে সব কিছু বলার দায়িত্ব অবশ্যই মনোরমার।

তারপর সমস্ত সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কোম্পানির কর্মীদের ব্যাপারটা জানতে বেশীক্ষণ লাগবে না।

আমি সুধাকর নন্দী ওইসব প্রচারের নিমিত্ত হতে চাই না। হাজার হোক সরল চ্যাটার্জি আমার বাল্যবন্ধু। দু'একবার ওর সাফল্যজনক কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু খবরাখবর বন্ধুদের মাধ্যমে কানে এসেছে। দু'একবার মুহূর্তের জন্য দেখা হয়েছে, আমি বিশেষ কথা বলিনি। বলবার বিষয়ও ছিল না। আমি মানুষ নিয়ে গল্প লিখি, আর সরল চ্যাটার্জীর গতিবিধি কর্পোরেট ওয়ার্লডের হিমালয় শিখরে।

সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং-এর লক-আউটটাই আমাকে আগ্রহী করে তুলেছে। আমার কোনো অ্যাকাডেমিক কৌতূহল নেই—এদেশের কত কলকারখানা তো মাসের পর মাস বন্ধ হয়ে আছে, আমি মাথা ঘামাইনি। এখন আমার প্রতিবেশী সদানন্দ এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন। আমিও তাই আগ্রহী হয়ে উঠেছি। আমি সরল চ্যাটার্জির সঙ্গে আবার যোগাযোগ করেছি, যদিও ওকে আমি বলিনি আমার এ-বিষয়ে কিছু ব্যক্তিগত আগ্রহ রয়েছে।

অনেকদিন পরে দেখা হলো সরলের সঙ্গে। সরলের মাথায় একটু টাক পড়া ছাড়া তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

সরল চ্যাটার্জি রসিকতা করলো, "এই টাক পড়লো তোমাদের প্রিয়

শহর কলকাতায় ফিরে এসে।”

“শুধু আমার নয়, কলকাতাটা তোমারও বটে, সরল। এখানেই জন্মেছিলে, এখানেই লেখাপড়া করেছিলে এবং যদ্দূর মনে পড়ে এইখানেই ছাদনাতলায় গৃহিণীর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে।”

হা-হা করে হাসলো সরল। “বিয়েটাও যে কারখানার মতন একটা লং টার্ম এগ্রিমেন্ট তা আমার খেয়াল হয়নি। তবে ভাই, সত্যি কথা বলছি, ফরিদাবাদে চাকরি নিয়ে পরম সুখেই দিনাতিপাত করছিলাম। কয়েক বছর আগে গৃহিণীই গোলমাল শুরু করলেন। কথায় বলে, সুখে থাকতে ভূতে কিলেলো। চার্টার অফ ডিমাণ্ড দিলেন, চলো কলকাতা। বাংলা নাকি আবার সোনার বাংলা হয়ে গিয়েছে। কলকাতাই নাকি বাঙালিদের একমাত্র জেনুইন ঠিকানা—চার্ণক সাহেবের শহরে সুখ নাকি কৈ মাছের মতন খলবল করছে। ঠিক সেই সময়, অ্যাজ ইল লাক উড হ্যাভ ইট এক হেড হাণ্টারের পাল্লায় পড়লাম।”

“সেটা কি জিনিস? দিল্লির জঙ্গলে কি মানুষের মাথা শিকারী ঘুরে বেড়ায়?”

“ঠিক ধরেছো। এরা হলো ছেলে-ধরা এবং নরমুণ্ড-শিকারির মাঝামাঝি! এদের জন্ম মার্কিন দেশে, তারপর পৃথিবীর সর্বত্র এরা ছড়িয়ে পড়েছে। এদের কাজ হলো, বড়-বড় কোম্পানির বড়-বড় পোস্টের জন্যে যোগ্য প্রার্থী জোগাড় করে দেওয়া। আগে যেমন পাড়ার পদি পিসী এ-বাড়ির ঝি ভাঙিয়ে ও-বাড়িতে লাগিয়ে দিতেন, এরাও তেমনি চাকরি ভাঙায়।

“আমিও ভাঙানির মধ্যে পড়লাম—এবং বছর দেড়েক আগে কলকাতায় হাজির হলাম। সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং-এ বড় চাকরি। এক সময় সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং-এর নাম ছিল ভারত জোড়া—সমস্ত ভারতে গোটা চারেক ফ্যাক্টরি আছে। আদি এবং বৃহত্তমটি তুমি যেখানে থাকো তারই খুব কাছে।”

সরল-গৃহিণী বললেন, “এখন আপনার বন্ধু সারাক্ষণ আমাকে

বকাবকি করছেন, এই শহরে কেউ ফিরে আসে? মানুষ যেখান থেকে পালাবার জন্যে অস্থির, সেখানে বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে হাজির হবার কোনো মানে হয়?"

সরল বললো, "আমার কাছে অপ্রিয় সত্যর চাপাচাপি কিছু নেই, সুধাকর। যে-মাকে আমরা এতো ভালবাসি জীবন অবসানে তাঁকে শ্মশান নিয়ে গিয়ে কাঠের ওপর চড়িয়ে পুড়িয়ে আসি না?

"কলকাতা শহর শেষ হতে বসেছে। আমি তোমাকে বলে রাখছি সুধাকর, কয়েক বছর পরে এ শহরে ক্ষুধার্ত মানুষ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। বড় জোর একটা কেনা-বেচার গল্প। এ-অঞ্চলে শিল্পমহিমা বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। যেমন করে মোহেঞ্জোদাড়ো, ফতেপুর সিক্রি রেখে দেওয়া হয়েছে, সেইভাবে কলকাতাকে উনিশ শতকের একটা প্রতীক হিসেবে সাজিয়ে রাখার জন্যে পুরাতত্ত্ব বিভাগের হাতে তুলে দিতে পারো। কিন্তু দ্যাট্ মাচ্।"

আমি উসকে দিলাম, "আমরা তোমার টাকের হিসট্রি জানতে চাইছিলাম। কলকাতার পরিবেশ দূষণে শ্বাসপ্রশ্বাসের অসুখ হয়, কিন্তু মাথায় টাক পড়ে একথা তো শুনিনি।"

সরল বললো, "পলিউশনে ব্রিদিং ট্রাবল হচ্ছে আমার গৃহিণীর, যাঁর চার্টার-অফ-ডিমাণ্ডের ধাক্কায় আমাকে কলকাতায় ফিরে আসতে হলো। ইণ্ডিয়ার সর্বাধিক বিক্রীত কেশতৈল নিয়মিত ব্যবহার সত্ত্বেও আমার মাথায় যে টাক পড়লো তার জন্যে তেলের দোষ বিন্দুমাত্র নেই, দায়ী ওই সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কোম্পানির ওয়েস্ট বেঙ্গল কারখানা। ওখানকার অবস্থা ভাবলেই আমার ব্রহ্মতালু গরম হয়ে ওঠে।"

"মাথা গরম অবস্থায় চুলও গজায় না কোনো মহৎ কার্যও করা যায় না, ভায়া।" আমি মৃদু স্বরে বন্ধুকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম।

সরল বললো, "আগে যাঁরা এই পোস্টে ছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই তাই ভাবতেন। কারখানার পরিস্থিতি দেখে সারাক্ষণ চটিতং থাকতেন এবং

চটিতং অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন। তোমাকে কারখানার ব্যাপারটা সবিস্তারে বলবো। তোমার একটা উপন্যাস হয়ে যাবে।"

সরল-গৃহিণী বললেন, "কী বিষয়ে গল্প লিখতে হবে তা ওঁকে অ্যাডভাইস দিও না। উনি ভালভাবেই জানেন, কারখানার বিষয়ে পাঠিকাদের আগ্রহ নেই। উনি হুঁশিয়ার লোক, ওঁর প্রমোদ উপন্যাস সিরিজে কলকারখানা সম্পর্কে একটা কথাও থাকে না।"

সরল বললো, "কাজের-কাজ সম্পর্কে বাঙালী বাড়ির মেয়েরা খবরা-খবর নিচ্ছে না বলেই তো পুরুষগুলো উচ্ছন্নে যাচ্ছে। কারখানায় এবং আপিসে কাজে ফাঁকি দিয়ে না-হয় ইউনিয়নের প্রোটেকশনের আড়ালে চলে যাওয়া গেলো, কিন্তু যেদিন বাড়ি ফিরে মা, বউ, মেয়ে ছেলে, স্বামী অথবা পিতৃদেবের কাছে জানতে চাইবে কারখানায় কাজ করেছে কিনা তখন সমস্ত জাতটার চেহারা বদলে যেতে পারে।"

"তুমি বুর্জোয়া মানসিকতায় বুঁদ হয়ে আছো, সরল"

"মোটেই না। আমি খোদ চীনের দিকে তাকিয়ে আছি। সেখানে একজন প্রেমিকা যে-মুহূর্তে শুনলো পুরুষবন্ধুটি কারখানা থেকে ডিউটি আওয়ারে ফাঁকি মেরে পালিয়ে সে-মুহূর্তে অমনি তাকে ভীষণ বকুনি লাগালো। সোজা বললো. তুমি যদি এমন স্বভাব তৈরি করো তা হলে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।"

সরলের স্ত্রী হেসে ফেললেন। "হয় কাজ-পাগল না-হয় কাজ-ফাঁকিবাজ। তোমার মতন কাজ-পাগলরা বাড়িতে এসেও সারাক্ষণ আপিসের কাজ করে, বউয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় পায় না। আর তুমি যা চাইছো তাতে, সারা দেশটায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে যাবে! কত সংসার তখন ভেঙে যাবে তা হিসেব করেছো?"

"তা কেন? বাঙালীরা কাজ করতে চায় না, এটা অপপ্রচার বাঙালী যখন মন দিয়ে কাজে নামে তখন সে দুনিয়ার সেরা। তুমি দেখবে, যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে শতকরা আশি জন প্রাণ দিয়ে কাজ

করতে চায়, শতকরা উনিশ জন কাজের হাওয়া না-থাকলে ফাঁকি মারতে প্রস্তুত, আর একভাগ মাথার ওপর খাঁড়া না-ঝুললে কাজে মন দেয় না। এই একভাগই আজকাল অনেক কর্মস্থলে সবচেয়ে সোচ্চার। এরাই সমস্ত কর্ম পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে—তখন উৎপাদনের পরিমাণ হুড়হুড় করে কমে যায়। তুমি ভেবো না এটা আমার বানানো কথা। প্রবীণ গান্ধীবাদী শ্রমিক নেতা সুদর্শন ভাদুড়ি নিজেই একদিন গল্পচ্ছলে কথাটা বলেছিলেন।"

সরল চ্যাটার্জি বললো, "তুমি আমার বউয়ের ভুল পরামর্শ কানে নিও না। আমি বলছি, বাঙালীর অন্ন সমস্যার পটভূমিকায় তুমি মন দিয়ে একখানা ঢাউস উপন্যাস লেখো। বাড়ির বউরা জানতে চান না তাঁদের স্বামীরা বা ছেলেরা ফ্যাক্টরি বলে যেখানে যায় সেখানে কী ঘটে তা আমি বিশ্বাস করি না। বাংলার বধূরা অতো বোকা হলে বাঙালীর মনীষা কোনোদিনই ভারত জয় করতে পারতো না।"

"তোমার চুলের টাকটাই আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল।"

সরল চাটুজ্যে এবার ইমোশনাল হয়ে উঠলো। "সুধাকর, আমি অনেক আশা নিয়ে এ রাজ্যে ফিরে এসেছিলাম। আমার মাথায় টাক পড়ুক, আমি গোটা দুই পরচুলা কিনে নেবো। কিন্তু এখানে কোনো জিনিস নড়তে চায় না। মুখ দিয়ে ফেনা তুলে তুমি কোনো জিনিস কারখানার কর্মীদের বোঝালে। সবাই মন দিয়ে শুনবে, চুপি-চুপি বলবে আপনার বক্তব্যে ভুল নেই। কিন্তু...এই কিন্তুটাই এখানে সর্বনাশা শক্তি অর্জন করেছে, সুধাকর।"

" 'কিন্তু' তোমার কর্মক্ষমতাকে সম্পূর্ণ অসাড় করে দেবে, তুমি প্যারালিসিসে আক্রান্ত রুগীর মতন অসহায় ভাবে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে থাকবে। অথচ পৃথিবীর অন্যত্র, এমনকি ভারতবর্ষের পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে যাও—মতদ্বৈধ সেখানেও আছে। কিন্তু সবাই যখন কোনো বিষয়ে একমত হলো তখন হঠাৎ কিন্তু-বাবু হাজির হন না।"

সরল চ্যাটার্জি যে সত্যিই তার কোম্পানির কারখানা সম্বন্ধে চিন্তি[illegible] তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

সরল বললো, "ইতিহাসের পাতায় বাঙালীদের বারবার হেরে যাওয়ার এবং পিছিয়ে পড়ার বিবরণ রয়েছে, তার কারণ আমরা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলার শিক্ষা কস্মিনকালেও পাইনি।"

"এসব কথা কেউ বিশ্বাস করে না, সরল। তুমি তো ট্রামে-বাসে ঘুরে সাধারণ মানুষের কথাবার্তা শোনো না।"

সরল বললো, "ট্রামে-বাসে ট্রেনে কবিরাজ কালীপদ দে-র 'আশ্চর্য' মলম বিক্রেতাদের মতন জোরগলায় বলতে পারি, ভাল-ভাল ভাবনার উৎপত্তি হয় এখানে, কিন্তু ফল যখন ফলে তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তাই সুফলভোগ করে অন্য লোকরা। এই ধরো স্বদেশী আন্দোলন—বিলিতি কাপড় পোড়ালাম আমরা আর হুড়মুড় করে কাপড়ের কল তৈরি হলো বোম্বাই এবং আমেদাবাদে। একটা প্রদেশকে দুটো প্রদেশে ভাগ করায় কার্জনকে শিক্ষা দিলাম আমরা, কিন্তু রাজধানী চলে গেলো কলকাতা থেকে, লাভ হলো দিল্লীর প্রপার্টি মালিকদের। স্বাধীনতাযুদ্ধে আমাদের সোনার ছেলেরা ডজনে-ডজনে ফাঁসিতে লটকালো, জেলে পচলো। ফল যখন ফললো, তখন আমরা পেলাম বাংলা বিভাগ, আর নতুন-নতুন কলকারখানা গড়ে উঠলো অন্য রাজ্যে। আমাদের মালপত্রের ভৌগোলিক সুবিধেটুকুও নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হলো আমাদের হাত থেকে। আমাদের যতটুকু শিল্পমহিমা ছিল তা হয় অসুস্থ হয়ে পড়লো, না-হয় মালিকানা চলে গেলো রক্তশোষক বর্বরদের হাতে হাতে। কেমিক্যাল বলো, ওষুধ বলো, কাগজ বলো, ব্যাংকিং বলো, ইন্সিওরেন্স বলো সব শিল্পের প্রথম সূচনা হলো এখানে; কিন্তু তারা বিকশিত হলো অন্যত্র, এখান থেকে উৎপাটিত হবার পর।"

"তুমি উৎকট প্রভিনসিয়াল হয়ে পড়ছো!" স্ত্রী সাবধান করে দিলেন সরল চাটুজ্যেকে।

"মোটেই না। যারা প্রভিনসিয়াল তারা বলে বেড়ায় কেন্দ্র এবং ওরা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমাদের সর্বস্ব অপহরণ করছে। আমি বলি, যে জাত যা হারায় তা নিজের দোষেই হারায়। আমাদের অধঃপতনের জন্যে আমরাই দায়ী, অপরের ঘাড়ে দোষ চাপানোটা ছেলেমানুষি।" সরল বলে চললো," আমরা ভুলে গেছি যে আমরা অন্য অনেকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছি। যখন যে খেলা দেখাবার দরকার তা দেখাতে না পারলে আমরা মুছে যাবো ইতিহাসের পাতা থেকে। আমাদের জিহ্বা সরব, কিন্তু আমাদের শরীরের মাংসপেশী সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যেতে চাইছে না। আমি কর্মক্ষেত্রেও এই সর্বনাশা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।"

'ভাই সরল, তুমি ভীষণ রেগে রয়েছো।"

রেগে নেই, তবে দুঃখ আছে, সুধাকর। পশ্চিমবাংলার বাইরে ইন্ডিশ ইনজিনিয়ারীং-এর অন্য কারখানাগুলো আকারে ছোট, কিন্তু সেসব জায়গায় উৎপাদন প্রতি বছর বেড়ে যাচ্ছে আর এখানে আমার পাড়ায় একটা বিশাল বৃদ্ধ হাতি যেন ক্রমশ পাঁকের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

সরল বললো, "এই হাতিকে যত নড়াবার চেষ্টা করছি তত সে মাটিতে গেঁথে যাচ্ছে। সাধারণ শ্রমিকদের কথা ব্যক্তিগতভাবে জানি না। কিন্তু তাদের নেতারা ম্যানেজমেন্টের কোনো কথা কানে তুলতে রাজি নয়।"

সরল বললো, "আমি কাউকে কোম্পানির জন্যে জীবন দিতে বলছি না, কাউকে বাড়তি এক মিনিটও বেগার খাটতেও বলছি না, আমি শুধু নিবেদন করছি সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। কাজের সময় কাজ করে দুনিয়ার কারও কখনও স্বাস্থ্যহানি হয়নি। বরং শারীরিক শ্রমের মনও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রচণ্ড বিপদে না-পড়লে কারও কথা এঁদের কানে পৌঁছয় না।

"ইউনিয়ন মুখপাত্রদের একটাই বুলি, আরও কি অ্যালাউন্স দিচ্ছেন

বলুন। তুমি হাসবে, কিন্তু এখানে যারা কোম্পানির কোয়ার্টারে থাকে তাদের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে কোম্পানির খরচে ম্যারাপ বেঁধে দেবার দাবি উঠেছে। আমি তোমাকে বাড়িয়ে বলছি না। কোয়ার্টারে ইলেকট্রিক মিটার নেই, মাসে মাসে দু-তিন টাকা নেওয়া হয় বলে অনেকে কুঁড়েমি করেফ্যান আলো নেভায় না।"

"এসব তো ছোটখাট ব্যাপার।"

ফোঁস করে উঠলো সরল চ্যাটার্জি। "সুধাকর, এটা মোটেই ছোটখাট ব্যাপার নয়। এখানকার মনোবৃত্তিটা কীরকম হয়েছে তার নমুনা মাত্র।"

"তুমি কি বলতে চাও জাপানীরা, জার্মানরা, আমেরিকানরা কারখানায় কাজ করছে বসে সুখ চায় না? তাদের কোনো দাবি দাওয়া থাকে না?"

"অবশ্যই থাকে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারীদের দিয়ে কেউ নিশ্চয় কারখানা চালাবার কথা ভাবে না। কিন্তু পয়সা নেওয়ার সময় পরিবর্তে কিছু দেওয়ার কথাও ভাবতে হবে। অপ্রিয় সত্যটা হলো, এই পৃথিবীতে কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। যারা বিনামূল্যে কিছু পাবার স্বপ্ন দেখেছে তারা চোর-জোচ্চোরদের হাতে ঠকেছে। ঠকাবার পরে আফশোস করেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এতো মানুষ বোকা বনবার পরেও আরো অনেক মানুষ এখনও ঠকতে রাজি আছে।"

"ব্রাদার, একটু ঝেড়ে কাশো?"

"শোনো, সুধাকর! পাইয়ে দেবার রাজনীতির খপ্পরে পড়েছে এখানকার মানুষ। এই পলিটিশিয়ানরা বলছে, আমাকে আপনাদের নেতা করুন। তারপর থেকে আপনারা শুধু পেয়ে যাবেন, পরিবর্তে আপনাদের কিছুই দিতে হবে না। ওই যে জলন্ধর থেকে বস্ত্রনগরে জোচ্চোরগুলো পাঁজিতে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, বিনামূল্যে সোনার হার, বিনামূল্যে টি-ভি, ব্যাপারটা অনেকটা সে

রকম। তোমার পাড়ার সুইডিশ কারখানার সঙ্গে যুক্ত লোকরা কেউ কাজের কথা তোলে না, সবাই শুধু কোম্পানির কাছ থেকে পেতে চায়।"

"তোমরা দিয়েছো বলেই তো পেয়েছে। ওরা তো ডাকাতি করে নেয়নি কোম্পানির ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে।"

"ভাল পয়েন্ট তুলেছো, সুধাকর। ঠিক কথা, ম্যানেজমেন্ট যখনই চাপে পড়েছে তখনই সাময়িক হাঙ্গামা এড়ানোর জন্যে টাকা দিয়েছে। দেওয়ার পরে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্গতি কেমন হবে তো কেউ ভেবে দেখেনি।"

সরল চ্যাটার্জি বলে চললো, "অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি এদেশের ইংরেজ ব্যবসাদারদের খুব কমে গিয়েছিল, তাই তারা প্রতিযোগিতায় টিঁকতে পারলো না। ঘটি-বাটি এখানে ফেলে রেখে, শত শত অসুস্থ কোম্পানির লেটার হেডে নিজেদের স্মৃতিচিহ্নটুকু রেখে তারা এদেশ থেকে পালাবার পথ পেলো না।

"কোথাও মহামারী হলে, মড়ক লাগলে সন্ন্যাসীরা সেবাকার্যে উপস্থিত হন, কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিতে অন্য ব্যাপার। খারাপ খবর রটলেই সেখানে ছুটে আসে কসাইরা, ডোমরা। তাদের অনেকেই নিরিমিষ বিজনেসম্যানের জামাকাপড় পরে থাকে। কিন্তু তারা দেখে অসুস্থ গোরুটার চামড়াটা কেমন? জবাই করলে নাড়িভুঁড়ি বাদ দিয়ে মাংসর ওজন কতটা হবে? অসুস্থ কোম্পানির কতখানি খালি জমি আছে রাস্তার ধারে? কত লাভে জমিজমার ওপর বহুতল বাড়ি বানানো যাবে?

"সুধাকর, তুমি তো ছুতোরপাড়ায় বাসা নিয়েছো। একদিন কষ্ট করে বালি, বেলুড়, লিলুয়া, ঘুসুড়ি, শালকে, শিবপুর, শালিমার, ধোপাপাড়া, ঘুরে-ঘুরে দেখো—কত সংসারের সর্বনাশ হয়েছে ইদানীং তার একটা হিসেব দিতে পারবে তোমার কোনো গল্পতে।"

"সরকার নিজেই স্বীকার করছেন, কয়েক লাখ পরিবারের অন্নদাতা এখন চাকরি খুইয়ে জাত গুটিয়ে ঘরে বসে আছেন।"

আমার প্রশ্ন : "সরল তুমি কি বলতে চাও, বন্ধ হবার সব দোষই যারা কাজ করে তাদের ?"

"অবশ্যই নয়। কিন্তু যদি বলি অবুঝ কর্মীদের নেতারা এই সর্বনাশে ইন্ধন জোগায়নি তা হলেও কিন্তু মিথ্যাচার হবে। যে গোরু এগোতে চায় না, গোয়ালা তার গলার দড়ি ধরে কত টানাটানি করবে ? তারপর যখন গোরু এগোতে রাজি হয়, ততক্ষণে কসাই এসে গিয়েছে। দরদাম শেষ—মালিকানা পাল্টে গিয়েছে। তুমি ক'দিন ঠাণ্ডামাথায় সরকারী লাইব্রেরিতে বসে স্থানীয় ইণ্ডাস্ট্রির ইতিহাসটা যাচাই করে নাও। তোমাদের কথা লোকে শুনলেও শুনতে পারে। যারা কারখানা চালায় তারা তো কেবল অরণ্যে রোদন করে।"

"তা কেন ? তোমরা তো প্রকাশ্য দিবালোকে সবার সামনে বসে রোদন করছো। কান্না কানে পৌঁছয়নি বলতে পারবে না। বিশ্বাস অবিশ্বাস অবশ্য অন্য কথা।"

সরল বললো, "আসল সমস্যাটা তুমি নিজের অজান্তেই ইঙ্গিত করেছো। রোগটা হলো বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের। এক সময় এদেশে ছিল ভক্তির জোয়ার—কিন্তু নানা জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে আমরা হয়ে উঠেছি ঘোর অবিশ্বাসী। এই ভয়ঙ্কর রোগে ভুগছি বলেই কোনো ওষুধ আমাদের কাজে লাগছে না।

"তুমি বলছো, ভক্তিবাদীরা যখন অবিশ্বাসী হয় তখন ফল ভাল হয় না।"

"এখানকার কর্মীদের দেখে আমার তো তাই মনে হচ্ছে, সুধাকর। ধরো ম্যানেজমেণ্ট কথাটা। বাংলা ভাষায় নেতারা একে বেমালুম 'মালিক'পক্ষ বলে গালাগালি করছেন। অথচ আমরা অবশ্যই মালিক নই। আমরা কোম্পানিটাকে পরিচালনা করছি। এই কোম্পানির মালিকানায় রয়েছে নানা প্রতিষ্ঠান। বিধবার টাকায়, পেনসনারের টাকায়, সাধারণ মানুষের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় শেয়ার কিনেছে নানা সরকারী এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। দু'দশ পার্সেণ্ট মালিকানা হোমড়া-

চামড়া এক আধজন বড়লোকের হাতেও রয়েছে। আমার কানাকড়িও নেই এই কোম্পানির মালিকানায়—আমি যা করতে চাই তা নিজের মাইনের জন্যে এবং প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু আমাকে উদ্দেশ্য করে স্লোগান ওঠে—মালিক তুমি হুঁশিয়ার।"

"তোমরা এসব কথা কর্মীদের বলো না কেন? ভারতবর্ষের মানুষ তো অবুঝ নয়?"

"সেটাই আমাদের দোষ বলতে পারো, সুধাকর। যারা বিনামূল্যে খাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে ঠকাতে এসেছে তারা খুব ভালভাবে জানে মানুষের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, কী করে তাকে উত্তেজিত অথবা অনুপ্রাণিত করতে হয়। আমরা তথাকথিত ম্যানেজমেন্ট বা মালিকপক্ষ মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে জানি না। আমরা ছেঁড়া কাগজে পোস্টার লিখতে শিখিনি, আমরা টুলে দাঁড়িয়ে গেটমিটিংয়ের কথা ভাবি না। আমরা প্রতিবাদ জানাবার জন্যে অনশন করতে পারি না। আসলে আমরা সায়েবদের পরিত্যক্ত সেকেণ্ডহ্যাণ্ড প্যান্ট-শার্ট পরে ঠিক সেই আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। এটা মস্ত এক ট্রাজেডি। তুমি যদি কখনও লেখো, এ-বিষয়টাতেও আলোকপাত করো। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড সায়েবরা যদি বউদের প্ররোচনায় একটু নড়ে-চড়ে বসেন। তাঁরা তো সোজাসুজি বাংলা বই পড়বেন না—বড়ো জোর ওয়াইফের কথায় কান দেবেন।"

সরল চাটুজ্যে বললো, "ধোপাপাড়া কারখানায় লক-আউটের তালা লাগাতে দুঃখ হলো। কিন্তু উপায় ছিল না।"

আমি মনে করিয়ে দিলাম, "সব যুদ্ধের সময় সব পক্ষই তো ঐ কথা বলে, 'উপায় ছিল না'। শ্রমিকরাও শুনি বলে তারা নিরুপায়। উপায় নেই বলেই তারা সংঘর্ষের পথে যাচ্ছে। সেই জন্যেই তো সংগ্রাম কমিটি না কি ফেঁদে বসে কর্মীরা, আর তোমরাও 'ওয়ার ক্যাবিনেট' না কী একটা তৈরি করো। মালিকপক্ষ ইংরিজিটিংরিজি একটু ভাল বোঝে, তাই গোপন নাম দেয়—রিভিউ কমিটি, পলিসি কমিটি,

স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি—কিন্তু আসলে ওই সংগ্রাম কমিটি।"

"সুধাকর, তুমি তো ছুতোপাড়ায় উঠে যাবার আগে এমন ছিলে না। তুমি কি সংগ্রামী নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত মিশছো?"

আমি বললাম, "নেতারা আমার নাগালের বাইরে—তবে যাঁরা খেটে খান, প্রতিদিন রুজিরোজগারে বেরোন তাঁদের কয়েকজনকে খুব কাছ থেকে দেখি। খারাপ লাগে না মানুষগুলোকে। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাবার সময় এসেছে বলে তো মনে হয় না।"

হাসলো সরল চ্যাটার্জি। "নিজের প্রফেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি অন্যায় বলছো না, সুধাকর। মানুষকে যদি বিশ্বাসই না-করতে পারলে তাহলে কার জন্যে লিখবে তুমি—বাঁদরে বা ছাগলে তো তোমার বই পড়বে না!"

একটু থামলো সরল চ্যাটার্জি। তারপর বললো, "শোনো সুধাকর। ব্যবসা-বাণিজ্যের নিষ্ঠুর সত্যটা হলো কেউ দানছত্র করতে বিজনেসে নামেনি। যাকে যত টাকা দেওয়া হবে তার থেকে বেশি তার কাছ থেকে ফেরত পাওয়া চাই। এর মাপ করা হয় প্রোডাকটিভিটি অর্থাৎ উৎপাদকতা দিয়ে।

"সোজা ইংরিজিতে এর ব্যাখ্যা হলো—ইনপুট আউটপুট রেশিও কত ধানে কত চাল পাওয়া গেলো। কত সরষে ঢেলে ঘানি থেকে কত তেল বেরুলো। সরষের দাম যদি তৈরি তেলের থেকে বেশি হয় তো হলে ব্যবসায়ীর বিনাশ অনিবার্য।"

"যতদিন তেলের দাম আকাশ-ছোঁয়া ছিল তত দিন কর্মীদের দু'চারটে অন্যায় আব্দারও তেল কোম্পানি মেনে নিয়েছে। কিন্তু যেদিন সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং-এর অবস্থায় পড়বে—অর্থাৎ এমন প্রতিযোগীর সঙ্গে লড়াই করতে হবে যারা একই পরিমাণ সরষে থেকে অনেক বেশি তেল পাচ্ছে—তখন তার সামনে দুটো পথ খোলা থাকবে। হয় অন্য লোকে যতটা তেল পাচ্ছে ততটা তেল আদায় করা অথবা শ্বশুরবাড়ি থেকে কাঁচা টাকা নিয়ে এসে হপ্তায়-হপ্তায় ব্যবসায় আর্থিক

ঘাটতি পূরণ করা। বিজনেসের বিশেষজ্ঞরা একেই বলেন সিকনেস-অসুস্থতা। তখন প্রতিদিন কাঁচা টাকার জন্যে কোম্পানিতে হাঁপানি ওঠে। আমাদের লাইনে এর নাম ক্যাশ ফ্লো। কোম্পানি রোগের ডাক্তাররা কাঁচা টাকার টানাটানির প্রকৃত লক্ষ্য করেই বুঝতে পারেন রোগ কতখানি গড়িয়েছে। রোগের প্রকোপ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রয়োজন। তখন ওইসব অপ্রিয় কথা শোনা যায়—লক-আউট, সাসপেনসন অফ ওয়ার্ক। যখন শুনবে 'ক্লোজার' বা বন্ধ, তখন বুঝবে রোগীকে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে পাঠানো হয়েছে—রোগ মারাত্মক।"

সরল চ্যাটার্জির শেষ কথাগুলোই সদানন্দ মজুমদারকে মুখ ফুটে বলতে পারেননি সুধাকর নন্দী। কারখানা সম্পর্কে ইঙ্গিতটা ভাল দেয়নি সরল চ্যাটার্জি।

সুধাকর সেদিন সরল চ্যাটার্জির ওখান থেকে ফিরে এসে অনেকক্ষণ নিজের চিন্তা লিপিবদ্ধ করেছেন। শেষপর্যন্ত একটু দিশেহারা বোধ করেছেন।

সুধাকর দিনলিপিতে লিখলেন: মানুষ যেভাবে সংসার চালায় ঠিক সেইভাবেই এ দেশের কলকারখানা চালায় না কেন? পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং সেই সঙ্গে কিছুটা সহিষ্ণুতা আছে বলেই সংসারগুলো শত দুঃখের মধ্যেও চলমান, অথচ এই সংসারী মানুষগুলো সাইকেল চড়ে কারখানায় পৌঁছে কার্ড পাঞ্চ করলেই অন্যরকম হয়ে যায় কেন? সংসার তো এখনও মরুভূমি হয়ে ওঠেনি। সেখানে কত স্নেহভালবাসা, কত দায়িত্ববোধ, কত ত্যাগ। আর কলে কারখানায় কেন এতে বিদ্বেষ, এতো ঘৃণা, এতো অবিশ্বাস?

অথচ কে না জানে কলকারখানা না-চললে শত শত সংসারও

অচল। সংসারের কথা ভেবেই তো সংসারী লোকদের কর্মক্ষেত্রে আরও অনেক সাবধানী হওয়া উচিত।

বাইরে পথ ধরে জুতো-সেলাইওয়ালা যাচ্ছিল। আওয়াজ শুনে সুধাকর নন্দী তাকে ডাকলেন। কাবলি জুতোর স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গিয়েছে। কাল প্রায় খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাস স্ট্যাণ্ড থেকে তিনি বাড়ি ফিরেছেন।

মেঝেতে বসে পড়ে সেলাইওয়ালা যত্ন করে জুতো সংস্কারে মন দিলো। সুধাকর দেখলেন, কি নিপুণতার সঙ্গে সেলাইওয়ালা প্রথমে লক্ষ্য করছে, কী কাজ করা প্রয়োজন। সেলাইয়ের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেই সেলাইওয়ালা নিজের ঝুলি থেকে চামড়ার টুকরো বাছাই করতে লাগলো। একটা চামড়া প্রায় ঠিক করেও সেটা ঝুলিতে পুরে ফেলতে দেখে সুধাকর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে সেলাইওয়ালা বললো, "অতোটা চামড়ার প্রয়োজন হবে না হুজুর। শুধু শুধু অতটা জিনিস নষ্ট করবো কেন?"

ঠিকই বলেছে সেলাইওয়ালা। কলকাতা শহরের এতো মানুষের তুলনায় কতই বা গোরু-ছাগল আছে। কেন শুধু শুধু চামড়া নষ্ট করবে সে?

সেলাইওয়ালা বললো, "ছাঁট চামড়ারও দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে হুজুর। পড়তায় পোশাবে না বাজে খরচ হলে।" ইতিমধ্যে আর একটা চামড়া খুঁজে পেয়েছে সেলাইওয়ালা। কিন্তু এবার রঙ মিলছে না চামড়ার।

সুধাকর আবার প্রশ্ন করলেন, কেন এই চামড়াটাও সে রেখে দিচ্ছে। সেলাইওয়ালা বললো, "জুতো সারাই হলো ঠিক, কিন্তু রঙ না মিললে আমার নাম খারাপ হবে, এর পরের বার আপনি রঘু মিস্ত্রিকে ডাকবেন না। আমি তাই চকোলেট রঙের চামড়া খুঁজছি।"

টুকরো পাওয়া গেলো, তারপর নীরব অথচ প্রশংসনীয় দক্ষতায়

কাজ শুরু হলো। সেলাইয়ের পর সেলাইওয়ালা আবার টেনে-টেনে দেখলো। খুব একটা ভরসা পাওয়া গেলো না বোধ হয়, তাই বাড়তি দুটো সেলাই পড়লো পটাপট। তারপর সেলাইওয়ালা আঙুলের নরম অংশ দিয়ে অনুভব করে দেখলো সেলাইয়ের দাগ থেকে পায়ে কোনো অস্বস্তি হতে পারে কিনা। জায়গাটা পিটে পিটে মসৃণ করে ফেললো সেলাইওয়ালা।

সুধাকর ততক্ষণে চিন্তায় ডুবে গিয়েছেন। এদের কাজে উৎসাহিত করার জন্যে তো কোনো চীফ অ্যাকাউনটেন্ট, পার্সোনেল ম্যানেজার বা জি-এম লাগে না। এরা নিজেরাই ঠিক করে, কোন জিনিস কতখানি খরচ করা উচিত, কাজটা ঠিক হলো কিনা তাও এরা নিজেরাই দেখে নেয়, খরিদ্দারের সঙ্গে সম্পর্ক নিজেরাই রক্ষে করে—এরা একাই একশ। বড় প্রতিষ্ঠানে অনেক লোক নিয়েও যা ভালভাবে হয় না তা একজনের আন্তরিকতায় সফল হয়ে ওঠে।

এই স্বনির্ভর মানুষরাই ভারতবর্ষকে এখনও চলমান রেখেছে। সংখ্যাতে এরা কলকারখানার মোট কর্মী থেকে অনেক বেশি। এদের কাজে ধারাবাহিকতা নেই, নিশ্চয়তা নেই। এদের না আছে পেনসন, না আছে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড। এরা বোনাসও পায় না, ওভারটাইমও এদের স্বপ্নের অতীত—তবু পরের দিনের অন্নের জন্য এরা নীরবে সমস্ত রাত কাজ করতে প্রস্তুত। এদেরই কেউ বলেছেন, সাইলেন্ট মেজরিটি—নির্বাক গরিষ্ঠ। কেউ বলেছেন ভাগ্যহীন শ্রমজীবী—ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সেকটরের ক্ষুদ্র মানুষরা।

সরল চ্যাটার্জি বলেছিল, "দুঃখ এই, এই অসামান্য মানুষদের বিপুল অন্তর্নিহিত শক্তিকে আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না। এরা বিনা প্রতিবাদে তথাকথিত সুগঠিত অর্গানাইজড্ সেকটরের সমস্ত অকর্মণ্যতার বোঝা বয়ে চলেছে। গ্রামে-গঞ্জে-নগরে এরা সর্বদা উপস্থিত না-থাকলে শহুরে ভারতবর্ষ কবে শেষ হয়ে যেতো। এদের অসীম সহিষ্ণুতার ওপরই আমরা ভাগ্যবানরা টিকে আছি। ভারতবর্ষে

যত লোককে রুজিরোজগার করতে হয় তার শতকরা পাঁচ ভাগ লোকও বড় কলকারখানায় কাজ করে না।"

সরল চ্যাটার্জির পরবর্তী মন্তব্য: "তুঃখটা কী জানো? ক্ষুদে সেকটরের স্বনির্ভর এই তুলনাহীন কুশলী মানুষগুলোকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসে সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ভাল মাইনেতে ঢুকিয়ে দাও—এক মাসের মধ্যে এরা নষ্ট হয়ে যাবে। ভাল আমের সংস্পর্শে পচা আম কখনও ভাল হয় না, কিন্তু বহু ভাল আমকে রাতারাতি খাওয়ার অযোগ্য করে তোলার পক্ষে একটা পচা আমই যথেষ্ট। এইটাই বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম বলে আমরা হা-হুতাশ করি, হাত গুটিয়ে বসে থাকি। কিন্তু যারা বিচক্ষণ, যারা নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার তুঃসাহস রাখে তারা এই অবস্থা মেনে নেয় না। পচা আমের গন্ধ পেলেই তারা তন্ন তন্ন করে ঝুড়ি সার্চ করে এবং সেই আমকে অন্যত্র ছুঁড়ে ফেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। আমরা পারি না বলে বলে আমাদের কলকারখানাগুলোর এই শোচনীয় অবস্থা। অকর্মণ্যতার প্রতিযোগিতায় ত্রিভুবনের কেউ আমাদের সঙ্গে পেরে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠির উঠবে না।"

♣

সুধাকরের কাছে আর এক শ্রেণীর মানুষের তুঃখের কথা বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাদের নাম দিনমজুর।

ভূমিহীন এই মজুররাই ভারতবর্ষের শিরদাঁড়ার মতন। এরা কখনও কাজ পায়, কখনও পায় না। মাস মাইনে অথবা হপ্তা কাকে বলে তা পর্যন্ত এই দিনমজুররা জানে না।

ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম কত রোজগার হওয়া উচিত তা নিয়ে উপরতলার কর্তাব্যক্তিদের কত মাথাব্যথা! মহা-মহা অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ এবং পুষ্টিবিশারদের উপস্থিতিতে রাজধানীর এয়ারকণ্ডিশন

সভাকক্ষে বড় বড় কমিশন বসে। শত শত পাতার রিপোর্ট টাইপ করা হয় দুর্বোধ্য ইংরিজিতে। সেখানে কত বহুবর্ণরঞ্জিত গ্রাফ ও চার্ট শোভা পায়।

রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র জনসাধারণের অর্থে প্রতি রাজ্যে ডজন-ডজন ইন্সপেক্টর এবং অফিসার নিয়োগ করা হয় ক্ষেতমজুর অথবা ইট খোলার কর্মীরা ন্যূনতম বেতন পাচ্ছে কিনা তা খবরদারি করতে। কিন্তু ভারতবর্ষের অসহায় দিনমজুর যে তিমিরে সেই তিমিরে!

এদের নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে, ভারতবর্ষের ভিতই কেঁপে উঠবে, আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। তাই উগ্রবামপন্থীরাও নির্বাক।

এক কাঁড়ি সরকারী পদ সৃষ্টি ছাড়া সরকারী কুম্ভীরাশ্রু ও অনুশাসনে কারও কোনো লাভ হচ্ছে না। ভাগ্যহীন মজুর ভাগ্যসন্ধানে চলেছে এক রাজ্য পেরিয়ে আর এক রাজ্যে। দেশে-দেশে অগম্য জনপদে এরা মাটি কাটে, জল তোলে, পাথর ফাটায়, ইট সাজায় —তবু এরা জানে না পরবর্তী দিনের দু'মুঠো অন্ন কোথা থেকে আসবে।

অথচ সুধাকর নন্দী পড়েছেন, ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের জন্যে সরকারী খাতায় বিশেষজ্ঞদের কতরকম জটিল অঙ্ক কষা রয়েছে। অন্তত তিনটি মানুষ যেন ওই আয় থেকে মাথাপিছু বাইশশ ক্যালরি খাবার সংগ্রহ করতে পারে। একুশশ নয়, তেইশশ নয়, কেন বাইশশ সে-সম্পর্কে কি চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিচারসভা!

সবচেয়ে হাসি লেগেছিল কর্মীদের আশ্রয়ের ব্যাপারে। ওই দরাজ হিসেবে বাড়ির জন্যেও দৈনিক কয়েক নয়া পয়সা ধরা হয়েছে! এই পয়সায় বাড়ি কোথায় পাওয়া যায় তা মহামান্য বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন!

কথা উঠতে পারে, যা এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম্ভব তা সরকার কীভাবে কার্যকরী করবেন? ঠিক কথা, কিন্তু যা আয়ত্তের বাইরে সে-বিষয়ে দামামা বাজিয়ে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষ থেকে ফতোয়া

জারি করে কী লাভ? সরকারী ও সামাজিক পর্যায়ে ভারতবর্ষের অতি দরিদ্রদের এখনও যে অসম্মান করা হয় পৃথিবীতে তার তুলনা মেলা ভার।

সুধাকর এবার সজাগ হয়ে উঠলেন। এই সব গোলমেলে ব্যাপারে নাক গলিয়ে বোধ হয় লাভ নেই।

সমাজে চলেছে দলবদ্ধ শক্তির খেলা। যারা যত দল পাকাতে পারবে, হৈ-চৈ বাধাতে পারবে, মিছিলে-মিছিলে পথরোধ করতে পারবে তারা তত লাভবান হবে, এই জনগণতান্ত্রিক দেশে তাদের সমৃদ্ধি তত সুনিশ্চিত হবে।

যারা ঐসব খেলা জানে না, যাদের সঙ্ঘশক্তি নেই তারা আরও দরিদ্র হয়ে অর্ধমৃতের মতন বেঁচে থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দ এদের জন্যে কিছু করতে পারলেন না, মহাত্মা গান্ধী কিছু করতে পারলেন না, আর কোথাকার কোন্ হরিদাস পাল গল্প লেখক!

এর থেকে ঢের ভাল ওই প্রমোদ উপন্যাস রচনার কাজ। তুমি জানো তোমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। সত্যি কথাও তোমার কাছ থেকে কেউ প্রত্যাশা করছে না। তুমি স্রেফ কর্মক্লান্ত মানুষকে একটু ছুটি উপভোগ করাও, তার কষ্টের পরিবেশ থেকে বার করে এনে বিনা খরচে দেড় ঘণ্টায় বিদেশ ঘুরিয়ে আনো।

সুধাকর ভাবছেন তাঁর পরবর্তী প্রমোদ উপন্যাসের কথা। ম্যানিলা শহরের রঙিন ম্যাপটাও তাঁর টেবিলের ওপর খোলা পড়ে রয়েছে। কতকগুলো বড় বড় দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনাও ইংরেজী ফোডরস্ গাইড বুক থেকে নোট বইতে লেখা রয়েছে।

কিন্তু সুধাকর নন্দীর মন বসছে না। কোথায় কী যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছে। এই সদানন্দ মজুমদার লোকটার সঙ্গে এতোটা মেশামিশি না করলেই বোধ হয় ভাল হতো।

পাশের বাড়ির লোকের সাংসারিক সুখদুঃখের সঙ্গে অযথা জড়িয়ে

পড়ে লেখকের লাভ কী ? সায়েব লেখকরা এ-বিষয়ে অনেক দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন—তাঁরা জানেন, প্রত্যেকটা মানুষ একটা দ্বীপের মতো। একটু দূরত্ব রেখে চলা প্রয়োজন, না হলে মানুষ তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলবে।

সুধাকর এরপর কী ভেবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন একটু হাটা-চলা প্রয়োজন। সারাক্ষণ টেবিলের সামনে বসে বুঁদ হয়ে চিন্তা করলে শরীর যেন উদ্যমহীন হয়ে পড়ে, তার সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে দক্ষিণমুখো হাটতে হাটতে সুধাকর হাজির হলেন সুইডিশ ইন্‌জিনিয়ারিং কোম্পানির গেটের সামনে।

বিশাল লোহার গেট বন্ধ। দু'জন গোর্খা গোমড়া মুখে খাকি শার্ট ও হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় পাথরের মতন দাড়িয়ে আছে।

গোর্খার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুধাকর। নেহাতই শান্তিপ্রিয় মানুষ মনে হয়—এই উপমহাদেশের যেখানকার যত গোলমালের মধ্যে এদের কেন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় সুধাকর বুঝতে পারেন না।

রাত জেগে দুনিয়ায় আজে-বাজে লোকের সম্পত্তি পাহারা দেবার জন্যে ভগবান নিশ্চয় এমন সুন্দর জাত সৃষ্টি করেননি।

সুধাকর আর এক ব্যাপারে গোর্খাদের ভক্ত। এরা মুখে চাবি লাগিয়ে কাজ করে—কোনো আড্ডাবাজ গোর্খা সিকিউরিটি গার্ডকে সুধাকর এখনও দেখেননি। সুযোগ ও সুবিধে পেলে বড় জাত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এদের।

গেটের গায়ে আঁটা সুইডিশ কোম্পানির নোটিশটা দূর থেকে পড়া

যাচ্ছে না। কিন্তু ইউনিয়নের পোস্টার নজর কাড়ছে।

লাল কালিতে চমৎকার স্টাইলে '৪র্থ' কথাটা লেখা। অর্থা আজ লক-আউটের চতুর্থ সপ্তাহ। তলায় লেখা 'দালাল সাবধান' সুধাকরের সামনেই জোর গলায় স্লোগান উঠলো: 'মালিকের কাে হাত গুঁড়িয়ে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।'

এই দালালটিকে নিজের চোখে দেখবার লোভ হচ্ছে সুধাকরের কয়েকজনের সঙ্গে কথাও বললেন সুধাকর। কোম্পানির মালিকে চেয়েও ঘৃণিত জীব যে এই দালাল তা বিশ্বসংসারের সবাই জে গিয়েছে। কিন্তু দালালটি যে কে তা এখানকার স্থানীয় কেউই ঠি করে সুধাকরকে বলতে পারলো না।

কিন্তু দালালকে খুঁজে বার করবার গোঁ চেপে বসেছে সুধাকরের দালালের খোঁজে সুধাকর এবার স্থানীয় হাজরা কাফেতে ঢুকলেন।

এখানে প্রায় সব কটা চেয়ারই বোঝাই। লক-আউটের বিষ বিভিন্ন টেবিলে প্রবল আলোচনা চলেছে। আর এদিকে কাউন্টা মালিকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ বাক্যবিনিময়ও সুধাকরের কানে এলো।

একজন জিজ্ঞেস করছে, "এটার মানে কি? এতোদিন সবা খাতায় লিখে খেয়ে এসেছে, আর আপনি এখন বলছেন নগদ বিক্রি মগের মুলুক পেয়ে গিয়েছেন নাকি!"

দোকানদার সোজাসুজি উত্তর দিতে চাইছেন না, কিন্তু নগদ ছা কোনো কিছু বিক্রি যে সম্ভব নয় তা হাবে-ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

ধারের ক্যানডিডেট রেগে বলছেন, "আপনি ভাবছেন, লক-আউ চিরকাল চলবে, আর আমরা এই হাজরা কাফেতে বসে ভেরাণ্ড ভাজবো।"

বুদ্ধিমান দোকানদার যা বলবার তা মুখে উচ্চারণ না করে স্রে হাবভাবেই বলছেন।

আর এক ভদ্রলোক রেগে উঠে মালিককে বললেন, "এইভাবে নগ না চেয়ে আপনিও বরং কোম্পানির মতন হাজরা কাফেতে লক-আউ

নোটিস টাঙিয়ে দিন। আমরা বুঝে নিই আপনি শ্রমিকের বন্ধু না ম্যানেজমেন্টের দালাল।"

একটু পরে আড়ালে পেয়ে মালিক ভদ্রলোক চাপা গলায় সুধাকরকে বললেন, "তিন সপ্তাহের ধার একটা পয়সা কেউ শোধ করেনি। আমি কি মশাই বাড়িতে নোট ছাপাই? আমি দুধ, চিনি, চা, পাঁউরুটি, মাখন, কয়লা, ঘুঁটে কোথা থেকে কিনবো? মালিকের সঙ্গে বড্ড বেশী মস্করা করেছো, এবার মালিক ছোবল দিয়েছে—বোঝ ঠেলাটা। এঁরা সর্বহারার নেতা, কিন্তু আমার দোকানের কমবয়সী বয়গুলোর সঙ্গে ব্যবহার করবে নবাব আলীবর্দি খাঁয়ের মতন।"

সুধাকর জিজ্ঞেস করলেন, "ক দিন লক-আউট চলবে?"

ভদ্রলোক বললেন, "কারখানা তাড়াতাড়ি না খুললে আমিও তো বিপদে পড়বো। এখনই সিঙাড়া, ওমলেট কেউ খাচ্ছে না। স্রেফ চা, তাও একটা কাপ নিয়ে দু'ভাগ করছে—একজন কাপে, একজন ডিশে। আগে হাজরা কাফেতে ওসব অ্যালাউ করতাম না। এখন কী বলবো? বললেও কে শুনছে?"

ঠিক এই সময় একজন বয় ছ'টা "মামলেট" ও বারখানা হাতে-গরম সিঙাড়ার হাঁক দিলো।

সুধাকর একটু অবাক হলেন, "এই যে বললেন ওসব অর্ডার বন্ধ।"

মালিক চুপি-চুপি বললেন, "ওটা নেতাদের অর্ডার। ওঁদের ঘন ঘন মিটিং হচ্ছে, অনেকক্ষণ মাথা ঘামাতে হচ্ছে, ওঁরা ডবল ডিমের মামলেট, স্পেশাল সিঙাড়া এবং 'ভি-আই-পি, চা খাবেন না তো কারা খাবেন?"

"আর ক'দিন লক-আউট চলবে স্যর? আমি তো সিদ্ধেশ্বরীতলায় পাঁচ টাকা চড়িয়ে এসেছি। এ-সপ্তাহে যদি খুলে যায়।"

নেতাদের একজন সুধাকরকে চিনতে পারলেন। সাদরে তাঁকে নিয়ে এলেন নিজেদের রিজার্ভড স্পেশাল টেবিলে। অনুরোধ জানালেন, "দিন না দাদা, খবরের কাগজে ঝেড়ে লিখে। ব্যাটাচ্ছেলে

মালিকের ঘৃণ্য গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাক।"

সুধাকর বোঝাতে চাইলেন, তিনি রিপোর্টার নন। একজন গল্প লেখক মাত্র। ওঁরা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। খবরের কাগজে কারও গল্প বেরোলেও তাকে রিপোর্টার বলে ধরে নেওয়া হয়।

"দালালরা যে চান্স পেলেই সাপের ছোবল দেবার চেষ্টা করবে তা আমরা জানি," জোর গলায় বললো এক তরুণ নেতা।

"দালালটা কে?" সুধাকরের খুব ইচ্ছে একান্তে এই দালালটিকে নিয়ে বসেন, একটু কথাবার্তা বলেন।

ছোকরাকে আরও একটু প্রশ্ন করলেন সুধাকর, কিন্তু সোজাসুজি উত্তর পেলেন না। মনে হচ্ছে, দালাল অনেকটা ভগবানের মতন—কেউ তাঁকে দেখেনি, কিন্তু সবাই জানে তিনি আছেন।

ইয়ং নেতা বললো, "আমাদের পয়লা নম্বর শত্রু এই দালাল—মালিক নয়। কারণ মালিককে আমরা তো শত্রু বলে জানি, তার রঙ বদলায় না। কিন্তু দালাল হলো বহুরূপী—মিনিটে মিনিটে রঙ বদলাতে পারে। কখনও সে পার্সোনেল অফিসার, কখনও সংগ্রাম কমিটির সক্রিয় সভ্য, কখনও অর্ডিনারি মেম্বার। সংগ্রামী শ্রমজীবিদের মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া তার কোনো কাজ নেই।"

"এই দালালকে যদি সশরীরে খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলে আমাকে একটু খবর দেবেন? আমি দেখতে চাই, এতো কথা শুনেছি তাঁর সম্বন্ধে।"

ছোকরা বললো, "সেটা সম্ভব হবে না। কারণ দালালকে হাতে পেলে শ্রমিকরা তখনই শেষ করে দেবে। তার ডেড বডি আপনি এসে দেখে যেতে পারেন। কিন্তু তারও মুসকিল আছে, সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ এসে হাজির হবে, হাঙ্গামা বাধাবে।"

নেতা বললেন, "এই পুলিশ আর একটি চীজ দাদা! সাপকেও চুমু খাচ্ছে, ইঁদুরকেও চুমু খাচ্ছে। কসাইয়ের সঙ্গেও খৈনি টিপছে

আবার ছাগলকেও বলছে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করো না।”

ব্যাটারা বলে কি জানেন? লড়াই করো, কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে। সেটা সম্ভব? বলুন তো।”

সুধাকর এবার জানতে চাইছেন পরিস্থিতিটা কী রকম?

নেতা বললেন, “সব শালা মালিকের এক রা। ব্যাটারা নোটিসে লিখেছে, শ্রমিক বিশৃঙ্খলা চলছিল, এবং উৎপাদকতা নেই। সরকারকে লক ব্ল্যাক দিচ্ছে কোম্পানির লাভ হচ্ছে না। সব কাঁচা মিথ্যে। শালারা লুকিয়ে-লুকিয়ে লাখ-লাখ টাকা লাভ করছে—বাইরে বলছে লোকসান, যাতে গরিব শ্রমিককে কিছু দিতে না হয়। এই সর্বনাশা মুখোশ খুলে দিতে হবে। কিন্তু খোলা যাবে কী করে? ওদের দালালরা খবরের কাগজের আপিসেও গেঁড়ে বসে রয়েছে। এডিটরকে, চীফ রিপোর্টারকে কী সব মিথ্যে বোঝাচ্ছে—ইউনিয়নের অত্যাচারে কোম্পানিটা নাকি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অর্ডিনারি ওয়ার্কারের জন্যে কোম্পানির দালালের সে কী মায়াকান্না, আপনাকে কী বলবো।”

“তবে এই রকম মামদোবাজী চালালে দালাল খবরের কাগজগুলো আমরা এ-পাড়ায় ঢুকতে দেবো না। স্বদেশী আমলে বিলিতি কাপড়ের দশা হয়েছিল তাই হবে—আগুনে পুড়বে। কিন্তু দালাল এখানেও সক্রিয়। বলে কিনা, তাতে খবরের কাগজেরই উপকার হবে, বিক্রি না হয়েও সার্কুলেশন চড়-চড় করে বেড়ে যাবে—পোড়া কাগজগুলোও ওরা প্রচারসংখ্যার মধ্যে ধরে নেবে।”

সুধাকরের মন ভরছে না। “প্লিজ, দালাল দেখলে আমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দেবেন, আমার উপন্যাসের একটা ইন্টারেস্টিং ক্যারাকটার হবে। লোকটা কীরকম দেখতে তাও তো জানি না।”

ছোকরা নিজেও একটু চিন্তায় পড়ে গেলো। তারপর বললো, দুর্গা ঠাকুরের সঙ্গে মহিষাসুর দেখেছেন? কাটা মোষের মধ্যে থেকে বেরিয়ে মা দুর্গাকে লেঙ্গি দেবার চেষ্টা করছে—ওই রকম। বা আরও খারাপ।”

দোকান থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটবার পরে একটা চেনা মুখে দেখা হয়ে গেলো। সদানন্দবাবুর জামাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"আরে জগদীশবাবু নন? আপনাকে তো শ্বশুরবাড়িতেই দেখেছি।" পাড়ার জামাই মানে প্রায় নিজেরই জামাই। একটু খাতি করেই কথা বললেন সুধাকর।

জগদীশকে এর আগে পাঞ্জাবি, শান্তিপুরি ধুতি ও পাম্‌শু পর অবস্থায় শ্বশুরবাড়িতে দেখেছেন সুধাকর। এখন টী শার্ট, প্যান্ট ও চটি। শরীরটা শুকনো-শুকনো—বোধ হয় অনেকক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেছে

জগদীশের কাছে আশাপ্রদ খবর, "লক আউট উঠলো বলে কোম্পানির তেজ ফুরিয়ে আসছে, যদিও দালালরা বলছে, কতদিন লক-আউট চলবে কিছুই ঠিক নেই। ইউনিয়ন বার-বার বলছে দালালদে কথায় কান দেবেন না। তারা ঘোষণা করেছে, দরকার হলে আমরা শহরের সমস্ত পথ অবরোধ করবো, একটা রিকশা পর্যন্ত যেতে দেবে না কারখানার সামনে দিয়ে। দেখি মালিক মাথা নোয়ায় কিনা।"

সুধাকর ভাবলেন, একবার বলেন রাস্তা তো সুইডিশ ইনজিনীয়ারি কোম্পানীর নয়। রাস্তা বন্ধ করে নিজেদেরই অসুবিধে হবে, জিনিস-পত্তরের দাম আরও বেড়ে যাবে। নিজের নাক কেটে কেউ অপরের যাত্রা ভঙ্গ করে না। কিন্তু এসব কথা তুলে এখন লাভ নেই।

আরও কয়েক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। আজ সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং কারখানা বন্ধ হওয়ার পঞ্চাশ দিন পূর্তি।

বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা দলের সিকি-দুয়ানি নেতারা এসেছেন। অনেকক্ষণ বক্তৃতা হবে। দালালের মুখোশও খুলে নেওয়া হবে।

সদানন্দ মজুমদার সাইকেল নিয়ে গেটের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন.

নলেন কয়েকটা বক্তৃতা। লোকজন কিছু আছে, কিন্তু ভিড় যেন
।

শশধর সামন্ত পাশেই ছিলো। বললো, "ভিড় পাতলা হবেই
া। পাটনা, বক্তিয়ারপুর, আরা ডিসট্রিক্ট থেকে যারা দলে দলে
ইডিশ কোম্পানিতে কাজ করতে এসেছিল তারা আস্তে-আস্তে দেশে
লে যাওয়া শুরু করেছে।"

"এটা কী রকম কথা? যখন দলবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন তখন চলে
াওয়া?" সদানন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

শশধর বললো, "ব্রাদার আগে পেট, তারপর তো দল। ওরা
াত-ডাল-তরকারি বেশি খায় একটু—বউ ছেলেকে গাঁয়ে পাঠিয়ে
লে ক্ষতি নেই। অনেকের বউ-ছেলে তো সারা বছর ওখানেই থাকে
—এ-বছর বাড়তি একটু পুনর্মিলন হয়ে যাবে।"

"শশধর, তুমি বলছো ওদের টিকে থাকবার ক্ষমতা এখানকার
্থানীয় লোকদের থেকে অনেক বেশি?"

"সে সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ আছে, সদানন্দ? সর্বহারা যদি এখন
কউ থাকে, সে হলো আমি, তুমি, তোমার জামাই। আমরা ভাড়া
াড়িতে থাকি। আমাদের জমি নেই, জমা নেই। বিপদে পড়লে
মামাদের কোথাও যাবার জায়গাও নেই। কিন্তু খুব সাবধান,
জামাইয়ের সঙ্গেও এসব আলোচনায় নেমো না। ইউনিয়ন খবর পেলে
ালাল বানিয়ে দেবে। হাতের গোড়ায় মালিককে না পেয়ে এখন
বাই মরীয়া হয়ে দালাল খুঁজছে।"

সদানন্দ জানতে চাইলেন, "কতদিন এসব চলবে, শশধর?
াধারণ মানুষের পোস্টাপিস পাশ বইয়ে কত টাকা আর জমা থাকে?"

শশধর বললো, "আমি বেঁচে গেছি ভাই—জামাইটা গভরমেন্ট
আপিসে কাজ করে। আর যাই হোক সরকারী আপিসে লক-আউট
হয় না। মস্ত বড় ব্যাপার তো। ইচ্ছে হলেও গরমেন্ট একসঙ্গে অতো
তালাই জোগাড় করতে পারবে না।"

আগে মেয়ের বাড়িতে যাবার সময় মিষ্টি কিনতেন সদানন্দ। এখ একটু কাঁচা বাজার করেন। সাইকেলের দুই সাইডে দুটো থলে ঝুলি দেন, একটাতে নিজের বাড়ির বাজার, অন্যটায় মেয়ের। প্রথম দি জামাইয়ের বাড়িতে এইভাবে যেতে লজ্জা হচ্ছিল সদানন্দর। ভাগে জগদীশ বাড়িতে ছিল না।

মনু জীবনে এই প্রথম যেন বাবার কাছে লজ্জা পেলো—"তু এসব কেন আনতে গেলে বাবা?"

সদানন্দও এই প্রথম অভিনয় করলেন মেয়ের সঙ্গে "কিছু ভা আলু, পেঁয়াজ দেখলাম। চিন্তামণির কাছ থেকে পাল্লা দরে নিলে এক সুবিধে তাই তুলে নিলাম। অসুবিধে কিছু নেই, আমি তো আ মাইনে পেয়েছি।"

সদানন্দ লক্ষ্য করলেন, মেয়ের চোখ ছলছল করছে। চোখের জ চেপে রেখে সে বললো, "তুমি কিছু আনবে না বাবা। যে বিয়ে করে খাওয়ানো-পরানোর চিন্তা তার।"

সদানন্দ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। জামাইয়ের কোথ কী টাকড়ি আছে তা মেয়ে ভালভাবে জানে না।

পয়সার ব্যাপারে জগদীশ চুপচাপ থাকে, স্ত্রীর সঙ্গে কো আলোচনায় আসতে চায় না। কিন্তু সদানন্দ বুঝতে পারেন, একজ সাধারণ কর্মীর এই বাজারে কী আর্থিক সঙ্গতি থাকতে পারে?

জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে বেরিয়ে নতুন সংসার পাততে গিয়েও অনে খরচ হয়ে গিয়েছে। এর আবার শখ করে দুটো ফ্যান ভাড়া করলো- মাসে-মাসে ভাড়া গুনতে হয়। বাড়ি ভাড়াটাও একটু বেশি—ত অধৈর্য না হয়ে আর একটু খোঁজাখুঁজি করলে ভাল হতো। গো পঁচিশেক টাকা অন্তত প্রতি মাসে সাশ্রয় হতো।

সদানন্দ ভেবেছিলেন, নতুন একটা বাড়ি এবার খোঁজাখুঁ করবেন। কিন্তু শশধর ঠিক কথাই বলেছে, "মাথা ঠাণ্ডা রাখো সদানন যে লোকের কারখানায় তালা লাগানো তাকে কে বাড়ি ভাড়া দেবে

"তালা তো চিরকাল ঝুলবে না।" সদানন্দ তর্ক করতে গিয়েছেন।
শশধর উত্তর দিয়েছে, "ওসব কে বোঝে? স্ট্রাইক, লক-আউট
য়ে নগদই হলেন নারায়ণ! বাইরের লোকরা খারাপ সময়ের হিসেবটা
কটু লম্বা করে নেয়। কথায় বলে, না আঁচালে বিশ্বাস নেই!"

ম্যানিলা শহরের অসংখ্য টুরিস্ট হোটেল ও রেস্তোরাঁ-গাইডটা
ধাকর নন্দী মন দিয়ে দেখছিলেন।

এক ভদ্রলোক প্রতি বছর ফিলিপাইনস-এর হোটেলের রেটিং
কাশ করেন—কোন হোটেল উঠছে, কোন হোটেল নামছে তা বই
ড়ে বোঝা যায়। কোন রেস্তোরাঁয় কোন সুখাদ্য ও পানীয় পাওয়া
ায় তাও তালিকাভুক্ত।

সুধাকর লক্ষ্য করেছেন, দু-একটা অখ্যাত স্থানীয় ড্রিংকের নাম না
াকলে প্রমোদ উপন্যাসের পরিবেশটা ঝপ করে জমে ওঠে না। সেই
ঙ্গে প্রয়োজন হয় দু-একটি স্থানীয় মহিলার নাম।

এবার একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করবেন সুধাকর। একটি
ারতীয় বংশোদ্ভবা রমণীকে প্রবাসের আসরে নামাবেন। মেয়েটিকে
াঙালী করবেন, না গুজরাতী করবেন তা এখনও ঠিক করে উঠতে
ারেননি তিনি।

সুধাকর দেখাবেন। সস্তা হলেও মেয়েটি তার পূর্ব পুরুষদের দেশ
ম্পর্কে ভীষণ কৌতূহলী। তাহলে নাটকটা জমানো বেশ সহজ হবে—
ুরুষ ও নারী চরিত্র দুটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাছাকাছি চলে আসবে।

এই ধরুন, প্রথমেই একটি পানাগারের দৃশ্য। তার পরের দিনই
ায়কের হোটেলঘরে মেয়েটির সুপরিকল্পিত আবির্ভাব। বলতে পারেন,
াতোব্যস্ততার কী প্রয়োজন? আছে প্রয়োজন। গল্পের স্পিড রাখবার
ন্যে সুধাকর কখনও তাঁর প্রমোদ উপন্যাসের নায়ককে একই শহরে

আট দিনের বেশি রাখেন না। পাঠক-পাঠিকা এবং প্রকাশক জানেন। তাঁরা ধরে নেন, সুধাকর কিছুতেই তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না। যা ঘটবার তা তাড়াতাড়িই ঘটবে।

সুধাকরের হঠাৎ খেয়াল হলো, সদানন্দ, জগদীশ এবং সুইটি ইনজিনীয়ারিং-এর সবাই প্রত্যাশা করছিল সাত-আটদিনেই এক এসপার-ওসপার হয়ে যাবে, মালিকের দম বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দ সপ্তাহ হতে চললো, নাটকটা শেষ হওয়া তো দূরের কথা, পাকিয়ে উঠছে না।

এই সময়ে সদানন্দ মজুমদার বাড়িতে হাজির হলেন। বউয়ে সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে—মেয়েটার সাম্প্রতিক আর্থিক কষ্টের ব্যাপা সব দায়িত্বটাই স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন সদানন্দগৃহিণী।

সেই পুরনো কথা—অন্য যে-জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল সে নিজেই নষ্ট করেছেন সদানন্দ। বাঙ্গালোরে চাকরি অনেক পাকা, মে সারাক্ষণ চোখের সামনে না-থাকলেও সুখে থাকতো।

এইসব কথা ঘুণাক্ষরে মেয়ের কাছে গেলে কী হবে ভাবতে পা না সদানন্দ। সৌদামিনীর দ্বিতীয় বক্তব্য, যৌথ পরিবারের কথ যে-সংসার থেকে মন্টু বেরিয়ে এসেছে সেখানে সম্প্রতি ভাশুরের প্রমো হয়েছে. দেওর এখন মোটা মাইনে পাচ্ছে।

ওদের বাড়িভাড়া দিতে হয় না। ওরাও টি ভি আনিয়েছে বাড়িতে ফ্রিজ তো ছোট দেওরের বিয়ের সময়েই পাওয়া গিয়েছে।

এসব কথা সদানন্দকে শোনানোর অর্থ কী? অর্থ, ভাইদের ম তোমার জামাইয়েরই যে চাকরিটা খারাপ, সুতরাং ওরা মিলে মি থাকলে আমার লাভ ছিল তা তোমার মাথায় ঢুকলো না কেন?

সদানন্দ বিরক্ত হয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই আগবাড়িয়ে জামাইে যৌথ সংসারটা ভেঙে দেননি। পরিস্থিতি যা হয়েছিল তাতে এ ছা উপায় ছিল না।

কিন্তু সত্যবতীর ঘোষণা: পিঠে খেতে গেলে পিঠের কোঁ

শুনতে হয়।

এই পরিস্থিতিতে কে সত্যবতীকে মনে করিয়ে দেবে যে তিনি নিজেই স্বামীর কাছে রিপোর্ট করেছেন, মনু কাঁদতে-কাঁদতে বলেছে, একবেলা খাবে তবু ওই সংসারে সে থাকবে না।

গৃহিণী যেদিন এ-কথা স্বামীকে বলেছিলেন সেদিনই কাগজে শালিকিয়ায় গৃহবধূর আত্মহত্যার সংবাদ বেরিয়েছিল। তা পড়ে সদানন্দর রক্ত হিম।

সে ব্যাপারটা অনেক চেষ্টা করে সদানন্দ মনে করিয়ে দিলেন। কিন্তু ফল অন্য হলো।

সত্যবতী ফোঁস করে উঠলেন। "ছিঃ কুটুমের নিন্দে কোরো না। সোনার গয়নায় গা মুড়ে মেয়েকে তুমি শ্বশুরের সংসারে পাঠাওনি। তাঁরাও তোমার কাছে দফায় দফায় হীরে-জহরৎ দাবী করেননি। কুটুম হিসেবে তোমার যত্নআত্তি হয়তো হয়নি—কিন্তু মেয়েকে সম্প্রদান করে, কথায়-কথায় তার কাছে যাওয়ারই বা কী দরকার ছিল? সেই জন্যেই তো আগে জামাইয়ের বাড়িতে শ্বশুরের খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, যাতে বেশিক্ষণ সেখানে না-থাকতে হয়।"

সুধাকর একজন লেখক হিসেবে বোঝেন বর্তমান পরিস্থিতিতে এইরকম কথা কাটাকাটি হওয়াটাই স্বাভাবিক। মেয়েরা যখন অন্য কাউকে দোষী করতে পারে না তখন স্বামীর ওপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে হাল্কা করতে চায়। এ-দেশের সরলা গৃহবধূদের পক্ষে এইটাই তো স্বাভাবিক। সদানন্দও নিশ্চয় মনে-মনে ব্যাপারটা বোঝেন।

সদানন্দ ফিস ফিস করে বললেন, "আপনার কাছে কিছুই চেপে রাখি না। আর রাখলেও আপনার মতো দ্রষ্টার কাছে তা ধরা পড়ে যাবে।"

আজ মনুর বাড়িতে গিয়ে গরম লাগছিল সদানন্দর। কিছু খেয়াল না-করেই তিনি বলেছেন, ফ্যানটা একটু খুলে দে, মা।

অমনি মেয়ের চোখে জল নামলো। সদানন্দ জানালেন, "আমি

কিছু না-ভেবেই, না-দেখেই কথাটা বলেছি। এবার সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি ফ্যান নেই। আমি বুঝলাম ব্যাপারটা। বললুম, মন্তু এটা ভাল করেছিস। গরম তো গেলো বলে। শুধু মাসে-মাসে ফ্যানের ভাড়া গোনার মানে হয় না।

বললাম তো, কিন্তু মেয়ের চোখের জল আর থামে না। দুঃখ করলেন সদানন্দ।

সদানন্দ নিজের মনেই বলে চললেন, "যখন নতুন কোনো জিনিস ঘরে ঢোকে তখন বোঝা যায় না। কিন্তু সেই জিনিস অর্থের অভাবে ঘর থেকে বার করে দেবার সময় খুব মনে লাগে। আমি অসহায়ের মতন দেখছি, জামাইয়ের স্কুটার গিয়েছে, ফ্যানও গেলো।"

সদানন্দ দুঃখ করলেন, "কিন্তু গুগিলভি কোম্পানির সামান্য ওয়ার্কার হিসেবে আমারও দৌড় কতখানি তা তো আপনি বোঝেন। লজ্জার মাথা খেয়ে হাজারিকা সায়েবের কাছে ওভারটাইম ভিক্ষে চেয়েছি কিছু।

"সায়েব বলেছেন, 'দেখি'। হাজারিকা সায়েব একটু অবাকও হয়েছেন, যে সদানন্দ মজুমদার কোনোদিন ও-টি চায়নি সে ওভারটাইম চাইছে।"

সদানন্দ হাসলেন, "আমি লুকিয়ে রাখিনি কিছু। বলেছি জামাইটার এই অবস্থা, কিছু বাড়তি টাকা তো চাই।"

হাজারিকা সায়েব লোক খারাপ নন, সদানন্দকে ভালবাসেন। বললেন, চেষ্টা করবেন। "কিন্তু গুগিলভি কোম্পানির অবস্থাও তো বুঝছেন, বড় এক্সপোর্ট অর্ডার না থাকলে কীভাবে ওভারটাইম হবে?"

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, "সুধাকরবাবু, কিছু বুঝছেন? আপনি তো উঁচুতলার মানুষের সঙ্গে মেশেন। মন্তু আর তার মা তো কাঁটাপুকুর জানবাড়িতে গিয়েছিল। ওঁরা হাত দেখে বলেছেন, কষ্ট কমলো বলে। ওরা খুশি হয়েছে। কিন্তু আমি তো ভরসা পাচ্ছি না।"

সদানন্দ মনে করিয়ে দিলেন, "সেই সেবারে আপনি গল্প বললেন,

এক ভদ্রলোক হাত দেখাতে গিয়েছিলেন। হস্তরেখাবিদ্ বললেন, মাসখানেক কষ্ট, তারপর ভাল। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কষ্ট চলে যাবে? হস্তরেখাবিদ্ বললেন, চলে যাবে না, তবে কষ্ট ওদিনে সয়ে যাবে।”

খুব লজ্জা পেলেন সুধাকর। এরকম গল্প তাঁর না-করাই উচিত ছিল। মানুষকে বিপদের সময় নিরাশ করলে সে আরও ভেঙে পড়বে, বিপদ একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে চাপবে।

সদানন্দকে এখন কী বলবেন সুধাকর? “সরলের সঙ্গে কথা বলে, আপনাকে খুব আশা দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না, সদানন্দবাবু।”

“ইউনিয়নের নকুড়বাবু কিন্তু আমার জামাইকে বলেছে, মিটলো বলে, একদিন স্থানীয় বন্‌ধ ডাকলেই গভরমেন্টের টনক নড়বে. তখন মালিক বাপ-বাপ করে দরজা খুলবে এবং লক আউট পিরিয়ডের পুরো মাইনে পর্যন্ত দেবে।”

নকুড়বাবু যা বলছেন, তাই যেন সত্যি হয়। কিন্তু সরল চ্যাটার্জি অন্য কথা বলেছেন সুধাকরকে।

সরলের ধারণা “হাজার রকম রোগে ধরেছে এই সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং কারখানায়। লক আউট একটা সিম্বল মাত্র। এদিকে-ওদিকে শ্রমিকদের দুর্বিনীত ব্যবহার ছিল, সামান্য কোথাও গো-স্লো ছিল, তারই প্রতিবিধানের জন্যে লক আউট নয় ওই সব ছোটখাট সমস্যার সমাধান হলেই ফ্যাক্টরি খুলছে না। ম্যানেজমেন্টও দীর্ঘ দাবি-সনদ উপস্থিত করবে। ক্রমবর্ধমান মাইনে অথচ ক্রমশ কম খাটুনির বিলাসিতা আর মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না।”

“ম্যানেজমেন্ট নিজেই ইউনিয়নের কাছে চার্টার-অফ-ডিমাণ্ড দেবে?” এমন কথা সদানন্দ মজুমদার কখনও শোনেননি।

সুধাকর জানালেন, “সরল চ্যাটার্জি যে কী ভাবছে তা বলা শক্ত। নামমাত্র প্রোডাকশনের পরিবর্তে অঢেল টাকায় শ্রমশক্তি কেনার

সামর্থ্য নাকি এ-দেশের কোম্পানিগুলোর ক্রমশই কমে যাচ্ছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষের ধারণা কারখানায় অজস্র লোকের কোনো কাজকর্ম নেই। যা একজনে করা যায় তা দীর্ঘদিনের বদ অভ্যাসে ওরা তিন জনে করছে। কোথাও-কোথাও আধডজন লোক জটলা পাকাচ্ছে। কাজ নেই, কিন্তু মাইনে পুরো রয়েছে। নতুন কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে—কারখানায় টেকনলজি পাল্টাচ্ছে, যন্ত্রপাতি পাল্টাচ্ছে, প্রোডাক্ট পাল্টাচ্ছে, মালের বাজার পাল্টাচ্ছে, শুধু সময়ের সঙ্গে পাল্টাতে রাজি নয় সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং-এর ধোপাপাড়া কারখানার কর্মীরা। তাঁরা নতুন কিছু করবেন না। মাইনে এবং ভাতা ছাড়া অন্য কিছুই পরিবর্তিত হতে দেবেন না ইউনিয়নের নেতারা।”

“তা হলে কী দাঁড়াবে?” সদানন্দ বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

“চিকিৎসা সফল হতে সময় লাগবে বলে মনে করছে সরল চ্যাটার্জি। প্রথমেই ম্যানেজমেন্টের দাবিগুলোর ফয়সালা প্রয়োজন। ওর ধারণা, শ্রমিকদের অনেক অন্যায় অভ্যাস কারখানায় অকারণে মেনে নেওয়া হয়েছে।”

সদানন্দ ফোঁস করে উঠলেন। “অন্যায় তো রাতারাতি হয়নি। অনেকদিন ধরে মালিকও তো ঐসব ব্যবস্থা মেনে চলেছেন, শুধু ওয়ার্কারদের দোষ দিয়ে কী লাভ?”

চুপ করে রইলেন সুধাকর। বললেন, “লেখক হিসেবে পিতা-পুত্র, প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বুঝি। ওদের সম্পর্কে জোর করে দুটো কথা বলতেও পারি। কিন্তু এই শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটা আমার কাছে দুর্বোধ্য, সদানন্দবাবু। ভাই-ভাই? শত্রু-মিত্র? খাদ্য-খাদক? না মেড-ফর-ইচ-আদার? শ্রমিক ও মালিককে আমরা কোন ভূমিকায় দেখতে চাই তা যদি পরিষ্কারভাবে জানতে পারতাম তাহলে ব্যাপারটা অনেকসহজহয়ে উঠতো।”

সদানন্দর গলার স্বর নরম হয়ে এলো। সুধাকরকে বললেন,

"আমি শিক্ষিত লোক নই। তবে বুঝি, দু'জনের দু'জনকে না-হলে চলে না। হাজারিকা সায়েবের লেবার চাই, আর আমারও মাইনে চাই। কী অবস্থা বলুন তো, জামাইটা কতদিন ধরে এই রকম ত্রিশঙ্কুর মতন ঝুলে থাকবে?"

সুধাকর বললেন, "এবারে আমি সরল চ্যাটার্জির পেট থেকে কথা বার করবার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। পুরো জিনিসটাও ওর হাতে রয়েছে মনে হলো না। কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর আছে। তাঁরাই কোম্পানির হর্তা-কর্তা-বিধাতা।"

"সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং-এর ধোপাপাড়া কারখানা তিন বছর ধরে কত টাকা লোকসান করেছে জানো?" সরল চ্যাটার্জি তাঁর বাল্যবন্ধুকে বলেছিলেন, "এই হারে চললে এ বছরে লোকসান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই?"

সুধাকর বলেছিলেন, "এই যে শুনি তোমাদের সুইডিশ কোম্পানি এদেশের সেরা? তোমাদের লাভ হয় অনেক, আমি হাজরা কাফেতে ইউনিয়নের নেতাদের মুখে শুনেছি।"

সরল উত্তর দিয়েছে, "হ্যাঁ, চারটে কারখানা মিলিয়ে সুইডিশ কোম্পানির সামান্য কিছু লাভ হয়েছে। তার কারণ ভারতের অন্যত্র তিনটে কারখানায় খুব লাভ হয়েছে, আর ধোপাপাড়ার লোকসান তার সবটাই খেয়ে নিয়েছে। কোনোরকমে লাল দাগের ওপরে টিকে রয়েছে সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং। কিন্তু চিরকাল অন্য জায়গার লাভ থেকে এখানকার লোকসান মেটানো হবে যারা ভেবেছে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।"

সুধাকর প্রশ্ন করলেন, "সদানন্দবাবু, দু-পক্ষই যখন তেতে রয়েছে তখন হুট করে কোনো সুফল হবে কি?"

"মানুষ নিজেদের ঝগড়াঝাটি তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নেয় না কেন, সুধাকরবাবু?" সদানন্দ গভীর দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি খুব দামী কথা বলেছেন, সদানন্দবাবু। সময় নিয়ে

অনেকেই এই পৃথিবীতে খেলতে চায়। আইনে তো বলে, বিচারে খুব দেরি হওয়ার অর্থ বিচার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা। সামান্য সময়ের জন্য মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে। সুতরাং সময়ই সব। সায়েবরা লিখে গিয়েছে, টাইম ইজ মানি, সময়ই টাকা। এদেশে চিন্তানায়ক দার্শনিক সায়েবরা এলে নিশ্চয় লিখতেন, সময়ই মান-সম্মান, সময়ই প্রাণ। সময় শেষ হয়ে গেলে আমরা তো কেউ এখানে থাকবো না।”

সদানন্দ দুঃখ করলেন, “সময়কে কেউই সম্মান করছে না, অথচ সবাই সময়ের নাম করে ঝগড়ায় নামছে, সুধাকরবাবু। দেখুন, যারা বাড়তি সময় কাজ না-করে ওভারটাইম চায় তাদের আমি সৎলোক বলে মনে করি না। আবার, আমার জামাইয়ের কোম্পানিতে মানুষ সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলছে না এই অভিযোগ তুলে সায়েবরা সময় অপচয় করছেন। কারখানাটা বন্ধ রেখেছেন। আমার মেয়ে, নাতনী, এই ধোপাপাড়ার হাজার-হাজার নাবালক ছেলেমেয়ে—এরা তো কোনো অন্যায় করে নি।”

সদানন্দর কাছেই সুধাকর শুনলেন, শহরের চারদিকে হাহাকার উঠেছে। শুধু শ্রমিকরা মার খাচ্ছে তা নয়, স্থানীয় দোকানদাররাও মাছি তাড়াচ্ছে। বিক্রিবাটা খুব কমে গিয়েছে।

সবচেয়ে মার খাচ্ছে এখানকার স্থানীয় লোকরা। তাদের জমানো টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে। ধার বন্ধ।

কারখানার বাস ড্রাইভার রণদেও সিং-এর সঙ্গে দেখা হলো। সে জগদীশের বন্ধু। সে কিন্তু জগদীশকে ভাঁড়ে চা খাইয়ে দিয়েছে। রণদেও সুযোগ বুঝে ট্যাক্সি চালাতে শুরু করেছে দৈনিক পেমেন্টে।

ট্যাক্সির সামনের সিটে চড়িয়ে সে জগদীশকে ডালহৌসি স্কোয়ার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। বলেছে, “আমাদের পাড়ায় কেউ আর ট্যাক্সি চড়ে না। আমাকে বড়বাজারে এসে বউনি করতে হয়। বেঁচে থাক আমার ড্রাইভিং 'লাইসেন'—কোম্পানির বাবা আমার প্যান্ট খুলে নিতে পারবে না।”

জগদীশ জিজ্ঞেস করেছে, "যখন লক-আউট উঠে যাবে তখন তুমি কী করবে।"

রণদেও উত্তর দিয়েছে, "আবার কোম্পানিতে ফিরে যাবে, ট্যাক্সি জমা দিয়ে। সুইডিশ কোম্পানিতে কাজ করায় অনেক ইজ্জত। ট্যাক্সি ড্রাইভারের কোনো সম্মান নেই, অথচ মেয়ে বলছিল — ভুল করে ওকে ইংরিজি স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়েছি — বাঙালীদের সঙ্গে মিশে-মিশে ওর স্বভাব খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

আজ এখানে বন্ধ পালন করা হচ্ছে। আনন্দময়ী লাইট ও সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং-এ, পাটকল থেকে আরম্ভ করে রেস্তোরাঁর দোকান-পাট পর্যন্ত সব বন্ধ।

একজন শুধু অনুমতি পেয়েছে, তাই, নির্ধারিত সময় থেকে খোলা থাকবে 'হাজরা কাফে'।

হাজরা কাফের মালিক নকুড়বাবু ও ইউনিয়নের কর্তাদের প্রশ্রয় পাবেন বলে চলেন। অতীতে ওয়াকারদের ওপর নির্ভর করে দোকান চালাতে অনেকদিন তাঁকেও লালবাতি জ্বালাতে হতো। এখন শ্রমিকরা কেউ বাইরে চা খায় না।

হাজরা কাফের মালিক অশ্বিনী মা সিদ্ধেশ্বরীকে মনে মনে ধন্যবাদ দেন। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তাঁর দোকানে বিক্রি বেড়েছে। চায়ের বিক্রি একটু কম, কিন্তু টোস্ট, ওমলেট এবং মোগলাই পরোটা ভাল কাটছে—কারণ সারাদিন ধরেই সংগ্রাম কমিটির নানা গোপন ও প্রকাশ্য মিটিং চলেছে।

হাজরা কাফেতে এখন কিছু-কিছু 'ফুল-মিল'ও তৈরি হচ্ছে, কারণ নকুড়বাবুর সহকারীরা অনেকেই বাড়ি ফিরতে পারেন না।

তবে নকুড়বাবু ও তাঁর দু'জন সেক্রেটারির সইকরা চিরকুট ছাড়া

কাউকে পুরো মিল দেওয়া হয় না।

হাজরাবাবুর আর্জি মেনে নিয়েছেন নকুড়বাবু—দিনের শেষে নগদে সব মিটিয়ে দেওয়া হয়।

নকুড়বাবু নিজে হাজরাবাবুকে আশ্বস্ত করেছেন, "দশ বছর কারখানা বন্ধ থাকলেও চপ কাটলেটের টাকা আপনার বাকি পড়বে না, এই গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি। শুধু দেখবেন যেন আজে-বাজে লোক আমাদের অ্যাকাউণ্টে বিনাপয়সায় খেয়ে না যায়। আর আপনি কার্পণ্য করবেন না, ভাল সাইজের চিংড়ি এবং বেস্ট কোয়ালিটির চিকেন বাজার থেকে কিনবেন।"

হাজরা কাফের আরও কয়েকটি খদ্দের বেড়েছে। এরা পুলিশের টিকটিকি। রোজ দোকানে এসে ঘুরঘুর করে।

মালিক হাত জোড় করে বলে দিয়েছেন, "আপনারা অতিথি, চায়ের দাম নিতে পারবো না। তবে দোহাই আপনাদের, খবর চাইবেন না আমার কাছে। এই তো আমার শরীর দেখছেন। নেতারা প্যাঁদালে পাঁচ মিনিটের মধ্যে হার্ট ফেল করবো। যা খবর আপনারা নিতে চান তা সোজাসুজি নেতাদের কাছে নিন।"

সদানন্দ মজুমদারের সাইকেল ওই হাজরা কাফের কাছেই ওরা আটকে দিলো।

টিটকিরি হলো, "দাদু, লজ্জা করে না! সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং বন্‌ধ্, আর আপনি সুপুরি চিবোতে-চিবোতে নিজের কাজে যাচ্ছেন। কোন্ কারখানায় ম্যানেজিং ডিরেকটরের কাজ করেন?"

ভীষণ বিরক্তি ধরলো সদানন্দর। এই সব অর্বাচীনের সঙ্গে তর্ক করেই বা কী লাভ?

অথচ হাজারিকা সায়েব আজ সদানন্দকে একটু ওভারটাইমের আশা দিয়েছিলেন। সদানন্দ একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন, "লজ্জা করে না তোমাদের? তোমাদের কারখানার লোকদের সংসার চলছে

কী করে খোঁজ রাখো ?"

একজন হঠাৎ বললো, "সাইকেলের হাওয়া খুলে নে।"

কিন্তু এক ভদ্রলোক বোধহয় চিনতে পারলেন জগদীশ লাহিড়ির শ্বশুরকে। বললেন, "বাড়ি ফিরে যান, দাদা। আপনার জামাইও তো লক আউটে পড়েছে। তার মুখ চেয়ে অন্তত বন্ধ্ পালন করুন।"

সদানন্দ এর পরে অসহায় অবস্থায় মেয়ের বাড়ির দিকে সাইকেল ঘোরালেন।

মনুর কাছে যেতে খুব কষ্ট হয়। মেয়েটা এই ক'সপ্তাহে শুকিয়ে গিয়েছে। সদানন্দ ভেবেছিলেন, একবার জিজ্ঞেস করবেন, শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর নিয়েছিল কিনা ? কিন্তু জিগ্যেস করতে পারলেন না। মনু ভীষণ অভিমানিনী। সদানন্দ জানেন, মনু না খেয়ে থাকলেও নিজের সম্মান নষ্ট করবে না।

ওভারটাইম করে যখন যতটা পেয়েছেন সবটাই জিনিসপত্তর কিনে মনুকে দিয়ে গিয়েছেন সদানন্দ। তাও তো চুপি চুপি থলেটা এক জায়গায় রেখে সদানন্দ সরে পড়েন। যাতে মনুর সঙ্গে চোখাচোখি না হয়।

মনুর চোখটা আজ লাল। না দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। মনু কাল বহু রাত পর্যন্ত টিভি দেখেছে। কী সব অনুষ্ঠান বিদেশ থেকে সরাসরি প্রচার হওয়ার কথা ছিল। ইংরিজী না-বুঝলেও মনু অনুষ্ঠান দেখেছে, এক মুহূর্ত বাদ দেয়নি।

সদানন্দ হঠাৎ দেখলেন মনুর আদরের টি-ভির জায়গাটা খালি। বুকটা ছাঁত করে উঠলো।

ওই সেটটা নিয়ে মনুর খুব গর্ব ছিল। বলতো, "বাবা এতো সুন্দর ছবি খুব কম সেটে আসে। এক এক সময় মনে হয় যে-গাইছে সে আমার ঘরেই বসে আছে। অনেক টি-ভি দেখলে মনে হবে তোমার চোখে ছানি পড়েছে—একটা কাপড়ের আড়াল থেকে তুমি অস্পষ্ট দেখছো।"

বলাবাহুল্য, মনু নিজেই নির্বাচন করেছিল কোন কোম্পানির

টি-ভি কিনবে। দোকানদার বলেছিল, "আমার কাছে সব সমান, আপনি যেটা ইচ্ছে নিতে পারেন।"

সদানন্দ আন্দাজ করছেন, তাঁর আদরের মেয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতখানি পারে টি-ভি দেখে নিয়েছে। স্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছেন সদানন্দ, কিস্তির টাকা নিয়ে ভীষণ গোলমাল হচ্ছিল।

কিস্তি না দিলে টি-ভি তো বাজেয়াপ্ত হবেই, সেই সঙ্গে মামলা। অনেক সুদও গুনতে হবে। জগদীশ চেষ্টা করেছিল, কেউ যদি টিভিটা নিয়ে কিস্তিটা নিয়মিত দিয়ে যায়। প্রথম যে টাকা থোক টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং কয়েকটা কিস্তি যা দেওয়া হয়েছে সেসব জলে গেলো, কিন্তু মামলার হাত থেকে বাঁচা গেলো। টি-ভির দোকানদার রাজি, যদি ভাল পার্টি পাওয়া যায়। কিন্তু সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং-এর কর্মী হলে চলবে না। দোকানদারের নাকি যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।

ধোপাপাড়ায় একজন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেয়ারাকে পাওয়া গিয়েছে। সে নিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু তাল বুঝে কোপ মেরেছে। জগদশী বলেছিল, "প্রথমে অনেকগুলো টাকা ঢেলেছি, একেবারে ব্র্যাণ্ড নিউ জিনিস। কিছু টাকা অন্তত আমাকে দিন। লোকটা বলেছে, তাহলে দরকার নেই। তার বউ নাকি এমনিতেই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড জিনিসপত্তর পছন্দ করে না।"

আজ সকালে স্রেফ কিস্তির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে একটা রিকশ চড়ে জগদীশ টি-ভি নিয়ে দোকানে গিয়েছে। কাগজে লেখালেখি ওখানেই হবে, তারপর টি-ভি চলে যাবে নতুন মালিকের ঘরে।

"সময় ভাল হলে আবার টি-ভি হবে, কী বলো বাবা?" মনু শান্তভাবে বাবার কথাটাই যেন বাবাকে শুনিয়ে দিয়েছে।

"নিশ্চয় হবে। ততদিনে, হয়তো রঙিন টি-ভির দামও কমে যাবে। এখন কালো-শাদা টিভি কেনা বোকামি।"

"তা ছাড়া বাবা, ও বলছিল, টি-ভির ছবি মাঝে-মাঝে কেমন ফ্যাসফেসে হয়ে যেতো, আলো কম-কম লাগতো। হয়তো সেটটা

কিছুদিন পরে খারাপই হয়ে যেতো।”

“নিশ্চয়ই তাই, না হলে জগদীশ বলবে কেন?”

মন্নু শুনলো না, বাবাকে এক কাপ চা করে দিলো। বাবা না-না করছিলেন। কিন্তু মন্নু হঠাৎ মুখের ওপর বললো, “এ-চা তো তুমিই কিনে এনে দিয়েছো, বাবা।”

বাবা ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেলেন। “কাজকর্ম না থাকলে চায়ের খরচ বেড়ে যায়, তুই দেখবি।”

“ও অনেক বোঝে বাবা। এখন আমার কাছে সকালে এক কাপ এবং বিকেলে এক কাপ ছাড়া চা চায় না। দুধ তো নেই।”

খুব লজ্জা হলো সদানন্দর। এবারে বাজারের সময় একটু মিল্ক-পাউডার এবং একটু চিনি এনে দেওয়া উচিত ছিল—কাউকে শুধু চায়ের গুঁড়ো কিনে দেওয়ার মানে হয় না।

“মন্নু, তুই কাছে আয়, বোস।” মন্নুর স্বাস্থ্যটা কত খারাপ হয়েছে সদানন্দ নিজের চোখে আর একবার যাচাই করতে চান।

বাড়িতে যে সামান্য দুধ আসে সেটা মন্নুকে রোজ খাইয়ে যেতে পারলে কী রকম হতো?

কোনো অসুবিধে নেই, সদানন্দ রোজ কারখানায় যাবার পথে দু'মিনিট থেমে কাজটা সারতে পারতেন। কিন্তু সত্যবতী বলেছেন, “পাগলামি কোরো না। বিয়ে হয়ে-যাওয়া মেয়েদের কতকগুলো নিয়ম-কানুন আছে। তুমি চিৎকার করছো, আমার মেয়ে আমি কেন তাকে দুধ খাওয়াতে পারবো না? কিন্তু মনে রেখো, মেয়ে এখন তোমার নয়। সে অন্যের হয়ে গিয়েছে। তার স্বামী রয়েছে, সন্তান রয়েছে।”

সদানন্দ বিরক্তিভরা কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, “আমার মেয়ের শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে স্বামী-সন্তান কে দেখবে?”

সত্যবতী স্বামীকে পাত্তা দেননি। মুখ ঝামটা দিয়েছেন, “যা জানো না সে সম্বন্ধে কথা বোলো না।”

মন্নু নিশ্চিত যে তার শরীর শীর্ণ হয়নি। “বাবা, তোমার স

সময় ভয় মন্নু রোগা হয়ে যাচ্ছে। তুমি জানো না, বেশী মোটা হওয়াটা মেয়েদের পক্ষে ভাল নয়!"

মেয়ের কথা বিশ্বাস করার চেষ্টা করলেন সদানন্দ। আসলে, ভাল সাবান, ভাল স্নো, ভাল পাউডারও মেয়েদের কিছুটা সুন্দর করে তোলে। বোনাস পেলে সদানন্দ কোনো কথা শুনবেন না, মেয়েকে ওসব কিনে দেবেন। অন্য দেশের মানুষরা দুঃখকে চেপে রাখতে জানে, আমরা পারি না। তাই মন্নুকে ওইরকম মনে হচ্ছে।

মন্নু বললো, "সিং, পাণ্ডে, চতুর্বেদি এরা ততটা বিপদে পড়েনি, বাবা। বাইরে কিছু কাজকর্ম ধরে ওরা সামলে নিচ্ছে। সবচেয়ে বিপদে পড়েছে দাশবাবু, ঘোষবাবু ও ওর কয়েকজন প্রাণের বন্ধু।"

সদানন্দ অসহায়ভাবে শুনে যাচ্ছেন। মন্নু বললো, "তবে একজন সাহস দেখাচ্ছে বাবা। তুমি চাঁদুদাকে চেনো তো?"

"চন্দ্রনাথ দাস? দাঁয়েদের বাজারের কাছে থাকে? আগে তো ছুতোরপাড়ায় ছিল—খুব চিনি।"

মন্নু বললো, চাঁদুদাকে আমি তারিফ করি। "বসে থেকে-থেকে এবং দেনা বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বিরক্ত হয়ে-হয়ে চাঁদুদা এবার সাহস দেখিয়েছে। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ছিল তিনশ টাকার—সেটা ভাঙিয়ে চাঁদুদা বিজনেসে নেমেছে।"

তিনশ টাকায় আজকাল কী ব্যবসা-বাণিজ্য হতে পারে সদানন্দ বুঝতে পারেন না। দোকানঘরের সেলামিই লেগে যাবে কয়েক হাজার টাকা। তার ওপর দোকান সাজাবার খরচ রয়েছে।

মন্নু বললো, "সবাই লাখ-লাখ টাকা পকেটে নিয়ে ব্যবসায় নামে না, বাবা। তুমি তো ওই পাঞ্জাব স্যাণ্ডাল হাউসের সর্দারজীকে চেনো। পঁচিশ টাকা মূলধন নিয়ে রাস্তায় বসেছিল, এখন বাড়ি কিনেছে। ঝকঝকে দোকান করেছে তিনখানা। শুনছি জুতো আবার বাইরে রপ্তানি করবে। হয়তো প্রত্যেক মাসে সর্দারজীকে বিলেত-আমেরিকা যেতে হবে।"

সদানন্দ খবর পেলেন, চাঁদু ছেলেটিও প্লাসটিক ও রবারের চটি নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছে। সব শুনে সদানন্দ তারিফ করেছেন, "দোষটা কী? ওর বাবা ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন বলে চাঁদু রবারের জুতোর ব্যবসা করতে পারবে না?"

সেইদিন বাড়ি ফেরবার পথে বাজারের মোড়ে চাঁদুকে রাস্তায় দেখতে পেলেন সদানন্দ।

একটা সাইকেল-ঠেলার ওপর কতকগুলো ফোম রবারের চটি সাজিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে চাঁদু।

"বেশ ভাল কাজ করেছো, চাঁদু। বাহাদুর ছেলে তুমি," উৎসাহ দিলেন সদানন্দ।

কিন্তু চাঁদুর সঙ্কোচ যেন কাটছে না। যদিও সাহস করে সে মুখ খুললো, "আমার স্ত্রী বললো, মনে সাহস আনো। ব্রেক সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কারখানায় চাকরি করার জন্যে তো ভগবান তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাননি। ওই কারখানায় কাজ না করেও তো কলকাতা শহরে কত লোক সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছে।"

"বাঃ, চমৎকার কথা বলেছেন বউমা। ব্যবসা একটু দাঁড়ালে বউমাকে একটা গয়না গড়িয়ে দিও।"

হাসলো চাঁদু। "কিন্তু বাজারটা কিছু বুঝতে পারছি না, মেসোমশাই। মারো গুলি প্রেস্টিজে, ইজ্জতে আমি পেচ্ছাপ করে দিই। কিন্তু জুতো বিক্রি তো হওয়া চাই।"

সদানন্দ শুনে যাচ্ছেন। চাঁদু বলছে, "বাড়িতে সবাই আজকাল বোধহয় খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়, মেসোমশাই। সস্তা রবারের চটি কেনবার পয়সাও নেই এ অঞ্চলে। যাদের পয়সা আছে তারা কেনা-কাটার জন্যে কলকাতায় চলে যায়—বোঝে না এখানে কলকাতা থেকে সস্তাদরে জিনিস পাওয়া যায়।"

সদানন্দ মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন, এ অঞ্চলটা ক্রমশ যেন মরা কারখানার কবরখানা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কত কলকারখানা যে

মনিবের দোষে, না হয় শ্রমিকের গোঁসায়, না-হয় খদ্দেরের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে তার হিসেব নেই। অথচ এই সেদিনও জায়গাটা রমরম করতো।

বাড়ি ফিরে এসেও সদানন্দ রবারের চটির কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সদানন্দ। চাঁদু ছেলেটি তাঁর অনেকদিনের চেনাশোনা। সে সদানন্দকে বললো, "ঠিক মতন মাল বেচা-কেনা করতে পারলে লাভ খারাপ নয়, মেসোমশাই। লোককে না-ঠকিয়েও টু-পাইস কামানো যায়। আমি ঠিক করেছি, হুড়মুড় করে বিক্রি আরম্ভ হলেও আমি জুতোর জন্যে ন্যায্য দাম নেবো। খারাপ জিনিসও আমি বেচবো না। বেনটিংক স্ট্রীটের হোলসেল বাজার তু'নম্বরী মালে বোঝাই। নকল মাল কিনলে আমার লাভ বেশী, কিন্তু খদ্দের আখেরে ঠকবে। ওই জুতো তো বেশীদিন টিকবে না।"

সদানন্দ আন্দাজ করলেন, চাঁদুর বড়লোক হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। ঠিক সেই সময় মনু ও জগদীশের কথা মনে পড়ে গেলো। জগদীশ নিজেও যদি হাত গুটিয়ে কারখানার গেট খুলবার জন্যে তীর্থকাকের মতন বসে না-থেকে কিছু একটা ব্যবসায় নেমে পড়তে পারে। চাঁদু তো দেখিয়ে দিয়েছে সামান্য পয়সাতেও ব্যবসা শুরু করা যায়। বাড়িতে পরার জন্যে তাঁরও একজোড়া চটি ছিল, স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গিয়েছে।

সদানন্দ ঠিক করে ফেললেন, যখন চটি কিনবেন তখন অবশ্যই চাঁদুর কাছ থেকে কিনবেন। কিন্তু কবে যে চটি কিনতে পারবেন তা এখনই বলতে পারছেন না। মনুর এরকম বিপদ না-হলে সামান্য এক জোড়া চটি কেনার জন্যে এতো ভাবতে হতো না।

সুধাকর নন্দীর কাছেও চটির প্রসঙ্গ উঠলো। তিনি বললেন, "এইটাই তো ভারতবর্ষের আশ্চর্য ব্যাপার। খালি পা-ও আছে, দোকানেও চটিও আছে। তবু চটি বিক্রি হচ্ছে না। ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোককে একজোড়া চটি দিতে হলে আশি কোটি জোড়া চটি ফুড়ুত করে বিক্রি হয়ে যাবে। কিন্তু লক-আউটের জাঁতাকলে পড়া ঠাকুর আজ এক জোড়া চটিও বিক্রি হয়নি। লোকে দর-দস্তুরও করছে না।"

সুধাকরের কাছে আজ খারাপ খবর আছে। "সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং কোম্পানি বোধ হয় কারখানার লোক কমাতে চায়। সাত-আটশ লোক না বিদায় নেওয়া পর্যন্ত কারখানার তালা খোলার কোনো সম্ভাবনাই বোধ হয় নেই।"

"এই যে ওরা বললো শ্রমিক অশান্তির জন্যে কোম্পানি লক-আউট করেছে। শ্রমিকরা মন দিয়ে কাজ করতে চাইলে শুধু-শুধু কেন লক-আউট থাকবে?" প্রশ্ন করলেন সদানন্দ।

সুধাকর বললেন, "এসব কিছুই আমি বুঝতে পারি না, সদানন্দবাবু। যখন কারখানা বন্ধ হয়েছিল তখন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন জুগিয়েছিল কিছু কর্মী—এখন মালিক চাইছে···।"

"ছাঁটাই?" বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সদানন্দ।

"ওইসব নোংরা কথা আমার ক্লাশ ফ্রেণ্ড সরল চ্যাটার্জি মুখে আনে না। 'র‍্যাশনালাইজেশন' না কি একটা শব্দ ওরা এই অবস্থায় ব্যবহার করে, অর্থাৎ যে কর্মী সংখ্যাটা যুক্তিসঙ্গত।"

সদানন্দ অত ইংরিজি বোঝেন না। "কাজকর্ম না-থাকলে এতো মানুষের হবে কী? দলে-দলে এরা যাবে কোথায়?" শরীরটা শির-শির করে উঠলো সদানন্দর।

সদানন্দ বললেন, "ম্যানেজমেন্ট যাই করুক, তাড়াতাড়ি একটা

সিদ্ধান্ত নিয়ে কারখানা খুলছে না কেন ?"

"এই রাজ্যে নাকি কোনো সিদ্ধান্ত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় না, আমার বন্ধু সরল চ্যাটার্জির মতে। এখানে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দশ গুণ সময় লাগে—লক আউটেও নাকি তাই। তাছাড়া কোম্পানির নাকি ক্যাশ টাকা পয়সার অভাব। কারখানা চালু থাকলে যত লোকসান, কারখানা বন্ধ রাখলে তার থেকে বোধ হয় কম লোকসান—ছোট-ছোট ক্যালকুলেটর নিয়ে বড়-বড় আপিসের সায়েবরা আজকাল যে কীসব আজব অঙ্ক কষেন তা সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকা অসম্ভব।"

সুধাকর তারপর সদানন্দর মুখে মনোরমার টি-ভি সেট চলে যাবার ব্যাপারটা শুনলেন। সেটটা বড়ো প্রিয় ছিল সবার। ইস্কুলে প্রভাত মুখার্জির আদরিণী বলে এক হাতির মধ্যবিত্ত সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার দুঃখময় গল্প পড়েছিলেন সুধাকর। এখন যত বড় উকিলই হোক কেউ হাতি কেনে না, কিন্তু টিভি সেট প্রতি সংসারের প্রিয় গৃহপালিত "সভ্য" হয়ে উঠেছে।

চাঁদুর ব্যবসায়িক অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারটাও সুধাকর বিস্তারিত ভাবে শুনে নিয়েছেন। ভাবছেন, কয়েক দিনের মধ্যে একটা চটি কিনবেন চন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

মানুষটাকে কাছ থেকে দেখা যাবে। কারখানার শ্রমিকও তাহলে ছোট ব্যবসায়ী হওয়াকে সামাজিক অধঃপতন বলে মনে করে। চাঁদু যদি তার বিদ্রোহে সফল হয় তা হলে সদানন্দর জামাইয়ের পক্ষে নিশ্চয় ভাল হবে।

জগদীশ সম্পর্কে সদানন্দ যে কী করবেন ভেবেই উঠতে পারছেন না। এই সময় যদি নিজের যৌথ পরিবার ভেঙে চলে না আসতো তাহলে এতো অনিশ্চয়তা থাকতো না। কষ্ট হতো, অর্থাভাবে সংসারে একটু প্রতিপত্তিও কমতো, কিন্তু বাড়িভাড়ার টাকা জোগাড় করা, বাজার করা, রেশন তোলা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো কোনো রকমে

চলে যেতো।

তাঁর প্রতিবেশীকে সুধাকর বলেছেন, "আপনার ওই সব চিন্তা ছাড়ুন। আপনি না চাইলেও মেয়ে-জামাই সংসার থেকে নিশ্চয় বেরিয়ে আসতো। আপনি তো শুধু ভাড়া বাড়িটা খুঁজে দিয়েছেন এবং মেয়ের নতুন সংসার গুছিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন।"

সদানন্দও কথাগুলো বিশ্বাস করবার চেষ্টা চালালেন। কিন্তু কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে।

"ওসব কথা ছাড়ুন। আপনার কারখানার খবর কি বলুন।"

"ভগবানের দয়ায় ওগিলভিতে এখনও স্ট্রাইক কিংবা লক-আউট নেই। তবে কোম্পানির বাড়ও নেই—রটারডামে কিছু মাল যাচ্ছে, তবে হুড়মুড় করে নয়। এরা খুব সাবধানী মালিক, হৈহৈ করে বাড়তে চায় না। ক'দিন আগে সহকর্মী পরমেশ্বর সিং মদ খেয়ে-খেয়ে অকালে মারা গেলো। আরও কয়েক বছর সার্ভিস ছিল। চারটে-পাঁচটা ছেলে।"

সুধাকরকে পরমেশ্বরের পরিবার সম্বন্ধে ভাবতে হলো না। সদানন্দই জানালেন, কোম্পানি দয়াপরবশ হয়ে বড় ছেলেটাকে নিয়েছে চাকরিতে।

ইউনিয়ন এই নিয়মটাই পাকাপাকি করতে চায়। ওয়ান-ফর-ওয়ান। ব্যাপারটা সুধাকর জেনে নিলেন। একজন কাজ থেকে চলে গেলে তার পরিবারের একজনকে নেওয়া।

"তা হলে তো বাইরে থেকে কোনো রিক্রুটমেন্ট হবে না।"

"সে সব পরে ভাবা যাবে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"

সদানন্দ এবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নতুন বইটা কেমন এগোচ্ছে? আমি কারখানায় যাকেই জিজ্ঞেস করছি ম্যানিলাটা কোথায়, কেউই বলতে পারছে না। একজন তো বোকার মতন উত্তর দিলো, নিশ্চয় প্যারিসে। আপনার প্যারিস প্রমোদ উপন্যাসটা

ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। হাজরা কাফেতে লক-আউটের সময় অনেকেই পড়ছে, কিছুক্ষণের জন্যে এখানকার দুঃখ ভুলে থাকছে। অনেকের খুব ইচ্ছে হয়েছে প্যারিসে যাওয়ার।

সুধকার নন্দী লজ্জা পেলেন। এই ধোপাপাড়া, ছুতোরপাড়ার কর্মহীন লোকদের প্যারিসের গল্প পড়িয়ে কী লাভ হলো?

"আমাদের চাঁদু।" সদানন্দ বললেন, "ও খুব বই ভালবাসে। রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ, হিন্দু-সাধক সিরিজ, ভারতদর্শন সিরিজ আর আপনার বই। রবারের চটির ডাঁইয়ের ওপর আপনার 'প্যারিসে পাঁচদিন' উপন্যাসটা পড়ে রয়েছে। খদ্দেরের জন্যে অপেক্ষা করে-করে যখন মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে ওঠে তখন নিশ্চয় আপনার বই পড়ে শান্তি পায়।"

কোথায় খুশি হবেন, না একটু অস্বস্তিতে পড়ে যাচ্ছেন সুধাকর। 'প্যারিসে পাঁচদিন' বইটাতে কিছুই নেই—অনেকগুলো মন ভোলানো টুরিস্ট বই থেকে উপাদান সংগ্রহ করে টানা সাতদিনে লিখে ফেলেছিলেন।

অথচ এই উয়োম্যানিলা বইটা নিয়ে কী যে হলো একটুও এগোতে পারছেন না। যখনই ম্যানিলার পাঁচতারা হোটেলে নায়কের প্রমোদ-বিহারের ছবি আঁকতে যাচ্ছেন তখনই এই ধোপাপাড়ার ব্যাপারগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। স্ট্রাইক, লক আউট এসব মালিক এবং ইউনিয়ন নেতাদের কাছে কত সামান্য কথা, কিন্তু ব্যাপারগুলো কীভাবে একটা গোটা শহরের মানুষকে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিলো।

যাদের কর্মক্ষেত্রে এখনও শনি ঢোকেনি তারাও এই কুম্ভীপাকে জড়িয়ে পড়ছে। সদানন্দ একটু আগেই বলছিলেন, "সবচেয়ে মুশকিল হয় রাত্রে। মন্নুর মা সারাদিন মুখ খোলেন না। রাত্রে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেন, "জামাইয়ের কারখানা কবে খুলছে?"

"দেরি হবে মনে হচ্ছে", অসহায় সদানন্দ উত্তর দেন।

"কতদিন? সপ্তাহখানেক?" মনুর মা অধৈর্য হয়ে উঠছেন।

"কী জানি!"

মনুর মা কাঁদ-কাঁদ গলায় বলেন, "যদি আরও অনেক মাস কারখানা না খোলে? যদি ওই জুটমিলের মতন অবস্থা হয়? দেড় বছর নাকি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে? কারুর কোনো মাথাব্যথা নেই।"

এরপর কোন সময়ে কাঁদতে-কাঁদতে মনুর মা ঘুমিয়ে পড়েন, আর ঘুম চলে যায় সদানন্দর। মনুর মাকে তিনি বুঝিয়েছেন, "অতোশত ভাবলে পৃথিবী চলে না। ওপরে যিনি আছেন তিনি সারাক্ষণ সবার কথা নিশ্চয় ভাবছেন।"

কিন্তু গভীর রাতে সদানন্দ নিজেকেও বোঝাতে পারছেন না। ওপরে যিনি আছেন তিনি শালিমার জুট কোম্পানির কথা ভেবেছেন কি? আর নদীর ধারে ওই ষ্টীলের দড়ির কারখানাটা? ওখানে তো গেটের ওপরেই বিরাট বটগাছ গজিয়ে গিয়েছে। ওখানে যারা চাকরি করতো তারা কোথায় গেলো কেউ খবরও রাখে না। কিন্তু রহস্যজনক ভাবে একটা সবুজ এবং লাল পতাকা ওড়ে।

সদানন্দ এবার নিজের কথা ভাববার চেষ্টা করলেন। কারখানায় তাঁর মাইনে সামান্যই—কোনোক্রমে দিন চলে যায়। একটা সুবিধে এই ঠিকে প্রজাস্বত্বের টালির বাড়িটা। মালিক নন সম্পত্তির, কিন্তু আধা-মালিক হয়ে সদানন্দর পূর্বপুরুষরা কয়েক প্রজন্ম এখানে বসবাস করছেন। গোটা কয়েক টাকা রামকেষ্টপুরের বোসদের পাঠিয়ে দিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়।

যাদের পরিবারে মনুর বিয়ে দিয়েছিলেন তাদেরও ঠিকে-প্রজাস্বত্ব। পুরনো মাঠকোটা, ও টালির ছাদ। কিন্তু মাস গেলেই জগদীশের মতন এক আঁচলা টাকা বাড়িওয়ালাকে দিয়ে আসতে হয় না। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডেও টাকা জমছে সদানন্দর—তিরিশ বছর ধরে। সেই সঙ্গে আছে সুদ। আর আছে গ্র্যাচুইটি। বড্ড ভাল জিনিস। রিটায়ার করার সময় যত বছর কাজ করেছো তত মাসের অর্ধেক কোম্পানি কাজ না

করিয়েই বিনা বাক্যব্যয়ে হাতে ধরিয়ে দেবে।

না, খুব ভুল হয়ে যাচ্ছে। এই বয়সে কেউ নিজের কথা ভাবে না; ছেলে, মেয়ে, জামাই, নাতিনাতনীর কথা চিন্তা করার জন্যেই তো মানুষ বয়স্ক হয়।

মনু, মনোরমা—ওর শুকনো মুখটা সদানন্দ দেখতে পাচ্ছেন এই অন্ধকারে। কত আদর করে যার নাম রেখেছিলেন বিমলা, তার মুখটা কালো হয়ে গিয়েছে।

লক-আউট শুরু হবার পরে মনু ক্রমশ যেন দূরে সরে যাচ্ছে—বাবার কাছে থেকেও কথা লুকিয়ে রাখতে চায়। অথচ এই মনুই বিয়ের আগে বাবার কাছ থেকে জোর করে পয়সা আদায় করতো, মায়ের বারণ শুনতো না। সবার সামনেই বাবার মানি ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে নিয়েছে।

মনু কী করছে কে জানে? ভীষণ ভয় হয় সদানন্দর।

সদানন্দর পরিবারের অনেক কথা শুনেছেন সুধাকর নন্দী। বেশ বিপাকে পড়ে গিয়েছেন লেখক সুধাকর। কলম খুলে বসে আছেন—ম্যানিলা কথাটা শতখানেক বার কাগজের ওপর লিখেছেন, কেটেছেন, লিখেছেন। কিন্তু আর একটুও এগোতে পারছেন না। তাঁর সমস্ত মন জবরদখল করে বসে আছে এই সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং কোম্পানির চরিত্রগুলো।

বন্ধু সরল চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করেছেন সুধাকর। সে বলেছে, "যাবে! অনেক লোককে যেতে হবে সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং-এর ঘোষপাড়া কারখানা থেকে। আমাদের ওই জাহাজ ডুবে গিয়েছে ধরে নাও, ওকে ভাসাতে গেলে অনেক বোঝা হাল্কা করতে হবে।"

"আমাকে নিষ্ঠুর লোক মনে হতে পারে, সুধাকর। কিন্তু যে মরে

গিয়েছে তাকে সংস্কার না করলে এই পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। যারা বেঁচে আছে তারাও শেষ হয়ে যাবে।"

"বাছাই করে কেবল অকাজের মানুষকে কারখানা থেকে সরিয়ে দেবার ক্ষমতা ইণ্ডাসট্রির নেই এদেশে। সুতরাং এই যন্ত্রণাদায়ক পথ ধরে আমাদের এগোতে হবে সুধাকর—মাইনে না পেয়ে-পেয়ে মানুষ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে তখন কিছু লোক পাওনাগণ্ডা হাতে নিয়ে চলে যেতে রাজি হবে।"

"সরল, তোমার বাবা কারখানার চার্জহ্যাণ্ড ছিলেন। যাদের চাকরি ছাড়া কিছুই নেই তাদের দুঃখ তুমি বুঝবে না? যাদের যাবার রাস্তা খোলা নেই, যারা কাজে ঢুকে পড়েছে তাদের অন্নে হাত না দিয়েই কীভাবে কারখানাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তার পথ তোমরা খুঁজবে না? এইসব মানুষের চাকরি তো তোমরাই একসময় দিয়েছিলে।"

বন্ধুর কথা শুনে সরল চ্যাটার্জির মুখটা কালো হয়ে উঠেছিল। "সুধাকর, তুমি আমাকে কসাই ভাবছো। আমি কসাই নই। যখন বিনা অস্ত্রোপচারে কারখানাকে বাঁচাবার সময় ছিল তখন নকুড়বাবু এবং তাঁর চেলারা ম্যানেজমেন্টের কোনো কথায় কান দেননি। নৌকো ডুবিয়ে এদেশে প্রমাণ করতে হয় নৌকো ডুবতে পারে। ডুবলো-ডুবলো বলে কাতর আর্তনাদ করলেও এদেশের কেউ বিশ্বাস করে না—না সরকার, না পলিটিশিয়ান, না ইউনিয়ন, না শ্রমিক। আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি সময়ের চাকর। আমার বিনা যন্ত্রণায় কারখানাকে চাঙ্গা করে তোলার মতন কোনো ম্যাজিক আমার জানা নেই। তুমি বিশ্বাস করো আমাকে। আমি এখানে একটা নিমিত্তমাত্র।"

কত দিন ধরে কাগজে কত লক-আউটের কথা পড়েছেন সুধাকর, কখনও ব্যাপারটার মানবিক গুরুত্ব বোঝেননি। এখন চোখের সামনে ঘটতে দেখে দিশাহারা হয়ে পড়ছেন। বেচারা সদানন্দবাবুর জামাই যদি এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়তো তা হলে বেশ হতো।

সদানন্দবাবুর মাথায় কী যে ব্যামো ঢুকেছে। আবার সুধাকরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি সাহিত্যিক মানুষ, আপনি বলতে পারবেন। মন্নু যদি শ্বশুরবাড়িতে থেকে যেতো তা হলে ওর এতো কষ্ট হতো না? স্বীকার করছি, না-খাওয়ার চিন্তা হয়তো কয়েকমাস থাকতো না, কিন্তু অপমান? মন্নুর স্ত্রী, শাশুড়ি কি এই সুযোগ পেয়ে ছেড়ে কথা কইতো?'

সুধাকর যতই বুঝিয়েছেন, "আপনি তো ব্যাপারটার জন্যে দায়ী নন। সমস্যাটা হলো জীবন-সংগ্রামের, সমাধান হলো অন্য একটা রোজগারের পথ খুঁজে বার করা, যাতে মানুষকে নিয়ে যার-যা-ইচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না চালাতে পারে।"

কিন্তু সদানন্দর মাথায় অত কথা ঢোকে না। "এই তো বাজার। এই তো পরিস্থিতি। কী করবে আমাদের জগদীশ?"

আজও অনেকক্ষণ ধরে সুধাকর নন্দী কাগজ কলম নিয়ে বসে আছেন। নতুন দোয়াত থেকে পেনে কালিও ভরে নিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে। তবু লেখার স্রোত আসছে না। কোথায় যেন কী গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

অদ্ভুত সব চিন্তা আসছে। ম্যানিলায় রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার প্রমোদকাহিনী বাগে আসছে না—পচা দুধের ছানা-কাটা অবস্থা। জমাতে গিয়েও গল্পটা জমছে না। কিন্তু ম্যানিলার পাঁচতারা হোটেলে সুইমিং পুলের ধারে একবার নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতে পারলে আর কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। গল্প এরপর তরতর করে বয়ে যাবে।

'ডোম অব ডিজায়ার' বলে সচিত্র একটি বই অনেক কষ্টে সংগ্রহ করে এনেছেন সুধাকর। রমণীর ঊর্ধ্ব-শরীর সম্পর্কে সেখানে

চমকপ্রদ সব বর্ণনা আছে। পৃথিবীর নানা ভাষায় যুগে যুগে কবি ও কাহিনীকারদের রমণীবক্ষ বন্দনার শ্রেষ্ঠ পঙক্তিগুলিও সেখানে পরপর সাজানো রয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ সুযোগ মতো ছড়িয়ে দেওয়া যাবে নতুন উপন্যাসে।

কিন্তু অদ্ভুত সব খেয়াল মাথায় আসছে। যদি সদানন্দ ও সত্যবতীকে ম্যানিলার পটভূমিকায় স্থাপন করা যেতো তাহলে কেমন হতো? হাসির বই হিসেবে হয়তো মন্দ হতো না। কিন্তু হাসির বই লেখার ইচ্ছা তো সুধাকরের নেই।

লোকে সুধাকরকে পাগল বলবে। সদানন্দকে কী করে তিনি এই ছুতোরপাড়া থেকে বার করে ম্যানিলায় নিয়ে যাবেন? দেখাতে হবে, মনোরমা ও জগদীশ এখন ম্যানিলায় রয়েছে, সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং ছেড়ে ওখানে জগদীশ মস্ত চাকরি পেয়েছে? কিন্তু সে তো আষাঢ়ে গপ্পো থেকেও উৎকট হয়ে উঠবে, কেউ বিশ্বাস করবে না সুইডিশ কোম্পানির লক-আউট হওয়া ওয়ার্কম্যান বিদেশে ফরেন এক্সচেঞ্জ উপার্জন করছে। হাজরা কাফেতেও হানাহানি হবে এবং তারপর কথা উঠবে। সুধাকর এখন গাঁজাগুলির ওপরে আছেন।

সুধাকরের ভিতরের মানুষটাও হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। "লেখক-মশাই, ইয়ারকি মারার জায়গা পাওনি! সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং-এর লক-আউট হওয়া কর্মীকে একেবারে ম্যানিলায় হাজির করা! তুমি শালা কোথাকার কোন্ হারুণ-অল-রশিদ? কে তোমাকে এই টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরিতে আরব্যরজনী ফাঁদবার লাইসেন্স দিয়েছে?"

বেশ বাবা বেশ, আমি ম্যানিলায় এখনই যাচ্ছি না। আমার মুরোদ যদি থাকে তবে আমি এই সদানন্দ-সত্যবতী, মনোরমা-জগদীশ, এই ওগিলভি ইণ্ডিয়া-সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং, এই ছুতোরপাড়া-ধোপাপাড়া নিয়েই গপ্পোটা লিখবো।

সরল চ্যাটার্জিকে আমি কিন্তু বেশি প্রাধান্য দেবো না। ওকে অতো করে বললাম, লক-আউটটা তুলে নিয়ে অন্য যা কিছু করার

করো। কিন্তু সে কথা শুনলো না।

সরল সাফ বলে দিলো, "আমার হাতে ওই ক্ষমতা নেই। বোর্ড অফ ডিরেকটরস্‌ বলে দিয়েছে, এতো অকর্মণ্য মানুষের বোঝা কোম্পানি আর বইতে পারবে না।"

সরল চ্যাটার্জিকে নিয়ে সুধাকর যদি কখনও অন্য গল্প লেখেন তা হলে লোকটাকে অন্যভাবে শাস্তিটা দেবেন।

গল্পের সরল চ্যাটার্জিকে কলমের এক খোঁচায় সুধাকর পাঠিয়ে দেবেন কানাডায় এক নির্জন অঞ্চলে—যেখানে মানুষের মুখই দেখা যায় না। সেখানে কারখানা স্থাপন করতে গিয়ে মানুষের জন্যে হাহাকার করছে সরল চ্যাটার্জি।

সুধাকর দেখাবেন নির্জন কানাডার বনাঞ্চলে হাতে-পায়ে ধরেও কোনো মানুষকে নিজের কারখানায় ঢোকাতে পারছে না সরল চ্যাটার্জি। যে একদিন হাওড়ায় কলকারখানায় বেশী মানুষ দেখলেই আঁতকে উঠতো সে ই বুঝবে, মানুষ যেমন খরচের বোঝাও বটে তেমন মানুষ না-পেলেও কোনো কাজ হয় না।

সরল চ্যাটার্জিকে নিয়ে লেখা গল্পের শেষ দৃশ্যটা কীরকম করবেন তাও সুধাকর ঠিক করে ফেলেছেন। চারদিকে বরফ পড়েছে, কানাডার সেই অসহনীয় শীতে একটা ভারি ওভারকোট চাপিয়ে, মাথায় টুপি, কান পর্যন্ত ঢেকে নিয়ে একটা জনহীন কারখানার গেটের সামনে নিঃসঙ্গ সরল চ্যাটার্জি মানুষ ধরবার জন্যে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সরল চ্যাটার্জির না-হয় নির্বাসন হলো, কিন্তু এই ধোপাপাড়ার গল্পটার কী হবে? সদানন্দ ও মনোরমার গল্পটার পরিণতি কী হবে?

লক-আউট চলছে তো চলছেই এইভাবে তো গল্প শেষ করা যায় না।

একদিন হাজরা কাফেতে গিয়ে কমরেড নকুড় সেনকে সুধাকর জিজ্ঞেস করেছিলেন, এইরকম একটা গল্প কীভাবে শেষ করা যায়?

নকুড় সেন তখন ডবল পরিমাণ স্যালাডসহ গোল্ডেন ফ্রাই চিকেন কবিরাজী কাটলেট খাচ্ছিলেন। সুধাকরের আকস্মিক উপস্থিতি ও

প্রশ্নে একটু ডিসটার্বড ফীল করলেন।

কাঁটা-চামচ স্তব্ধ করে তারপর নকুড় সেন বললেন, "আপনি যদি সত্যিই একটা অবিস্মরণীয় প্রগতিবাদী সংগ্রামী কাহিনী লিখতে চান তাহলে এইভাবে শেষ করুন: কোম্পানি শ্রমজীবি জনগণের কাছে নতি স্বীকার করে লক-আউট তুলে নিলো বিনাশর্তে। কিন্তু শ্রমিকরা তখন স্ট্রাইক করে বসলো। তাদের ভাতা দ্বিগুণ না করলে, শ্রমিক সংখ্যা না বাড়ালে তারা কাজে যাবে না। বাধ্য হয়ে মালিক নতি স্বীকার করলো। শ্রমজীবি মানুষের বিজয় মিছিল পথ পরিভ্রমণ করছে, পটকা ফাটছে, ফাগ উড়ছে—এইরকম একটা বর্ণাঢ্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে গল্পোটা শেষ করতে পারেন।"

"কিন্তু অমন সময় সুইডিশ কারখানায় এখন থেকে কতদিন পরে আসতে পারে? গল্পটা কতদিন ধরে টানতে হবে?"

কমরেড নকুড় সেন বেশ বিরক্ত হলেন। "মালিকদের ফাঁদে পা দেবেন না। মালিকদের ধারণা, দু তিন মাস মাইনে না পেলে মানুষ নরম হয়ে যায়। একদম বাজে কথা। প্রথম এক-দুই মাসই বরং একটু অসুবিধে হয়—তারপর মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন কোনো কষ্ট থাকে না।"

"কিন্তু বাড়িভাড়া, রেশন, বাজার, দুধের দাম, ইলেকট্রিকের বিল, ডাক্তারের ফি, ছেলেমেয়ের ইস্কুলের মাইনে?"

"এসব প্রশ্নের উত্তর আরেকদিন দেবো। এখন একটি জরুরি সভা রয়েছে শিবপুর টেক্সটাইলস শ্রমিক ইউনিয়নে। আমার দেরি হয়ে গিয়েছে", এই বলে নকুড় সেন উঠে পড়লেন।

সদানন্দর স্ত্রী কীভাবে গল্পের পরিণতি চাইবেন তাও সুধাকর আন্দাজ করতে পারছেন। তিনি চাইবেন, শ্রমমন্ত্রীর নির্দেশে আজই বেতারে স্থানীয় সংবাদে ঘোষণা হচ্ছে লক-আউট তুলে নেওয়া হয়েছে। কারও চাকরি যায়নি, তবে সবাই মন দিয়ে কাজ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সেক্ষেত্রে শেষ দৃশ্যটা হবে, উপবাস করে স্নান সেরে মনুকে নিয়ে সত্যবতী এসেছেন সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে। মাকে একখানা টকটকে লালপাড় শান্তিপুরি শাড়ি কিনে দিচ্ছেন সত্যবতী, আর পুরুতকে বলছেন, পুজোটা যেন জগদীশের নামে দেওয়া হয়। "মা, মা, দুর্গতিনাশিনী মা, তুমি আছো।"

মা সত্যিই আছেন কি না, থাকলেও লক-আউট তুলে নেবার শক্তি কতখানি এসব বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে সুধাকরের মনে। ভক্তিবাদীরা বড় কবি হতে পারেন, সঙ্গীত রচয়িতা হতে পারেন কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিক হওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। অবিশ্বাসের যুগে বিশ্বাসী মানুষের কোনো ভূমিকা নেই।

আরও একটা পথ খোলা আছে। লক-আউট যেমন চলছে চলুক, এরপর নকুড় সেন যদি ধর্মঘট চাপাতে চান চাপান।

কিন্তু মনে করুন, জগদীশ একটা লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে. প্রথম পুরস্কার কয়েক লক্ষ টাকা। এবার ইচ্ছে করলে মনু-জগদীশ সদানন্দ-সত্যবতীকে একই ফ্লাইটে কলকাতা থেকে ম্যানিলায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। অনেক উত্তেজনা গিয়েছে, এখন একটু শান্তিতে অবসর প্রয়োজন।

কিন্তু সদানন্দ মানুষটিকে চেনেন সুধাকর। পুরুষকারের পরাজয় ও নিয়তির জয় এমন পরিণতি উনি নিজেই পছন্দ করবেন না।

এ অনেকটা গর্ভযন্ত্রণার মতন। প্রত্যেককেই পরম যন্ত্রণার মধ দিয়ে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নিতে হবে।

সদানন্দবাবুকে মনের ভিতরে এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন সুধাকর নন্দী। ঠিক যেন টিভিতে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন সদানন্দ মজুমদার। তাঁর দাড়ি-না-কামানো ঈষৎ ক্লান্ত মুখটা টিভির সমস্ত পর্দা জুড়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"সদানন্দবাবু, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সেই দরের লেখক নই যে আপনার ক্ষণকালের এই কাহিনীর ওপর চিরকালের আলোকপাত করতে পারবো। আমি আপনাদের ব্যাপারটা লিখতে চাই। কিন্তু সব গল্পের একটা পরিণতি প্রয়োজন—এই বিদঘুটে নিয়ম কে চালু করে গিয়েছিল জানি না, কিন্তু আইন অমান্য করার উপায় নেই। আমি শেষটা কিছুতেই চিন্তা করতে পারছি না, আমাকে বলুন সব খবরাখবর কি? শেষ পর্যন্ত কী হতে চলেছে?"

সদানন্দ যা খবর দিচ্ছেন তা আশাপ্রদ নয়। তাঁর আদরের মন্নুর হাতের চুড়ি, গলার হার, মাথার টিকলি সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। হাতের বালাটুকু সম্বল, কিন্তু ওটা এয়োস্ত্রীর লক্ষণ। তাছাড়া ওতে তেমন সোনা নেই—গালা দিয়ে ফাঁক বোঝাই করা।

এই গহনা বিক্রির কথা মন্নু মুখ ফুটে বলেনি, কিন্তু সদানন্দ জানতে পেরেছেন। কিন্তু মেয়েকে কিছু প্রশ্ন করেননি তিনি।

মন্নুর মায়ের গায়েও গহনা নেই। যেটুকু ছিল বিয়ের সময়েই মেয়েকে দিয়েছিলেন। সে সব তো এই ক' সপ্তাহে শেষ।

"একটা গুজব উঠেছে, আজ আবার সরকারী দপ্তরে লক-আউট নিয়ে মিটিং হচ্ছে। একটা মিটমাট হতে পারে। নেতারা বলেছেন, চাপ রয়েছে পুরো। মালিকের মামদোবাজি বেশি দিন চলবে না।"

এই আশা নিয়েই সদানন্দ আজ নিজের কারখানায় গিয়েছিলেন। শশধরকে খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন।

শশধর গম্ভীর মুখে বললো, "হলেও হতে পারে। গরমেণ্ট নিশ্চয় চায় না কারও ক্ষতি হোক, কিংবা কোনো ব্যবসা বন্ধ থাকুক। কলকারখানাই তো দেশের লক্ষ্মী।"

কিন্তু ওগিলভি কোম্পানির লেবার আপিসের পরেশ মল্লিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সদানন্দকে কোনো আশা দিলো না। সে বললো, "আমাদের ডিপার্টমেণ্টের সায়েবের সঙ্গে কথা বললাম। উনি গোপনে বলছেন, সময় নষ্ট করার এটাও একটা পথ। কোনো প্রতিশ্রুতি না

দিয়ে প্রতিদিন মিটিং করে বছরের পর বছর সময় কাটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকে কোম্পানির লেবার অফিসারদের।" সদানন্দ বুঝছেন, কর্মীদের ল্যাজে খেলানোর জন্যেই কিছু অফিসারকে বাড়ি গাড়ি দিয়ে কোম্পানি রেখেছে।

পরেশ মল্লিক সদানন্দর একই ইস্কুলের ছাত্র, তবে অনেক জুনিয়র। সুধাংশুবাবু স্যরের কাছেও সে পড়েছে। তারও দুঃখ আছে। পরেশ মল্লিক একদিন বলেছিল, "ওঁর কাছে যা শুনেছিলাম তার কিছুই জীবনে কেন কাজে লাগানো গেলো না?"

সদানন্দ ম্লান হেসেছিলেন। "জীবনের দোষ? না, মাস্টার-মশাইয়ের শিক্ষার দোষ? না আমাদের দোষ?"

"ওসব বুঝি না দাদা, লেবার আপিসের ঠেলা সামলাতে-সামলাতেই জীবনটা ছোবড়া হয়ে গেলো। বলুন কাউকে সাসপেণ্ড করতে হবে, করে দিচ্ছি, কারুর বিরুদ্ধে এনকোয়ারি করতে হবে, সব কাগজপত্তর তৈরি করে দিচ্ছি, মাইনে কাটতে হবে বলুন কেটে দিচ্ছি, কিন্তু সুধাংশুবাবু স্যর যেভাবে পৃথিবী চলবে বলে গিয়েছিলেন সেভাবে কেন চললো না? মানুষের দুঃখ হঠাৎ কেন এতো বেড়ে গেলো বলতে পারেন না, দাদা?"

"তোমায় একটু জ্বালাতন করবো ভাই, পরেশ। কিছু মনে কোরো না।"

"ছি ছি, এসব কি বলছেন। এই কারখানায় চাকরি খালি থাকার খবরটা আপনিই আমার দাদাকে দিয়েছিলেন, দাদা সেই খবর পেয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমাকে এখানে টাইপিস্ট হিসেবে ঢুকিয়েছিল তারপর আমি ঘষটে-ঘষটে এই সিনিয়র ক্লার্ক হয়েছি। আপনার কাছে আমার চিরদিনের ঋণ থাকবে।"

মানুষ এতো কথা মনে রাখে? কবে কী হয়েছিল! সদানন্দ একটু আশ্চর্য হলেন। তবে তো সুধাংশুবাবু স্যর যে-পৃথিবীর কথা বলতেন তা এখনও হারিয়ে যায়নি।

"পরেশ, একটা চাকরি এখানে হয় না ?"

"চা-ক-রি ! এখানে ! আমাকে কেন লজ্জা দিচ্ছেন দাদা ? আপনি তো সবই জানেন।"

"সবই জানি। তবু চুপ করে বসে থাকি কী করে ? জানো পরেশ, জামাইয়ের চাকরির ব্যাপারে রাতে ঘুম হয় না। এখন ওদের কারখানায় বলছে, সেচ্ছায় কোম্পানি ছেড়ে চলে যাও। চিঠি দাও কোম্পানিকে। তা হলে তিন চার মাসের মাইনে পাবে—ক বছরের আর চাকরি ! ওই টাকায় বাজারের সমস্ত দেনাও শোধ হবে না। কিন্তু হাতে কিছু নগদ পাবার জন্যেও সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং কারখানার কিছু মানুষ মরীয়া হয়ে উঠেছে। তারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে পারছে না। এখন বেঁচে থাকলে তবে তো ভবিষ্যৎ।"

পরেশ মল্লিক খুব দুঃখ পাচ্ছে। সদানন্দ বললেন, একটা আশার পথ দেখতে না পেলে মেয়েটা না পাগল হয়ে যায়। আমারও পাগল হবার অবস্থা।"

কী ভেবে পরেশ এরপর বললো, "একটু গোপন কথা ছিল। খুব গোপন কিন্তু।"

একটু দূরে সরে গিয়ে সদানন্দ ও পরেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলো না কি কথা হলো।

সদানন্দর মুখটা কিন্তু কালো হয়ে উঠলো আরও। কোথায় যেন বিভ্রান্তি আসছে। সুধাংশুবাবু স্যর বেঁচে থাকলে একবার তাঁর কাছে যাওয়া যেতো। কিন্তু বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হতো একশ। একশ বছর ধরে স্রেফ ছাত্রদের উপদেশ দেবার জন্যে কেন তিনি বেঁচে থাকবেন ?

"তোমার কাছে আমি আবার আসবো, পরেশ। আমার মেয়ের সামনে ভীষণ বিপদ। আমি ঠিক করে ভাবতে পারছি না।"

"যতবার খুশি আসবেন, দাদা। ব্যাপারটা কিন্তু কাউকে বলবেন না।"

"পাগলেও নিজের স্বার্থ বোঝে, পরেশ। আমি এখনও পাগল হইনি, তবে হবার অবস্থায় প্রায় এসেছি। কেন যে আমি মেয়েটাকে জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে সরিয়ে আনলাম। কেন যে কোম্পানিতে লক-আউট হলো!"

♣

না, সুধাকর অনেকক্ষণ মনঃসংযোগ করেও সদানন্দবাবুর গল্পটায় একটা সম্ভাব্য পরিণতি খুঁজে পাচ্ছেন না।

সায়েবরা তো এ গল্পের কোনো মাথামুণ্ডুই খুঁজে পেতো না। একমাত্র যদি-না ভারতীয় বংশোদ্ভূত কোনো মার্কিন লেখক এই গল্পের মাধ্যমে ভারতবর্ষের জয়গান করতে উৎসুক হন।

যে-ভারতবর্ষ যুগযুগান্ত আগে চিরদিনের মতন হারিয়ে গিয়েছে তার জয়গাথা নয়। যে-ভারতবর্ষ এখনও অবিশ্বাস্য ভাবে আমাদের চোখের সামনেই বেঁচে আছে সেখানকার গল্প। সেখানে পারিবারিক আকর্ষণ এখনও কত প্রবল—বাবা ও মেয়ের ভালবাসার বন্ধন এখনও কত নিবিড় হতে পারে তার পরিচয় রয়েছে।

অথচ এই তুলনাহীন স্নেহবন্ধনই মানুষের কর্মক্ষমতা হরণ করছে। জগদীশ চরিত্রটা একটা সামাজিক বোঝার মতন হয়ে উঠছে—সে তার স্ত্রী এবং মেয়েকে কীভাবে খাওয়াবে-পরাবে তা সে নিজে ঠিক করছে না। পুরুষমানুষের ভূমিকাটা খেলো হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু অদ্ভুত এই ভারতবর্ষে পরিবারের মধ্যে কেউ কাউকে দোষারোপ করে না। জগদীশ তার ব্যক্তিগত সম্মান হারায়নি, সে বরং একটা সংকটের প্রতীক হয়ে উঠছে।

কিন্তু এসব ভেবে কী লাভ? সুধাকর নন্দী তো সায়েবদের জন্যে গল্প লিখতে বসেননি। তিনি নিম্নবিত্ত মানুষের সুখদুঃখের গোলকধাঁধায় নিজেই ভুল করে ঢুকে পড়েছেন, মানসম্মান নিয়ে

কোনোক্রমে বেরোতে পারলে তিনি আর এর মধ্যে ঢুকবেন না। জনপ্রিয় প্রমোদ উপন্যাসগুলো সাজাতে কখনও গিয়ে এইভাবে শরীর খারাপ করতে হয় না।

সুইডিশ কারখানার লক-আউট মিটুক চাই না-মিটুক, সুধাকর গল্পটার একটা পরিণতি খুঁজে পেতে চান। মনুর সোনার অলঙ্কার পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গিয়েছে—এবার কী করে ওদের দিন কাটবে?

সবাই যেন নিয়তির অমোঘ বিধানের জন্য অপেক্ষা করছেন। অথচ পুরুষকারের গল্প লিখতে চান সুধাকর। মানুষ চেষ্টা করে, দুর্ভাগ্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কিছু একটা করতে। ঐধরনের কিছু একটা কমরেড নকুড় সেন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি করবেন না। নকুড় সেন শহিদ হবেন, কিন্তু কিছুতেই দালালের রবারস্ট্যাম্প নেবেন না।

জগদীশকে কেউ বলেছে, ইনসিওরের দালালি করো। বীমা কর্পোরেশনের খাতায় নামও লেখানো হয়েছে। কিন্তু এই শহরে যাদের ইনসিওর আছে তাদেরই নাভিশ্বাস উঠছে। নামজাদা ইনসিওর এজেন্ট হিসেবে জগদীশ মিলিয়ন ডলার ক্লাবের সভ্য হয়েছেন এবং নিউ ইয়র্কের বার্ষিক সম্মেলনে যাচ্ছেন এমন একটা দৃশ্য দেখিয়েও তো কাহিনীটা শেষ করা সম্ভব নয়।

এই মুহূর্তে তা হলে ওই সদানন্দকেই অনুসরণ করা ছাড়া গতি নেই। পরেশ মল্লিকের সঙ্গে আরও দু'একবার চুপি-চুপি কথা বলতে দেখা গিয়েছে সদানন্দকে।

ভদ্রলোক সারাক্ষণই কিছু ভাবেন আজকাল। সুধাকর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "কেউ ভাবে, কেউ করে। যার করার কিছু থাকে না সে-ই ভাবে।"

ভদ্রলোকের মনোবল বৃদ্ধির জন্যে সুধাকর বলেন, "আপনি তো ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন।"

সদানন্দ বলেন, "এক-এক সময় মনে হয় দায়িত্বের বোঝাটা বড় হলে কেবল ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে থাকাটা নিরাপদ নয়।

আপনারই এক চরিত্র কোনো একটা অবস্থায় কথাটা বলেছিল।"

কী ভাবছেন সদানন্দ তা জানতে চান সুধাকর। ভদ্রলোক এখন নিয়মিত তাঁর কাছে এসে মনটা একটু হাল্কা করে যান।

মুখটা লাল হয়ে উঠলো সদানন্দর। বিরক্তি ও অশ্রদ্ধা মনে রেখে সদানন্দ বললেন, "আপনার ওই সরল চাটুজ্যে লোকটার কখনও ভাল হবে না, দেখবেন। এতো পরিবারের দীর্ঘশ্বাস!"

সুধাকর বললেন, "সরল সব বুঝেও কিছু বুঝতে চায় না, সদানন্দবাবু। তার ধারণা, সে যা করছে তা সে না করলে অন্য কাউকে তা অবশ্যই করতে হতো। তাতে আরও দেরি হয়ে যেতো। আরও দেরি হলে কারখানার সমস্ত লোকের সর্বনাশ হয়ে যেতো, কারও চাকরি রক্ষে করা যেতো না। এখন যা হয়েছে তাতে কয়েকশ লোক যাবে, কিন্তু কয়েকশ থাকবে। সেইটাই নাকি হবে সরল চাটুজ্যের 'গিফট্ টু ধোপাপাড়া'।"

"হয়তো তাই। কিন্তু মানুষটাকে প্রাণ খুলে ক্ষমা করার মতন শক্তি আমার শরীরে নেই, সুধাকরবাবু। আমার মেয়ের শরীরটা যদি একটু দেখতেন। সে তো আপনার ওই সরল চাটুজ্যের কোনো ক্ষতি করেনি। ফুলের মতন মেয়ে ছিল, ভাল চাকরিওয়ালা ছেলে দেখে আমি বিয়ে দিলুম···" আর বলতে পারলেন না সদানন্দ।

কিন্তু কিছু একটা মাথায় ঘুরছে সদানন্দর। এখন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। যখন বলবার হবে তখন নিজেই বলবেন ভদ্রলোক। সুধাকর দেখেছেন মানুষের এইটাই স্বভাব। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষেরই একটু প্রাইভেসি প্রয়োজন। এই প্রাইভেসি কথাটার কোনো বাংলা হয় না।

সদানন্দকে এক পেয়ালা চা দিয়েছেন সুধাকর। মানুষটির প্রতি মমতা জন্মেছে তাঁর। এই বয়সে বড্ড বড় বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ওঁর মনে শক্তি জোগাবার জন্যে সুধাকর বললেন, "আপনি সুধাংশুবাবু স্যরের ছাত্র, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আপনার অনেক কিছুই জানা থাকার কথা। অনেক মানুষ বিপদে পড়েও নির্ভয়ে থাকে, তারা ভাবে এর থেকেও বেশি বিপদ আসতে পারতো—থিংস কুড হ্যাভ বিন ওয়ার্স। সুধাকর বলে চললেন, এই আমার কথা ধরুন যখন চাকরিটা ছেড়ে শুধু লেখার ওপর নির্ভর করতে হলো, তখন প্রথমে একটু অসহায় অবস্থা হয়েছিল। সেই সময় মনে পড়লো সাহিত্যিক সুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। অফিসের সায়েবের সঙ্গে মনোমালিন্য করে চাকরি ছাড়লেন, ঠিক করলেন সারাক্ষণ লিখবেন কিন্তু ঠিক সেই সময় গুরুতর অসুখে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী হলেন সুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্রলোক তবুও ভেঙে পড়েননি। বললেন, ব্যাপারটা যে আরও খারাপ হয়নি এই যথেষ্ট।"

আরও খারাপ হতে পারতো এই প্রসঙ্গে আলোচনার ধারা "আরও খারাপের" দিকে গেলো। গম্ভীর মুখে সদানন্দ বললেন, "কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তা নাকি অনেকে আগাম ভেবেচিন্তে ঠিক করে রাখে?"

সুধাকর বললেন, "সরল চ্যাটার্জির এটা প্রিয় বিষয়। ওরা বলে কনটিনজেন্ট প্ল্যান—সব অবস্থার জন্যে প্রস্তুতি। আমরা গেরস্ত লোক, আমাদের বাড়িতে প্ল্যানিং অফিসার নেই। তবে কেউ-কেউ মনে মনে কিছুটা ছকে রাখে কী হলে কী করবে।"

সদানন্দ আচমকা এবার অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। "যদি কোনো কারণে এই সময় কারখানা থেকে আমার চাকরিটাও না-থাকে

সুধাকরবাবু ?"

মৃদু বকুনি লাগালেন সুধাকর। "আর কোনো বিষয় ভেবে পেলেন না, সদানন্দবাবু। আপনার ওগিলভি কোম্পানি তো খুব খারাপ করছে না। নেতাদের দৌরাত্ম্য ওখানে কম, ম্যানেজমেন্টও রাতারাতি লাভ দশগুণ বাড়াবার জন্যে ওখানে ছটফট করছে না। আপনি কোন দুঃখে ওই সব কুডাক ডাকছেন ? আপনি মন দিয়ে রটারডামের প্যাকিংগুলো চেক করে যান।"

সুধাকর ভেবেছিলেন সদানন্দ এবার চুপ করে যাবেন। কিন্তু তা হলো না। নিরানন্দ সদানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ভাবছেন কারখানা খোলা-থাকা অবস্থায় লোকের চাকরি যায় না ?"

"সে যায় কাদের ? যারা ম্যানেজারকে ভয় দেখায়, মাল চুরি করে, ইচ্ছে করে মেশিন ভেঙে দেয়, প্রায়ই কামাই করে। আপনি তো এভারেস্টে উঠে বসে আছেন। আপনার তিরিশ বছর চাকরিপূর্তি উপলক্ষে ক'মাস আগে কোম্পানি আপনাকে কত আদর যত্ন করলো। হাজারিকা সায়েব আপনাকে পছন্দ করেন, আপনি একদিনও লেট করেন না। আপনার সঙ্গে কার তুলনা ? কে আপনার চাকরিতে হাত দেবে ? আজেবাজে কথা একদম মনে আনবেন না।"

তবুও সন্তুষ্ট হচ্ছেন না সদানন্দ। "কারও চাকরি এই শহরে গোদরেজ সেফ-এর মধ্যে নেই সুধাকরবাবু। জামাইয়ের সম্বন্ধেও তো আমি মোটেই ভাবতাম না। সুইডিশ কোম্পানির চাকরির এই অবস্থা হবে কখনও কেউ কি ভেবেছিল ? অসম্ভব বলে আর কিছু রইলো না পৃথিবীতে, সুধাকরবাবু। সুতরাং আমার যদি চাকরি না থাকে তা হলে অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে ? আপনিই তো বললেন, সবরকম অবস্থার কথা ভেবে রাখা উচিত।"

সদানন্দ হঠাৎ এতো দুর্বল হয়ে পড়ছেন কেন ভেবে পাচ্ছেন না সুধাকর। তিনি এবার অন্য সুর ধরলেন।

"শুনুন সদানন্দবাবু, কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজাররা যাই বলুন,

সব জিনিস আগাম ভেবে রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, উচিতও নয়। এখন আমরা যেখানে বসে কথা বলছি ধরুন। মুহূর্তে যদি ভূমিকম্প হয়, অথবা যদি এই বাড়ির ছাদ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। ঠিক সেই সময় যদি ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে, সেই সঙ্গে যদি বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটে সারাবাড়িতে আগুন ধরে যায়। একটা গোখরো সাপ যদি সেই সময়ে উঠোনের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। ঠিক সেই সময় যদি আমার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয় তাহলে আপনি এবং আমি কী করবো? প্রত্যেকটা ঘটনাই অসম্ভব নয়, এমন ব্যাপার যে পৃথিবীতে কখনও হয়নি তাও হলফ করে বলা যায় না। সুতরাং বেশি ভেবে লাভ নেই।"

তবু সন্তুষ্ট হচ্ছেন না সদানন্দ। ভদ্রলোকের মনের মধ্যে নিজের চাকরির কথাটা যখন ঢুকেছে তখন আরও সোজাসুজি আলোচনা করা ভাল।

বাধ্য হয়ে সুধাকর বললেন, "ঠিক আছে, আপনার কথাই মেনে নিলাম। আপনার চাকরিতে কিছু হাঙ্গামা হলেও আমি যা বুঝি তাতে আপনার বিপদ এবং আপনার জামাইয়ের বিপদ এক হবে না।"

খুব সন্তুষ্ট হলেন সদানন্দ মজুমদার। "ঠিক বলেছেন আপনি। আমার কেসটা আলাদা। আমি তো অনন্তকাল কারখানায় কাজ করে যেতাম না।"

সুধাকর মনে করিয়ে দিলেন, "আপনি নিজেই বলেছেন আমাকে, চার বছর পরে আপনাকে কোম্পানি থেকে অবসর নিতেই হবে। সুতরাং কোনো অঘটন ঘটলে তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, চার বছর পরে যা ঘটতে যাচ্ছিল তা কয়েক বছর এগিয়ে এলো।"

সুধাকর খুশি হলেন, এবার যেন নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে পাচ্ছেন সদানন্দ মজুমদার। "আপনি ঠিক ধরেছেন, সুধাকরবাবু। চার বছর পরে যে চাকরি থাকবে না তার জন্যে আমি তো বহু বছর ধরেই তৈরি হয়ে আছি। জামাইয়ের কেস এবং আমার কেস এক নয়।"

"মোটেই নয়।" জোর দিলেন সুধাকর।

"তাছাড়া কোম্পানি তো আমাকে খালি হাতে বিদায় করতে পারবে না। পি-এফ, যত টাকা আমি দিয়েছি এতো বছর ধরে তত টাকা কোম্পানির অনুদান, এই টাকার ওপর সুদ। তাছাড়া তিরিশ বছর চাকরির জন্যে পনেরো মাসের গ্র্যাচুইটি তো কোনো শালা আটকাতে পারবে না।"

সদানন্দর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, "তাছাড়া আমার ছুটি পাওনা আছে। চাকরি চলে গেলে ছুটির পুরো টাকাটা নগদ নারায়ণ! দিতে বাধ্য কোম্পানি। সরকারের আইনে লেখা আছে।"

বাঃ, এই তো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে মানুষটা।

কী ভেবে সদানন্দ বললেন, "আমারও খরচ আছে, জামাইয়েরও খরচ আছে। কিন্তু জগদীশ বিড়ি সিগারেট খায়, আমি খাই না। সুতরাং আমার সুবিধে। তারপর ধরুন বাড়ি। ঠিকে প্রজাস্বত্ব হোক যাই হোক আমার ভাড়ার খরচ নামমাত্র, জামাইয়ের ওটা মোটা খরচ। মন্নুর মেয়ের ইস্কুলের খরচ আছে, আমার ছেলেটার ওসব পাট চুকে গিয়েছে। মন্নুকে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, আমি তো ও ব্যাপারে কেল্লা ফতে করে বসে আছি। আমার চাকরি কিছুতেই আমাকে অত ধাক্কা দিতে পারবে না, কী বলেন?"

"তবু যা দিনকাল! কেউ কি ভেবেছিল এই ক'বছরে টাকার দাম দশ পয়সায় হাজির হবে? বসে বসে যাদের ভেঙে খেতে হবে তাদেরই সবচেয়ে বেশি কষ্ট এই দেশে। কিন্তু তাদের কথা সমাজের কেউ ভাবে না।"

আবার দমে গেলেন সদানন্দ। "আপনি বলছেন, কলসীর জল গড়াতে-গড়াতে ফুড়ুত করে ফুরিয়ে যাবে, তখন কী হবে? কিন্তু আমি এবং আমার বউ তো হিসেবী। আমরা তো ফ্যান ভাড়া করবো না, কিস্তিতে টি-ভি কিনবো না। আমার স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—কখনও আজেবাজে খরচ করে অর্থকে অপমান করে না।"

বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলেন সুধাকর। এতো গভীরে প্রবেশ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। মন যখন দুর্বল হয় তখন বোধহয় এরকমই হয়।

সদানন্দ কিন্তু ক্রমশই ব্যাপারটাকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছেন। মেয়ের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ভদ্রলোকের মাথায় একটু ছিট দেখা দিচ্ছে।

সদানন্দ কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, "আমি কিছুদিন খবরের কাগজের ব্যবসা করেছিলাম। সে অনেকদিন আগেকার কথা। খোদ সুধাংশুবাবু স্যর আমার কাছ থেকে কাগজ কিনতেন। তখন কাগজ পড়ার নেশা এতো ছিল না, এখন রেশন তোলার পরেই অনেক লোকে কাগজ কেনার কথা ভাবে।"

সদানন্দ বলে চললেন, "আমার বাল্যবন্ধু উমাচরণ, একই দিনে খবরের কাগজের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। অন্য চাকরি না পেয়ে সে ও লাইনেই টিকে রইল। এখন কাগজের রোজগারেই উমাচরণ সংসার চালাচ্ছে। ছোট্ট বাড়িও করেছে। উমাচরণের সঙ্গে এখনও আমার যা সম্পর্ক তাতে একটু সুযোগ-সুবিধে চাইতে পারি। উমাচরণ সেদিনই বলছিল, ভোরবেলায় কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করে দুটো পয়সা রোজগারের পক্ষে চমৎকার লাইন।"

সুধাকর শুনে যাচ্ছেন। "বসে না থেকে কিসের ব্যবসা করবো সেটা ঠিক করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। আমাদের চাঁদু বুঝতে পারেনি কল-কারখানা রুজি-রোজগার বন্ধ থাকলে খদ্দেরের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—যার চাকরি আছে সেও রবারের স্যাণ্ডাল কিনবে না। চাঁদু গতকাল আমাকে বলেছে, আপনি দেখবেন, লক-আউট খুললেও ধোপাপাড়ার মানুষ অনেক কেপ্পন হয়ে যাবে। ব্যাটারা পায়ে কাঁচ ফুটে মারা যাবে তবু চটি কিনবে না।"

"তারপর?"

সদানন্দ বললেন, "আপনি চটি কেনার ছুতো করে চাঁদুর সঙ্গে

একবার কথা বলে আসুন—আপনার জ্ঞান বাড়বে। চাঁছুর বিক্রি নেই, অথচ ওর সামনেই সুইডিশ কোম্পানির নিতাইচরণ কিন্তু ভাল ব্যবসা ফেঁদেছে। শনি ঠাকুরের ছবি রেখে সামনে একটা বড় থালা বসিয়ে দিয়েছে। টকাটক পয়সা পড়ছে—লোকে এখন শনিঠাকুরকে একদম চটাতে চায় না। নিতাইচরণ ব্যাপারটা বুঝেছে ভাল। অথচ এই নিতাইচরণ একসময় মার্কসবাদী দলে ছিল, ভগবানে বিশ্বাসই করতো না।"

সদানন্দ এবার শান্ত হয়ে আসছেন। "তা হলে আমার আর চিন্তা কি? হঠাৎ কিছু হলেও সদানন্দকে কোপ মারা কারুর পক্ষে সম্ভব হবে না—কোম্পানি থেকে পাওয়া টাকা, খবরের কাগজের ফিরিওয়ালাগিরি—এইসব নিয়ে তালে-গোলে চলে যাবে, কী বলেন?"

না, বুঝতে ভুল হয়েছে সুধাকরের। সদানন্দর মাথা থেকে এখনও ভূত নামেনি। সাইকেলে চড়ে সদানন্দ বললেন, "যাই, একবার উমাচরণের সঙ্গে দেখা করে আসি। শুনেছি, তেরো-চোদ্দটা ছেলে ওর কাছে কাজ করে। মস্ত লোক এখন উমাচরণ। নিজের সাধনায়, নিজের নিষ্ঠায় দেখিয়ে দিয়েছে—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।"

সুধাকর ভাবতে লাগলেন, কী এমন হলো যে সদানন্দ হঠাৎ নিজের সম্বন্ধে এতো চিন্তিত হয়ে উঠলেন?

সদানন্দর দুশ্চিন্তা যদি দুর্বল স্নায়ুর লক্ষণ হয় তাহলে কিছু বলার নেই—জামাইয়ের দুশ্চিন্তাটা ক্রমশ নিজের দুশ্চিন্তায় পরিণত হচ্ছে। অথবা ওগিলভি কোম্পানিতেও কিছু ঘটতে চলেছে?

কিছু আঁচ পেয়েছেন নাকি সদানন্দ বিশ্বস্ত মহল থেকে? যা এখনও সদানন্দ ভাঙতে চাইছেন না। সুধাকর জানেন, শালকিয়ার এক কোম্পানিতে এইরকম গোলমাল আসন্ন বুঝতে পেরে এক ভদ্রলোক নির্ধারিত সময়ের কয়েকমাস আগেই অবসর নিয়েছিলেন। দূরদ্রষ্টা ভদ্রলোক—আড়াই বছর কোম্পানির গেট বন্ধ। আর দেরি করলে নিজের প্রাপ্য টাকাগুলোও পেতেন না। খুব বেঁচে গিয়েছেন।

নিজের টাকা থাকা সত্ত্বেও অনাহারে মরেছে এমন ঘটনা এদেশে বিরল নয়।

বেশ ফ্যাসাদে পড়া গেলো। সদানন্দ ও তাঁর মেয়ের কাহিনীটা কীভাবে শেষ হবে তা কিছুতেই লেখক সুধাকরের স্পষ্ট কল্পনাতে হচ্ছে না।

বরং ব্যাপারটা আরও গুলিয়ে যাচ্ছে। যদি শেষ পর্যন্ত লিখাতে হয় মেয়ের দুঃখ আর দেখতে না পেরে এবং মেয়েকে অকারণে যৌথ পরিবার থেকে বার করে আনার অনুশোচনায় ভালমানুষ সদানন্দ মজুমদার নিজেই পাগল হয়ে গেলেন, তাহলে দুঃখের শেষ থাকবে না।

গল্পটা ভীষণ 'মরবিড' হয়ে যাবে—সমাজের সকলের সর্বনাশ হোক এই প্রত্যাশা যারা করে এমন অস্বাস্থ্যকর মনের মানুষ ছাড়া সুধাকরের লেখা কারও কোনো কাজে আসবে না।

সুধাকর নিজেই ব্যাপারটা ঠিকমতন বুঝতে পারছেন না। সরল চাটুজ্যের কাছে আরও খোঁজ-খবর নেবার জন্যে তিনি কলকাতায় সায়েবপাড়ায় গিয়েছিলেন।

সুধাকর ভেবেছিলেন বলবেন, "ভাই সরল, মানুষগুলোর একটা গতি করো। কোম্পানি যে মহাশক্তিমান তা তো ভালভাবেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। শ্রমিকদের হাতে মারতে না পারলেও ভাতে মারার পথ যে কোম্পানিদের এখনও কাছে খোলা আছে তা বুঝতে আর কারও বাকি নেই।"

কিন্তু কিছু লাভ হলো না। বাড়ির দারোয়ান বললো, "সাহেব ছুটিতে চলে গিয়েছেন। ফ্যামিলি নিয়ে সাউথে বেড়াতে যাবেন।"

বুঝুন অবস্থা! এতোগুলো মানুষকে লক-আউট ঝুলিয়ে রেখে কেউ এইভাবে অবকাশ বিনোদনে যেতে পারে? এদেশে সবই সম্ভব।

মানুষের যেখানে সম্মান নেই সেই সমাজে লেখক হয়ে কী লাভ ?

প্রচণ্ড বিরক্তি ধরেছিল সুধাকরের। সরল চাটুজ্যের ওখান থেকে সোজা মিনিবাসে চড়ে হাজির হয়েছিলেন নেতা নকুড় সেনের বাড়িতে।

নকুড় সেনও শহরে নেই। কাশ্মীরে গিয়েছেন তিনি। "না, মোটেই ভাববেন না তিনি গায়ে হাওয়া লাগাতে ওখানে গিয়েছেন। ওখানে কনফারেন্স। সর্বভারতীয় সম্মেলনে নকুড় সেন এই জেলার প্রতিনিধিত্ব করছেন। ফেরবার পথে দিল্লীতে ক'দিন থামবেন।"

"এগেন! ভাববেন না, দিল্লীতে ফুর্তি এবং শপিং করতে যাচ্ছেন নকুড় সেন। ওখানেও তিনটে আলোচনাচক্র রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে নকুড় সেনের থেকে ভাল কে বলতে পারবেন ? মালিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র খোদ রাজধানীতে গিয়ে ফাঁস করতে হলে হিম্মত লাগে, বুঝলেন ?"

এরপর নকুড় সেনের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিছুই বুঝতে পারেননি সুধাকর নন্দী। আমাদের সমাজজীবনে কোথাও কোনো বড় রকমের গলদ রয়েছে এইটুকু বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

আজ সকালে সুধাকর রাস্তায় বেরিয়েছেন কয়েকজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে : বিশেষ করে ওই চাঁদুর সঙ্গে একটু কথা হলে মন্দ হতো না।

চাঁদুর কাছে তিনি একজোড়া চটি কিনবেন, কোনো দরদস্তুর করবেন না। চাঁদু যা দাম চাইবে তাই হাসিমুখে দিয়ে দেবেন। তারপর ওকে অভিনন্দন জানাবেন সুধাকর। স্বনির্ভরতার মন্ত্রই এদেশের মানুষকে বাঁচাতে পারে ওই সরল চাটুজ্যে এবং নকুড় সেনের হাত থেকে। নিজের উদ্যমে কিছু করো, নিজের পায়ে দাঁড়াও—কেউ তোমাকে তালা মারার ভয় দেখাতে পারবে না।

চাঁদুবাবুই হচ্ছেন বাঙালীদের কাছে প্রকৃত আদর্শ। ভয় পাবার কিছু নেই, অনেক সুযোগ রয়েছে হাতের গোড়ায়।

জি-টি রোড ধরে হাঁটতে-হাঁটতে এবার বাজারের কাছে হাজির

হলেন সুধাকর। এইখানে কাছাকাছি কোথাও চাঁতুর বাই-সাইকেল ঠেলার খোঁজ পাওয়া যাবে।

এই বাই-সাইকেল ঠেলা মফস্বলে বেশ জনপ্রিয় উঠেছে। দু'চাকা ঠেলে-ঠেলে যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়, অথচ অনেকখানি জায়গা জুড়ে মালও সাজিয়ে রাখা যায়। চলমান দোকান সুধাকরের ছোটবেলায় ছিল না। তখন সবাইকে বোকার মতন মাথায় মোট বইতে হতো। মানুষ ক্রমশ বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে।

সুধাকর এবার একটা সাইকেল ঠেলা খুঁজে পেলেন। তার ওপর নানা-সাইজের রবারের চটি যত্ন করে সাজানো রয়েছে। পিভিসি ঠোঙার মধ্যে লাল, নীল নতুন চটির সমারোহ। একটা বোর্ডে লেখা 'এক দাম'। আর একটায় 'ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না।'

কিন্তু কোথায় চাঁতু? সুধাকর ডানদিকে মোড় ফিরে স্থানীয় বাজারের ঘিঞ্জি গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

বাজারের সরু রাস্তার দু'ধারে আনাজ, ফলওয়ালা, ডিমওয়ালাদের ভিড়। আরও একটু দূরে মূল বাজারটা। সেখানে ভীষণ হৈ-চৈ। প্রচণ্ড ভিড়। কিছু একটা হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে।

এখানকার মানুষ তো নির্বিবাদী। তারা তো কোনো হাঙ্গামায় যায় না। আরও একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়ালেন সুধাকর।

একজন উত্তেজিতভাবে বললো, "মারা গিয়েছে।" আর একজন বললো, "না, এখনও প্রাণ রয়েছে!" "পুলিশ এসেছে?" "আরে মশাই, প্রাণ থাকলে পুলিশ কী করবে? ডাক্তার এসেছে কিনা বলুন।" "খুব বুঝেছেন মশাই! ডাক্তার ডাকতে গেলে পয়সা লাগে। পুলিশ ডাকতে ফি লাগে না। পুলিশ এসে যা ভাল বুঝবে তাই করবে।"

"কী ব্যাপার দাদা?"

"আর মশাই বলবেন না। একজন লোক বাজারের পায়খানা ঘরে গলায় দড়ি দিয়েছে। ভিতর থেকে বন্ধ। আর একজন পায়খানা

যাবার জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। শেষে ধাক্কা মেরেছে। কোনো সাড়া নেই! তারপর মশাই, পল্কা দরজা তো। লাথি মেরে ভেঙে ফেলে দেখে এই দৃশ্য। ঝুলছে। তখনও নাকি ছটফট করছিল। পুলিশের ভয়ে কেউ নামাচ্ছিল না। তারপর একদল সাহস করে দড়ি কেটে দিয়েছে। প্রাণ আছে কি না বলতে পারবো না।"

আর এগোলেন না সুধাকর। মরা মানুষের মুখ দেখার কোনো কৌতূহল নেই তাঁর। আর যারা আত্মহত্যা করে তাদের সম্বন্ধে সাহিত্যিক-কৌতূহলও নেই তাঁর। যারা এইভাবে চলে যায় তাদের নিয়ে কখনও গল্প লেখা যায় না। কারণ আত্মহত্যাটা কোনো পরিণতি নয়। অক্ষম গল্প লেখকরা যখন গল্প ম্যানেজ করতে পারেন না তখন গল্পের শেষ টানবার জন্য আত্মহত্যার আয়োজন করেন।

♣

সন্ধ্যেবেলায় সদানন্দ বেশ উত্তেজিত হয়ে সুধাকরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। "শুনেছেন মশাই. চাঁদুর কাণ্ডটা! আত্মহত্যা করলো! জলজ্যান্ত মানুষটা। তাও কিনা নিজের বাড়িতে নয়। ব্যবসার জিনিসপত্তর রাস্তায় রেখে বাজারের পাবলিক পায়খানায়।"

চুপ করে রইলেন সুধাকর। সদানন্দ বললেন, "আবার কায়দা করে পুলিশকে চিঠি লিখে গিয়েছে। বাড়িতে এই কাজটা করলে বউয়ের বাড়তি কষ্ট হবে বলে সে বাজারে চলে এসেছে. বউ সম্পর্কে কত বিবেচনাবোধ!"

হঠাৎ কেঁদে ফেললেন সদানন্দ। "না স্যর, আমি ওকে দোষ দেবো না। সব গিয়েছে, আষ্টেপৃষ্ঠে দেনা, বউকে পরের বাড়ি ঝি-গিরি করতে পাঠানো ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। আমি জানি ছেলেটা সবরকম চেষ্টা করে দেখেছে। পারেনি। সেটা ওর দোষ? না এই পোড়া দেশের দোষ? আপনারা বলুন।"

সুধাকর কী বলবেন? সদানন্দ হঠাৎ গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি যখন সকালে বাজারে গিয়েছিলেন তখন আমার জামাইকে ওখানে দেখেছিলেন? দু'জনে খুব বন্ধু ছিল। মনুর বাড়িতে কতবার চা খেয়েছে, টিভি দেখেছে ওই চাঁদু। খুব রসিক ছিল। ভাল তবলা বাজাতো।"

জামাইকে দেখেছেন কিনা মনে করতে পারছেন না সুধাকর সদানন্দ বললেন, "একটু আগে লাশ ছেড়েছে। পুলিশের খরচেই দাহ হবে। যারা খুব বড় আর যারা খুব ছোট তাদেরই সরকারী খরচে দাহ হয়। খবর পেয়ে দু'একজন ঘাটে গিয়েছে। তা আমি মনুকে জিজ্ঞেস করলাম জামাই গিয়েছে কি না? শুনলাম যায়নি। সেই দুপুর থেকে চুপচাপ বসে আছে। মনু ঘাঁটাতে সাহস পায়নি। যে লোক টো-টো করে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে সে-ই ঘরবন্দী হয়ে আছে নিজের ইচ্ছায়।"

সুধাকর বুঝলেন, অজানা আশঙ্কায় ভুগছেন সদানন্দ স্বয়ং। ফিসফিস করে তিনি বললেন, "মনুকে বোধহয় সাবধান করে দেওয়া উচিত। জগদীশের ওপর নজর রাখতে। কিন্তু ওইটুকু মেয়ে আমার কত সইবে বলুন তো?"

মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন সদানন্দ। তারপর বললেন, "একটা এসপার-ওসপার আমাকেই করতে হবে। দেখি একবার শশধরের কাছে যাই। বউকে আমি এখন কিছু বলবো না। ও-বেচারাও ভয় পেয়ে যাবে।"

সদানন্দ বেরিয়ে গেলেন, আর আকাশ-পাতাল ভাবনা শুরু হলো সুধাকরের। এই শোচনীয় অবস্থায় সদানন্দ কী করবেন? রাগের মাথায় নকুড়বাবুর দলের কাউকে খুন করে বসবেন নাকি?

♣

শশধরের বাড়িতে যাবার আগে লেবার আপিসের পরেশ মল্লিকের বাড়িতে থামলেন সদানন্দ। তাকে বললেন, "আমি রাজি। একটা ব্যবস্থা করে দাও, ভাই।"

পরেশ মল্লিক চাপা গলায় বললো, "স্রেফ আপনার জন্যই আমি খোঁজ-খবর করেছি। এতো ভাল রেকর্ড আপনার। ম্যানেজার রাজি হয়েছে। তবে কোম্পানির ডাক্তার যদি রাজি হয়। ব্যাপারটার সবটাই খুব চুপি-চুপি হবে। শুধু হাজারিকা সায়েব জানতে পারবেন।"

"কোম্পানির ডাক্তার?" আবার মাথায় হাত দিয়ে বসলেন সদানন্দ।

পরেশ মল্লিক জানালো, "কী বলবো দাদা, যে পুজোর যে মন্তর। গত বছরে দুটো কেসে ফাইভ হানড্রেড করে নিয়েছে। কিন্তু কেউ যেন ঘুণাক্ষরে না জানতে পারে, কাজটা যতক্ষণ না হচ্ছে।"

সদানন্দ আর সময় নষ্ট করলেন না। সোজা ছুটলেন শশধরের বাড়িতে। আর ক' মিনিট দেরি হলে সদানন্দ তাকে ধরতে পারতেন না। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে যাত্রা দেখতে বেরুচ্ছে শশধর। জামাইয়ের সুখের জন্যে কে আবার মোটরগাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

সদানন্দ বন্ধুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, "আমার পাঁচশ টাকা প্রয়োজন। ক'দিন পরেই দিয়ে দেবো। কবে জোগাড় করে দিতে পারো?"

সারাজীবনে বন্ধু সদানন্দ কখনও এক পয়সা ধার চাননি। একটু অবাক হলেও শশধর কোনো প্রশ্ন করলো না।

শশধর বললো, "আবার জোগাড় কেন? দরকার থাকলে এখনই নিয়ে যাও।"

গলার স্বর নামিয়ে শশধর বললো, "জামাই বাবাজীর কিছু কাঁচা

টাকা আমার কাছেই থাকে। বাড়িতে সব রাখতে সাহস পায় না খুকুমণি।"

একটা খামের মধ্যে মুড়ে শশধর টাকাটা দিলো সদানন্দকে। খুকুমণি ও তার স্বামী সাজগোজ করে ইতিমধ্যে বাবাকে তুলতে এসে গিয়েছে।

খুকুমণি বললো "জ্যেঠু, আপনিও চলুন। আমাদের সঙ্গে একখানা বাড়তি টিকিট আছে। খুব ভাল পালা—আপনার ভাল লাগবে। দধীচি। স্বেচ্ছায় নিজের অস্থি দান করে যিনি দেবতাদের জয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।"

শশধর বললো, "ভাল পালা বলেই আমিও যাচ্ছি। চলো না। অপরের মঙ্গলের জন্য দধীচির আত্মত্যাগের গল্পো তো তোমার মুখেও কতবার শুনেছি।"

সদানন্দ কোথাও যেতে রাজি হলেন না। তাঁর অনেক কাজ।

রাত্রে বিছানায় সদানন্দ এ-পাশ-ওপাশ করছেন। সব ব্যাপারটা নিতান্ত শান্তভাবে নিলেও তাঁর ঘুম আসছে না।

গৃহিণী ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন "এখনও ঘুমুলে না? শরীর ঠিক আছে তো?"

এতো সবের পরেও শরীরটা বিশ্রীভাবে ভাল আছে। সদানন্দ হঠাৎ গৃহিণীর অজান্তেই প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে ঠাকুর। আমাকে চোখে ছানি দাও, হাতে কাঁপুনি দাও, মাথায় 'যন্ত্রণা' দাও, ব্লাড প্রেসার দাও, হাঁপানি দাও—অন্তত কালকের জন্যে। ঠাকুর, এসব আমার প্রয়োজন।"

সেবার আপিসে অনেকক্ষণ বসেছিলেন সদানন্দ। সাদা কাগজে অ্যাপ্লিকেশন লিখেছেন পরেশের টেবিলে। সেই কাগজে সায়েবরা সইসাবুদ করেছেন।

এবার সেবার আপিস থেকে আরেকখানা চিঠি করিয়ে নিয়ে সদানন্দ ছুটলেন মেডিক্যাল অফিসারের ঘরে। আগন্তুককে চেম্বারের এগজামিনিং বেডে শুইয়ে ডাক্তার দাশ জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরে থেকে তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে। সমস্যাটা কী?"

বহু চেষ্টা করে সদানন্দ বললেন, "আমার শরীরে কিছু নেই ডাক্তারবাবু। আমাকে আনফিট করে দিন। আমি আর কাজের যোগ্য নই।"

"ইচ্ছে করলেই কি ফিট মানুষকে আনফিট করা যায় মজুমদার?" ডাক্তার দাশ একটু খেলালেন। "ব্যাপারটা কী? ওয়ান ফর ওয়ান নাকি? কেউ স্বাস্থ্যের কারণে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেই পরিবারের কাউকে চাকরি দেওয়া? আগে ছিল একের পর এক—এখন একের বদলে এক।"

পাঁচশ টাকার খামটা ইতিমধ্যে ডাক্তার দাশের হাতে চলে গিয়েছে। তবু সাহস পাচ্ছেন না ডাক্তার দাশ। "আপনি বলছেন, পরেশ মল্লিককে চেনেন আপনি।"

পরেশ মল্লিককে ফোন করলেন ডাক্তার, দু' তিন মিনিট কথা বললেন। তারপর ফোন নামিয়ে, বেডের কাছে এসে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে সদানন্দর ব্লাড প্রেসার মাপলেন।

"ব্লাড প্রেসার তো বয়সের পক্ষে চমৎকার রয়েছে। হার্ট, লাঙ্স্, কিডনি সর্বত্র অস্বস্তি বলছেন, অথচ সবই তো এক নম্বর।"

"দেখি একবার শিরদাঁড়াটা—ওখানে যদি কিছু বার করা যায়।"

"ছাপোষা মানুষদের শিরদাঁড়া থাকে না, ডাক্তারবাবু। ও আর

কী দেখবেন ?"

খামটা পকেটে পুরে ডাক্তার দাশ নিজের টেবিলে চলে এলেন। বেড থেকে উঠে সদানন্দ ওঁর হাত চেপে ধরলেন, "আমাকে উদ্ধার করতেই হবে, ডাক্তারবাবু।"

"আপনাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমি না ফেঁসে যাই। পরেশ মল্লিক আপনার কথা বলেছে আমাকে। আপনি খুব বিপদে আছেন শুনেছি। কিন্তু এসব আপনি ভেবে-চিন্তে করছেন ? পরে দুঃখ করবেন না তো ? অনেকের পরে কিন্তু আফশোস হয়।"

"আমার কিছু হবে না, ডাক্তারবাবু। এছাড়া কোনো পথ নেই।"

ডাক্তার দাশ লেবার আপিসের কাগজটার ওপর ঘস-ঘস করে কীসব লিখলেন। বললেন, "কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন, পাঁচ-ছ'মাস ধরে আপনার শরীর খুব খারাপ—মাথার যন্ত্রণায় অন্ধের মতন হয়ে যান। একটু কাজ করলেই বুকে কুনকুনে ব্যথা ওঠে। আর শিরদাঁড়া সোজা করে কাজ করতে খুব কষ্ট হয়। মনে থাকে যেন।"

কাগজটা সদানন্দর হাতে দিলেন না ডাক্তার দাশ। "খারাপ রিপোর্ট তো, আমি নিজেই দিয়ে আসছি পরেশ মল্লিকের আপিসে।"

এখন রাত হয়েছে। হাজারিকা সায়েবের সঙ্গে দেখা করে ওগিলভি ইণ্ডিয়ার ফ্যাক্টরি থেকে সদানন্দ মজুমদার একটু দেরিতেই রাস্তায় বেরিয়েছেন। পিছন ফিরে তিরিশ বছরের স্মৃতি জড়ানো কারখানাটার দিকে সদানন্দ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

শরীরটা এতক্ষণ বেশ ভালই ছিল। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো, মাথার যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখছেন সদানন্দ। শিরদাঁড়াটাও যেন সোজা থাকতে চাইছে না। স্ট্যাণ্ড থেকে আজ সাইকেলটা খালাস করলেন না সদানন্দ।

তার বদলে একটা রিকশ করলেন সদানন্দ। শরীরটা গাড়ির ওপর এলিয়ে দিতে রিকশওয়ালা বললো, "একটু সোজা হয়ে বসুন, হুজুর।"

টুং টাং রিকশ এগিয়ে চলেছে। ধোপাপাড়ার মোড়ে রিকশ ছেড়ে সদানন্দ আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

এই অসময়ে বাবাকে দেখে মনু তো অবাক। "বাবা, তুমি এখন? নিজের শরীর নষ্ট করে ওভারটাইম করছিলে বুঝি আমার জন্যে?"

মেয়ের মাথায় হাত বোলালেন সদানন্দ। "না মা। একটা সুখবর এনেছি জগদীশের একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে ভগবানের আশীর্বাদে। এই কাগজখানা নিয়ে কাল সকালেই সে যেন আমাদের কারখানার পরেশ মল্লিকের সঙ্গে দেখা করে। ও যে লক-আউটে আছে, ও যে চাকরি থেকে বাড়তি হয়েছে এসব কথা যেন না বলে। আজ থেকে সুইডিশ ইনজিনীয়ারিং-এর সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই।"

"রিকশ চড়ে আপনি?" ছুতোরপাড়ায় বাড়ির সামনেই সুধাকর দেখতে পেলেন সদানন্দ মজুমদারকে। এই লোককে কোনোদিন তো রিকশ চড়ে পয়সা নষ্ট করতে দেখেননি সুধাকর। "শরীর খারাপ নাকি, সদানন্দবাবু?"

সদানন্দবাবু হাসলেন। "আপনি শুনলে খুশি হবেন, মা সিদ্ধেশ্বরীর দয়ায়, মেয়ে-জামাই সম্বন্ধে, আমার আর কোনো চিন্তা রইলো না। জামাইয়ের একটা চাকরি হয়েছে একের বদলে এক, ওয়ান ফর ওয়ান।"

এই বলে সদানন্দ মজুমদার ধীর ও শান্ত পদক্ষেপে তাঁর টালির চালের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। আর বহু চরিত্রের স্রষ্টা সাহিত্যিক সুধাকর নন্দী পরম বিস্ময়ে ছোট্ট মানুষটির শীর্ণ শরীরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।